# একলব্য

হরিশংকর জলদাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একলব্য। অনার্য। প্রান্তজন। 'মহাভারতে'র অবহেলিত চরিত্র। অপাঙ্‌ক্তেয় বলে দুর্দমনীয়। দ্রোণাচার্যের ঘৃণা-চাতুর্য আর সতীর্থ অর্জুনের হিংস্রতা নিষাদ একলব্যকে ধ্বংসের কিনারায় নিয়ে যায়। কিন্তু হিরণ্যধনুপুত্র একলব্য এসব বিধ্বংসী বিরোধিতাকে অতিক্রম করে নিজস্ব পথ ও জগৎ তৈরি করে নেয়।

অর্জুন আচার্য দ্রোণের প্রিয়তম শিষ্য। অর্জুনের প্ররোচনায় শিষ্যত্ব-প্রত্যাশী একলব্যের ডানহাতের বুড়ো আঙুল কেটে নেন দ্রোণাচার্য। তীর-নিক্ষেপণে ডানহাতের বুড়ো আঙুলটি অপরিহার্য। 'গুরু' না হয়েও 'গুরুদক্ষিণা' নিলেন দ্রোণ। একলব্যের অপরাধ—সে স্বচেষ্টায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ধনুর্ধর হয়ে উঠেছে।

ঘটনা পরম্পরায় প্রিয়তম শিষ্য অর্জুন গুরুদেব দ্রোণের ঘোরতর শত্রুতে রূপান্তরিত হয়েছে। গুরুকে হত্যা করতে উদ্যত অর্জুন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে। একদার অস্পৃশ্য-অবহেলার একলব্য দ্রোণাচার্যকে আড়াল করে অর্জুনের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়ায়। একলব্য কি তার মানস-গুরুকে অর্জুনের হাত থেকে বাঁচাতে পারে? আর্যশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে শেষাবধি অনার্যরা কি টিকে থাকতে পারে?

স্বাজাত্যাভিমানী একলব্য শেষ পর্যন্ত ক্ষত্রিয়ানুরাগী কৃষ্ণকে পরাজিত করে ভারতবর্ষে প্রাকৃত মানুষের অধিকার কি প্রতিষ্ঠা করতে পারবে?

এসব প্রশ্নের উত্তর আছে হরিশংকর জলদাসের 'একলব্য' নামের এই এপিকধর্মী উপন্যাসে।

হরিশংকর কাহিনি লেখার সঙ্গে সঙ্গে সমাজকেও আঁকেন। আর্যসমাজব্যবস্থার পাশাপাশি ব্রাত্যমানুষদের জীবনও সুনিপুণভাবে এঁকেছেন লেখক, এই উপন্যাসে।

'একলব্যে'র ভাষা অভিজাত। 'মহাভারতের মতোই 'একলব্যে'র পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় কাহিনির মোচড়। উল্লাস-রিরংসা, রাজ্যলোভ-হাহাকার, জাতিশত্রুতা-হিংস্রতা—এই উপন্যাসের পরতে পরতে।

আশা—'একলব্য' উপন্যাসটি পাঠকের তৃষ্ণা মিটাবে, হরিশংকর জলদাসের অন্যান্য উপন্যাসের মতোই।

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চট্টগ্রামের উত্তর পতেংগা গ্রাম। জেলেপল্লি। ওখানে জন্ম হরিশংকর জলদাসের। ১৯৫৫-র ১২ অক্টোবরে। মধ্যবয়সে লিখতে বসা। প্রেরণা সামাজিক অপমান। জীবনাভিজ্ঞতা তাঁর সম্বল। নতুন কথা শোনাতে এসেছেন হরিশংকর। তাঁর কথাসাহিত্য তার প্রমাণ। তাঁর 'জলপুত্র', 'দহনকাল', 'কসবি', 'আমি মৃণালিনী নই', 'রামগোলাম', 'মোহনা', 'প্রতিদ্বন্দ্বী' উপন্যাসসমূহ পাঠকের ভাবনার মূলে তুমুল নাড়া দিয়েছে। এ বছর লিখলেন এপিকধর্মী উপন্যাস 'একলব্য'।

কথাসাহিত্যের জন্য নানা পুরস্কার পেয়েছেন হরিশংকর জলদাস। 'প্রথম আলো বর্ষসেরা বই পুরস্কার' (দহনকাল), 'আলাওল সাহিত্য পুরস্কার' (জলপুত্র), 'সিটি-আনন্দ আলো সাহিত্য পুরস্কার' ও 'বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন সম্মাননা পদক' (রামগোলাম), 'ব্র্যাক ব্যাংক-সমকাল সাহিত্য পুরস্কার' (প্রতিদ্বন্দ্বী)। এ ছাড়া কথাসাহিত্যে সার্বিক অবদানের জন্য পেয়েছেন 'ড. রশীদ আল ফারুকী সাহিত্য পুরস্কার', 'অবসর সাহিত্য পুরস্কার' এবং 'জীবনানন্দ মেলা সম্মাননা স্মারক'।

২০১২ সালে হরিশংকর জলদাস কথাসাহিত্যে 'বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার' পেয়েছেন।

প্রচ্ছদ : প্রত্যয় শংকর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# একলব্য

হরিশংকর জলদাস

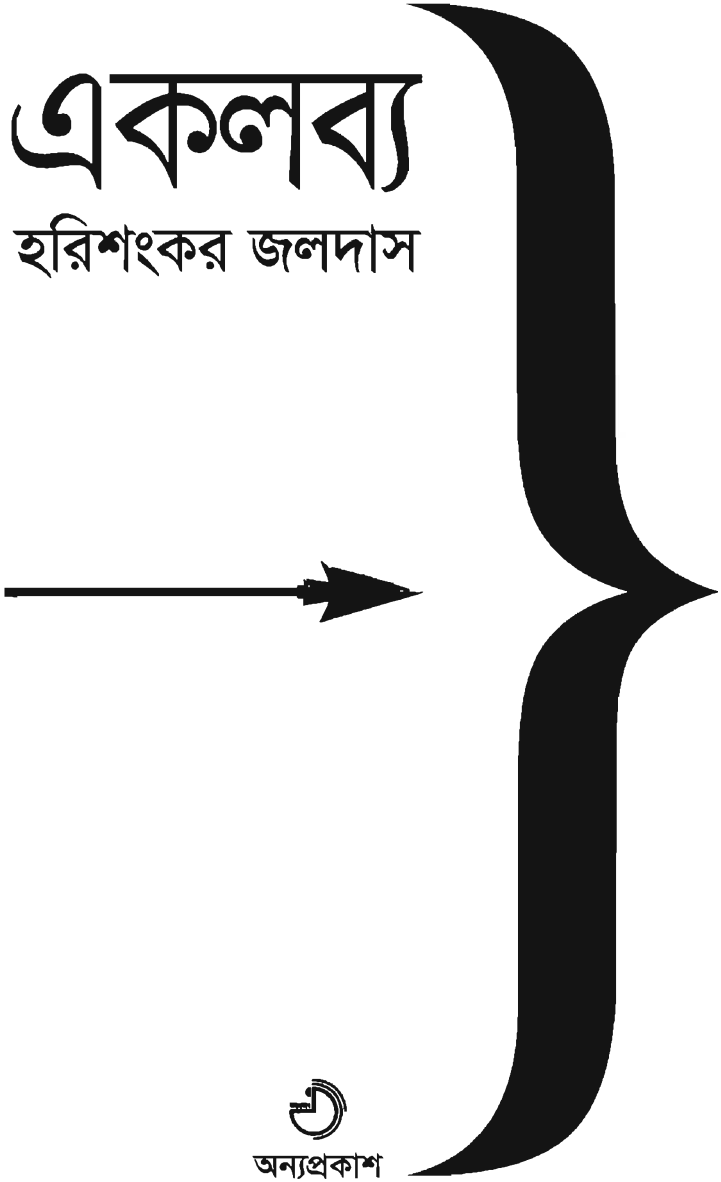

অন্যপ্রকাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রন্থস্বত্ব © লেখক

প্রথম প্রকাশ : একুশের বইমেলা ২০১৬

লেখক এবং প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। কোনো যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক্স, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনো মাধ্যম, যেমন ফটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনো পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না। বা কোনো ডিস্ক, টেপ, পারফোরেট মিডিয়া বা কোনো তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রকাশক : মাজহারুল ইসলাম, অন্যপ্রকাশ
৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৫৮০২
প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ
লেখকের ছবি : প্রত্যুষ শংকর
মুদ্রণ : কালারলাইন প্রিন্টার্স
৬৯/এফ গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা
মূল্য : ৪৫০ টাকা (১৮ মার্কিন ডলার)

Ekolobya (Novel)
by Harishankar Jaladas
Published in Bangladesh
by Mazharul Islam, Anyaprokash
e-mail : anyaprokash38@gmail.com
web : www.e-anyaprokash.com

ISBN : 978 984 502 282 8

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

আসাদুজ্জামান নূর

প্রান্তজন সখা,
নীলফামারী সাক্ষ্য দেয়।
সুসংস্কৃত ব্যক্তিত্ব,
বাংলাদেশ সাক্ষ্য দেবে।
তিনি আমার প্রিয় মানুষ।
'একলব্য' তাঁর হাতে অর্পণ করলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

## লেখকের অন্যান্য উপন্যাস

**জলপুত্র : আলাওল সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত**
**দহনকাল : প্রথম আলো বর্ষসেরা বই পুরস্কার প্রাপ্ত**
**রামগোলাম : বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন সম্মাননা পদক**
**ও**
**সিটি-আনন্দ আলো সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত**
**প্রতিদ্বন্দ্বী : ব্র্যাক ব্যাংক-সমকাল সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত**
**মোহনা : কৈবর্তবিদ্রোহ নিয়ে**
**কসবি : দেহজীবিনীদের নিয়ে**
**আমি মৃণালিনী নই : রবীন্দ্র-স্ত্রীকে নিয়ে**
**হৃদয়নদী : মধ্যবিত্ত জীবনের টানাপড়েন নিয়ে**
**সেই আমি নই আমি : শকুনিকে নিয়ে**

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# ভূমিকা

হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য নাম।
দ্রোণের চরণে আসি করিল প্রণাম ॥
যোড়হাত করি বলে বিনয় বচন।
শিক্ষাহেতু আইলাম তোমার সদন ॥
দ্রোণ বলিলেন তুই হোস্ নীচ জাতি।
তোরে শিক্ষা করাইলে হইবে অখ্যাতি ॥

: আদি পর্ব্ব, মহাভারত। কাশীরাম দাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখনি চিত্ত জেগেছে, শুনেছ বাণী,
তখনি এসেছে প্রভাত।

সকাল। উজ্জ্বল, আলোকিত।

'বাবা, আপনি যতই নিষেধ করেন, আমি মানব না।'

চমকে উঠলেন হিরণ্যধনু। বললেন, 'মানবে না! কেন মানবে না আমার নিষেধ!'

'আপনার নিষেধ আমার বাসনা পূরণের অন্তরায়।'

'বাসনা পূরণের অন্তরায়! আমার সাবধানবাণী তোমার বাসনা পূরণের অন্তরায়! তুমি এসব কী বলছ একলব্য ?' চিত্তচাঞ্চল্যে হিরণ্যধনুর কণ্ঠ বুজে এল।

পিতার কথা শুনে একটুখানিও ভড়কাল না একলব্য। কণ্ঠকে আরও দৃঢ় করে বলল, 'পিতা পুত্রের উন্নতি চান, সর্বদা। এটাই শাস্ত্রবিধি। আপনি তার ব্যতিক্রম। পিতা হয়ে আপনি আমার উন্নতি চাইছেন না। উপরন্তু উন্নতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছেন।'

হিরণ্যধনুর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন বিশাখা। বিশাখা একলব্যের মা। পুত্রের ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা শুনে বিশাখা স্তম্ভিত। বেদনাবিষাদময় চোখ দুটো বড় বড় করে বিশাখা একলব্যের উদ্দেশে কিছু একটা বলতে চাইলেন। কিন্তু তাঁর গলা দিয়ে গর গর আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই বের হলো না।

হিরণ্যধনু বাম হাত তুলে বিশাখাকে নিবৃত করলেন। তারপর ম্রিয়মাণ কণ্ঠে একলব্যকে বললেন, 'তুমি ভুল বুঝেছ পুত্র। পিতা কখনো পুত্রের উন্নয়নপথের কাঁটা হয় না। আমিও তোমার সমৃদ্ধির অন্তরায় নই। তোমাকে সতর্ক করে পিতার কর্তব্য পালন করছি মাত্র।'

'সতর্ক করছেন!' এবার একলব্যের বিস্ময়ের পালা। 'এমন কী বিপদের আভাস পাচ্ছেন যে, আমাকে সাবধান করতে হচ্ছে আপনাকে ?'

হিরণ্যধনু বললেন, 'তুমি ভুল করতে যাচ্ছ পুত্র। চরম ভুল করতে যাচ্ছ।'

'একজন মহান অস্ত্রগুরুর কাছে একজন তরুণ শিক্ষা গ্রহণ করতে যেতে চাইছে। এতে ভুলের কী আছে বাবা ?'

'আছে, আছে।' বলে নিশ্চুপ হলেন হিরণ্যধনু।

পিতা আরও কিছু বলেন কি না শুনবার জন্য অপেক্ষায় থাকল একলব্য। হিরণ্যধনু তাঁর নীরবতা ভাঙছেন না দেখে একলব্য নিচু স্বরে আবার জিজ্ঞেস করল, 'কী ভুল বাবা ?'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিরণ্যধনু যেন একলব্যের কথা শুনতে পান নি। গবাক্ষ দিয়ে দূর-পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

বিশাখা স্বভাবসুলভ শান্ত স্বরে হিরণ্যধনুকে বললেন, 'কিছু বলছ না যে! একলব্য তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করছিল।'

সহধর্মিণীর দিকে কোমল চোখে তাকালেন হিরণ্যধনু। তারপর সেই চোখ ফেরালেন একলব্যের দিকে। বললেন, 'তোমার জীবনপথে অন্তরায় সৃষ্টি করার জন্য আমি তোমাকে সতর্ক করছি না। ভুলের মাশুল গোনার আগে তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি মাত্র। তুমি যেও না দ্রোণাচার্যের কাছে। তুমি ব্যর্থ হবে। তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে না।'

একলব্য অস্থির গলায় দ্রুত বলে উঠল, 'আপনি কি আমাকে অভিশাপ দিচ্ছেন বাবা?'

এবার প্রশান্ত চোখে অনেকক্ষণ একলব্যের দিকে তাকিয়ে থাকলেন হিরণ্যধনু। তারপর স্নেহময় কণ্ঠে বললেন, 'তুমি আমার পুত্র, জীবনের অবলম্বন। উত্তরাধিকারীর মূলভূমি তুমি আমার। তোমার জন্য কি আমার অভিসম্পাত সাজে?'

'তাহলে, তাহলে আমাকে বাধা দিচ্ছেন কেন বাবা?'

'বাধা দিচ্ছি—তোমার ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি বলে।'

'কী ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছেন? মন্দ কিছু কি?' অস্পষ্ট শ্লেষ একলব্যের কণ্ঠে একটু করে ঝিলিক দিয়ে উঠল বুঝি।

পুত্রের প্রশ্নের কোনো উত্তর দিলেন না হিরণ্যধনু। তাঁর সারা মুখে ইতস্তত ভাব। এক গভীর উদ্বেগ তাঁকে ঘিরে ধরেছে। পুত্রের প্রশ্নের উত্তর দিলে রূঢ় সত্যটা বেরিয়ে আসবে। এই অপ্রিয় সত্য একলব্যের হৃদয় ভেঙে চুরমার করে দেবে। তার চেয়ে মৌন থাকাই উত্তম। হিরণ্যধনু ভাবলেন—একলব্য নাছোড়। দ্রোণাচার্যের কাছে অস্ত্রচালনা শিখবার জন্য সে যাবেই। তার কথাবার্তা আর আচরণ বলছে—এ ব্যাপারে পিতার নিষেধ শুনতে সে রাজি নয়। সুতরাং বাধার প্রাচীরকে আর সুদৃঢ় করা উচিত হবে না।

হিরণ্যধনু ঠিক করলেন—একলব্যকে আর বাধা দেবেন না। একলব্য দ্রোণাচার্যের কাছে যেতে চায়, যাক। সে যুবক। তারুণ্যের অনুরণন তার শিরায় শিরায়। উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাকে উদ্বেল করেছে। পিতার নিষেধ যে যথার্থ কারণে, তা খুলে বললেও একলব্য এখন বুঝবে না; বুঝতে চাইবেও না সে এই মুহূর্তে। তাই একলব্যকে দ্রোণাচার্যের কাছে যেতে দেওয়া উচিত। ঠেকে শিখুক সে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন হিরণ্যধনু। তারপর বললেন, 'তুমি প্রস্তুত হতে থাকো পুত্র। পুরোহিত ডেকে আমি তোমার যাত্রার দিনক্ষণ নির্ধারণ করে দিচ্ছি। তুমি আচার্য দ্রোণের কাছ থেকে অস্ত্রবিদ্যাশিক্ষা গ্রহণ করে যথার্থ ধনুর্ধর হয়ে রাজধানীতে ফিরে এসো। রাজপ্রাসাদ প্রস্তুত থাকবে তোমাকে স্বাগত জানাবার জন্য। আমরা তোমার ফেরার দিনের অপেক্ষায় থাকব।' স্ত্রী বিশাখার দিকে তাকিয়ে কথা শেষ করলেন হিরণ্যধনু।

পিতার কথা শুনে বিস্মিত চোখে কিছু একটা বলতে চাইল একলব্য। হিরণ্যধনু তাঁর ডান হাতটা তুলে একলব্যকে আর কিছু বলতে নিষেধ করলেন। তাঁর চোখেমুখে তখন বেদনা আর বাৎসল্যের মাখামাখি।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুরুর পথ গুরুর আঙিনাতেই যাওয়ার পথ।

অপরাহ্ণ।

রোদের গায়ে পাতলা কুয়াশার আস্তর।

নৃপাসনে বসে আছেন অনোমদর্শী।

অনোমদর্শী মহারাজ হিরণ্যধনুর পিতা। দীর্ঘদেহী। বয়োভারে কিছুটা ন্যুব্জ। পক্ব কেশ। চামড়া সামান্য কুঁচকে গেছে। সবল পেশি এখনো অনোমদর্শীর শরীরে বর্তমান। কুচকুচে কালো শরীরে অপরাহ্ণের ছেঁড়া রোদ ঝিলিক দিচ্ছে। পুত্র হিরণ্যধনু রাজকার্যে দক্ষ হয়ে উঠলে একদিন পুত্রহস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করলেন তিনি।

প্রবীণ পারিষদরা বাধা দিয়েছিলেন, 'মহারাজ, এখনো আপনার শরীরে নদীর খরস্রোত, আপনাকে সামনে দেখে পশুরাজ এখনো লেজ গুটিয়ে পালায়। আপনার শাসনে এই অরণ্যরাজ্যের সকল প্রজা পরম সুখে আছে। আপনি এখনো একজন সক্ষম বিচক্ষণ বিচারক। আপনি কেন এখন রাজ্যভার যুবরাজ হিরণ্যধনুর হাতে তুলে দেবেন ? আপনি আরও কিছু বছর রাজ্য শাসন করুন।'

অনোমদর্শী পারিষদদের কথা শুনে বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকলেন। তারপর বললেন, 'হিরণ্যধনু যুবক হয়ে উঠেছে। তার রাজকার্যদক্ষতা প্রশংসনীয়। কঠিন সমস্যার সহজ সমাধান দিতে শিখে গেছে হিরণ্যধনু। তাকে বিয়ে করিয়েছি। ও আমার একমাত্র পুত্র। আমার বয়স হয়ে গেছে। রাজকার্য পরিচালনার জন্য যে পরিমাণ দম আর বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন, এখন তার কিছুটা ঘাটতি আমি আমার মধ্যে লক্ষ করছি। তা ছাড়া...।'

সেনাধ্যক্ষ মহারাজ অনোমদর্শীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, 'তা ছাড়া! তা ছাড়া কী মহারাজ ?'

'বলছি। পুত্র উপযুক্ত হয়ে উঠলে মাতা-পিতার মন তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। হিরণ্যধনু উপযুক্ত হয়ে উঠেছে। তাকে রাজ্যভার দিয়ে আমি নিশ্চিত হতে চাই যে, সে একজন সুবিবেচক এবং সুশাসক। তাই আমার সকল ইন্দ্রিয় সক্রিয় থাকতে থাকতে হিরণ্যকে রাজা ঘোষণা করে তার রাজ্যশাসন প্রণালিটা আমি দেখে যেতে চাই। তোমরা আমাকে বাধা দিয়ো না। মৃত্যুর আগে এই তৃপ্তিটুকু পেতে চাই—হিরণ্যধনু ব্যাধসমাজের একজন খ্যাতিমান রাজা।'

তাঁর কথা শুনে সেদিনের রাজসভার সকল পারিষদ আর কথা বাড়ান নি।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভক্ষণে অনোমদর্শী হিরণ্যধনুকে রাজসিংহাসনে বসিয়েছিলেন।

রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরের একটি কক্ষকে রাজকীয়ভাবে সুসজ্জিত করিয়েছেন হিরণ্যধনু। রাজসভার আদলে এই কক্ষটি নির্মাণ করা হয়েছে। পাশেই অনোমদর্শীর শয্যাকক্ষ। একা থাকেন তিনি ওই কক্ষে। বেশ ক'বছর আগে রাজমাতার মৃত্যু হয়েছে। পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণের পর রাজপিতা এই কক্ষে বাস করা শুরু করেছেন। রাজার শয্যাকক্ষটি পুত্র হিরণ্যধনুর অনুকূলে ছেড়ে দিয়েছেন অনোমদর্শী। কারণ এখন তিনি মহারাজা নন, রাজপিতা মাত্র।

রাজপিতা হলে কী হবে, রাজকার্য পরিচালনায় অথবা পরিবারকেন্দ্রিক কোনো সংকট দেখা দিলে হিরণ্যধনু পিতার পরামর্শ গ্রহণ করেন। পিতার শয্যাকক্ষের পাশের রাজকীয় কক্ষে এসে বসেন। পিতা এসে নৃপাসনে বসেন, পুত্র সাধারণ একটা আসন গ্রহণ করে পিতার পায়ের কাছে বসেন।

আজ হিরণ্যধনুর পরিবারে সংকটকাল উপস্থিত। একলব্য হস্তিনাপুর গমনে উদ্যত। সে দ্রোণাচার্যের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিখবার জন্য বেপরোয়া। পুত্রকে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন বটে, তারপরও মনটা বড় খচখচ করছে। পিতার পরামর্শই শিরোধার্য। তাই আজ অপরাহ্নে পিতার কাছে এসেছেন হিরণ্যধনু; উপদেশের জন্য, পরামর্শের জন্য। হিরণ্যধনু এই মুহূর্তে কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

পিতা কক্ষে প্রবেশ করলে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন হিরণ্যধনু। অনোমদর্শী বললেন, 'বসো, বসো।' নিজে আসন গ্রহণ করে পুত্রের দিকে তাকালেন। দেখলেন—ভীষণ একটা উদ্বিগ্নতা হিরণ্যধনুর চোখেমুখে। কী রকম যেন বিপর্যস্ত অবস্থা তার! কঠিন সমস্যাতেও বিচলিত হয় না যে, তাকে বিষণ্ন-বিচলিত দেখে অনোমদর্শী নিজের মধ্যেও চঞ্চলতা অনুভব করলেন। নিজেকে সংযত করে বললেন, 'তুমি কি কোনো সংকটে পড়েছ হিরণ্য ?'

হিরণ্যধনু বিব্রতমুখে বললেন, 'হ্যাঁ, বাবা।'

'রাজ্যসংক্রান্ত কিছু কি ?'

'না বাবা।'

'তাহলে!' বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন অনোমদর্শী।

'পরিবারসংক্রান্ত।' মাথা নিচু করে উত্তর দিলেন হিরণ্যধনু।

'পরিবারসংক্রান্ত! তোমার পরিবারে আবার কী সংকট ? তোমার মা নেই, মানি। বাবা তো আছি। তোমার ঘরে কোনো যুবতি কন্যা নেই। যুবতি কন্যারা পারিবারিক সংকট তৈরি করে। তা ছাড়া, তোমার তো একটিমাত্র সন্তান—একলব্য। কৈশোর ছাড়িয়ে তরুণ হয়ে উঠেছে সে। বিশ বছরের যুবা। বিদ্যার্জন সমাপন করেছে সে। ধীর, স্থির। তবে আবেগটা তার একটু বেশি।' ধীরে ধীরে কথাগুলো বলে গেলেন অনোমদর্শী।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ওই আবেগই কাল হয়েছে। একলব্যের আবেগই পারিবারিক সংকট তৈরি করেছে।' পিতার মুখের কথা অনেকটা কেড়ে নিয়ে বললেন হিরণ্যধনু।

'খুলে বলো।' পুত্রের চোখে চোখ রেখে বললেন অনোমদর্শী।

'একলব্য বলছে—তার অস্ত্রবিদ্যার্জন অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। সে দক্ষ ধনুর্ধর হতে চায়। ধনুর্বিদ্যার জগৎশ্রেষ্ঠ আচার্য হলেন দ্রোণাচার্য। কুরুকুলগুরু দ্রোণাচার্যের কাছে সে ধনুর্বিদ্যার্জনের জন্য যেতে চায়।'

অনোমদর্শীর বুক থেকে ভারী একটা পাথর সরে গেল। তিনি ভেবেছিলেন—দুর্বিষহ কোনো সংকট বুঝি। এ তো পিতার উদ্বিগ্নতা আর পুত্রের আবেগের সাংঘর্ষিক সংকট। এ সংকট অনতিক্রম্য নয়।

হালকা চালে অনোমদর্শী বললেন, 'পুত্র তোমার যুবক হয়ে উঠেছে। অস্ত্রবিদ্যার্জনে উন্মুখ সে। শুনে যা বুঝছি—নিষাদরাজ্যের অস্ত্রগুরুর কাছে যা শেখার, তা শিখে ফেলেছে একলব্য। তার ভেতর আরও নিপুণভাবে অস্ত্রচালনা শিক্ষার বাসনা কাজ করছে। মানি—বর্তমানে দ্রোণাচার্যের বাড়া এই ভারতবর্ষে আর কোনো ধনুর্ধর নেই। তাঁর কাছেই ধনুর্বিদ্যা শিখা উচিত, যদি একলব্য আরও শিখতে চায়। তাকে যেতে দাও।' বলে মৌন হলেন অনোমদর্শী।

'বাবা, আপনি কি সব বুঝেশুনে এই কথা বলছেন? আর্য-অনার্যের ব্যাপারটি...।' কথা শেষ না করেই থেমে গেলেন হিরণ্যধনু।

'আর্য-অনার্যের দ্বন্দ্বের চেয়ে তোমার মধ্যে পুত্র একলব্যের জন্য প্রবল উৎকণ্ঠা কাজ করছে। এই নবীন বয়সে একমাত্র পুত্র বহির্দেশে যাবে, তার নিরাপত্তা নিয়ে তুমি উদ্বেগাকুল। যদি তার কিছু হয়, সর্বনাশ হয়ে যাবে তোমার, একমাত্র উত্তরাধিকারী হারাবে তুমি। তোমার মধ্যে বাৎসল্য প্রবল; যেটা রাজাদের মধ্যে থাকতে নেই।' ধীরে ধীরে বলে গেলেন অনোমদর্শী।

পিতা যেন পুত্রের অন্তর্চিত্র স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। নইলে হুবহু তাঁর মনের কথাটা পিতা কীভাবে বলে গেলেন! তবে এটাও তো মিথ্যে নয় যে, আর্যরা প্রথম থেকেই অনার্যদের ধ্বংস চেয়েছে। তারা অবিরত চেষ্টা করে গেছে ভারতবর্ষের আদিবাসীদের পদানত করে রাখবার জন্য। তাদের শাস্ত্রে, সাহিত্যে, সংহিতায়, পুরাণে সর্বত্র কুৎসিতভাবে অনার্যদের রূপায়িত করেছে। তাদের কাছে অনার্যরা মানুষ নয়; তারা দানব, তারা অসুর। তারা সংস্কৃতিহীন।

'রামায়ণে'র কাহিনির দিকে তাকালে এই কথার প্রমাণ মিলে। সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর রাবণ। তাঁর দোর্দণ্ডপ্রতাপে ত্রিভুবন কাঁপত। সেই রাবণকে কী বীভৎসভাবেই না আঁকলেন বাল্মীকি! বাল্মীকি ব্রাহ্মণ বলে তাঁর হাতে রাবণ হয়ে গেলেন রিরংসাপরায়ণ হিংস্র একজন রাজা। তাঁর মধ্যে কোনো ন্যায়পরায়ণতা নেই, কোনো ভ্রাতৃবাৎসল্য নেই। রাম কি ন্যায়পরায়ণ? রাম যদি ন্যায়পরায়ণ হন, তাহলে নিরপরাধ বালীকে হত্যা করলেন কেন?


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপাপবিদ্ধা সীতাকে গর্ভবতী অবস্থায় চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে বনবাসে পাঠালেন কেন ? শাস্ত্রজ্ঞ শম্বুক মুনিকেই হত্যা করলেন কেন রাম ?

শম্বুক শূদ্র বলে তাঁকে নির্মমভাবে নিধন করলেন রামচন্দ্র। কারণ আর্যশাস্ত্র বলেছে—শূদ্রদের আর্য শাস্ত্রাদি পাঠ অপরাধ। ব্রাহ্মণরা রামের কাছে দাবি করেছে—শূদ্রের আর্যশাস্ত্র পাঠ করার পাপে এক ব্রাহ্মণপুত্র মরেছে। ব্রাহ্মণের অভিযোগকে যুক্তি দিয়ে বিচার করলেন না রামচন্দ্র, বিচার করলেন আর্যশাস্ত্রের অন্ধ সংহিতার আলোকে। এত বড় একজন নৃপতি হয়ে ব্রাহ্মণদের যুক্তিহীন যুক্তিতে ভেসে গেলেন রাম। হত্যা করলেন ধ্যানমগ্ন শাস্ত্রজ্ঞ শম্বুক মুনিকে।

এই-ই তো আর্যধর্ম, এই-ই তো আর্য অভিব্যক্তি। দ্রোণাচার্য আর্য-নৃপতি লালিত ব্রাহ্মণ। তিনি কি আর্য-সংস্কার থেকে বিচ্ছিন্ন ? কখনো নন। একজন ক্ষত্রিয়পুষ্ট আচার্য কোনোক্রমেই স্বাধীনচেতা হতে পারেন না। পিতা যা বলেছেন তা যেমন সত্যি, আবার অনার্যদের প্রতি আর্যদের নিষ্ঠুর আচরণের ব্যাপারটিও অস্বীকার করবার উপায় নেই।

পিতা অনোমদর্শী বহুদর্শী। জীবনের বহু বন্ধুর পথ অতিক্রম করে এসেছেন তিনি। বহুবার আর্যদের বিরুদ্ধে সমরে লিপ্ত হতে হয়েছে তাঁকে। এর পরও আর্য-নির্মমতার বিষয়টি এড়িয়ে যেতে চাইছেন কেন ? এর পশ্চাতে পিতার নিজস্ব কোনো ভাবনা কাজ করছে কি ?

'তুমি বোধহয় ভাবছ—আর্য-হিংস্রতা এড়িয়ে তোমার সামনে সন্তানবাৎসল্যকে বড় করে তুলছি কেন ? কেনইবা তোমার পুত্রের বাসনাকে বেশি মূল্যায়ন করছি।' বলে হিরণ্যধনুর মুখের দিকে তাকালেন অনোমদর্শী। পুত্রের উত্তরের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন।

হিরণ্যধনু মুখে কিছু না বলে পিতার দিকে প্রশ্নাতুর চোখে তাকিয়ে থাকলেন।

অনোমদর্শী নৃপাসনে গা এলিয়ে দিলেন। বললেন, 'আর্যরা এদেশে বহিরাগত। যাযাবর তারা। ঊষর দেশ থেকে তারা এই ভারতবর্ষে এসেছে। এ দেশের শস্যশ্যামল রূপ দেখে, ফুলে ফুলে পূর্ণ মাঠ দেখে, জলপূর্ণ নদী দেখে উৎফুল্ল হয়েছে তারা। উল্লাস একটু স্তিমিত হয়ে এলে তারা বুঝেছে—এ ফসল, এ উর্বর জমি, এ নদী, বৃক্ষ-অরণ্য তো তাদের নয়। এগুলোর মালিক তো এ দেশেরই আদিবাসীরা। সুতরাং ওদের মেরেকেটে এগুলো দখল কোরো। হিংস্রতা দেখিয়ে, বর্বরতার আশ্রয় নিয়ে নগর-ফসলিমাঠ নিজেদের অধিকারে আনো। এটা সত্য যে, ভারতবর্ষের আদিবাসীরা যুদ্ধে তেমন দক্ষ নয়। প্রতিবেশী রাজাদের সঙ্গে ছোটোখাটো যুদ্ধ ছাড়া তো বড় কোনো যুদ্ধ তাদের করতে হয় নি। আর্যরা ঘোড়াকে পোষ মানিয়ে নিজেদের বাহন করেছে। নানা ধরনের অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার করেছে। অসি চালনায় অত্যন্ত দক্ষ তারা। আমরা নিষাদ। আমাদের বিশ্বাস ছিল, তীর চালনায় নিষাদরা বুঝি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু আর্যদের বিরুদ্ধে সমরে লিপ্ত হয়ে বুঝেছি, তীর চালনায় অতুলনীয় দক্ষ তারা। তারাই শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ।' দম ফুরিয়ে এল অনোমদর্শীর। থামলেন তিনি।

তারপর ধীরে ধীরে আবার বললেন, 'তীর চালনার প্রকৃত বিদ্যে ওরা নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছে। আমরা যে ধনুর্বিদ্যা অর্জন করেছি, তাতে খাদ আছে। ওই খাদযুক্ত


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদ্যে নিয়েই আমাদের অহংকার। কিন্তু এ অহংকার যথার্থ নয়। যুদ্ধে আর্যদের কখনো যদি হারাতে চাও তাহলে ওদের তীর নিক্ষেপণজ্ঞান দখলে আনতে হবে। বর্তমান ভারতবর্ষে দ্রোণাচার্যের চেয়ে বড়ো কোনো অস্ত্রগুরু নেই। তোমার ছেলে একলব্য যদি তাঁর কাছ থেকে ধনুর্বিদ্যা অর্জন করে আসতে পারে তাতে আমাদের লাভ। একলব্য এই বিদ্যা নিষাদদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবে। একটা সময়ে ব্যাধসমাজে অসংখ্য ধনুর্বিদ তৈরি হবে। অস্ত্রবিদ্যায় আর্যদের সমকক্ষ হয়ে উঠব আমরা।'

একটু থেমে আবার বললেন, 'আমি বলি কী, একলব্যকে দ্রোণাচার্যের কাছে যাবার অনুমতি দাও তুমি। শুধু অনুমতি নয়, উৎসাহ জোগাও তাকে।'

এতক্ষণে কথা বললেন হিরণ্যধনু, 'নিষাদপুত্রকে কি দ্রোণাচার্য শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করবেন ?'

'ওটা একলব্যের ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দাও। ভাগ্য প্রসন্ন হলে শিষ্য হিসেবে একলব্যকে গ্রহণ করতেও পারেন আচার্য। আর ভাগ্য অপ্রসন্ন হলে হারানোর তো কিছু নেই।'

'না পিতা, বলছিলাম—একলব্য সেই ছোটবেলা থেকে আবেগতাড়িত। প্রত্যাখ্যানের বেদনা যদি সইতে না পারে ? যদি বিহ্বল হয়ে কিছু একটা করে বসে ?'

'তুমি প্রত্যাখ্যানের কথা ভাবছ কেন ? গ্রহণের আনন্দের কথা ভাবছ না কেন ? দ্রোণাচার্য উদার মানুষ। তোমার পুত্রকে বুকে টেনেও তো নিতে পারেন।'

'তারপরও একলব্যের ভাবাবেগের কথা ভাবছিলাম। তরুণ বয়স। চিন্তাশক্তি তত পরিপক্ব হয় নি। বাস্তবতা তো বড় কঠিন বাবা।' চিন্তান্বিত কণ্ঠে হিরণ্যধনু বললেন।

অনোমদর্শী বললেন, 'ওটাই আমার ভরসার জায়গা। তারুণ্যই একলব্যকে জাগিয়েছে। দ্রোণাচার্যের কাছে শিক্ষাগ্রহণের ব্যাপারটি তোমার মাথায় তো আসে নি। এই যে আমার এত বয়স হলো, আমিও তো ভাবি নি—একলব্য ভুবনবিখ্যাত অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের কাছে গিয়ে ধনুর্বিদ্যা শিখে আসুক। আমারই তো উচিত ছিল—তোমাকে আর তোমার ছেলেকে প্রণোদিত করা দ্রোণাচার্যের কাছে যাওয়ার জন্য। সেই প্রণোদনা একলব্যের ভেতরে আপনাতেই স্ফুরিত হয়েছে। তার প্রণোদনাকে উৎসাহিত করা উচিত আমাদের, যাতে সে আরও বেশি উদ্দীপিত হয়ে ওঠে।'

হিরণ্যধনু মাথা নিচু করে অনেকক্ষণ কী যেন ভাবলেন। তাঁর চোখেমুখে রোদমেঘের খেলা। উদ্দীপনা আর হতাশা তাঁর সমস্ত অবয়ব ঘিরে। ছেলে যদি দ্রোণাচার্যের কাছে অস্ত্রবিদ্যার্জন সম্পন্ন করে রাজপ্রাসাদে ফিরে আসতে পারে তাহলে নিষাদকুলে মস্তবড় একটা ঘটনা হয়ে যাবে। এর আগে কোনো নিষাদ আর্যগুরুর কাছে বিদ্যার্জন করার সৌভাগ্য লাভ করে নি। একলব্যই প্রথম সেই সৌভাগ্যের অধিকারী হবে। সে যে কত বড় উল্লাসের ব্যাপার হবে, ভাবতেই শিহরণ বোধ করছেন হিরণ্যধনু।

আর যদি ব্যর্থ হয় ? যদি দ্রোণাচার্য ঘৃণায় ফিরিয়ে দেন একলব্যকে ? তাহলে, তাহলে একলব্যের কী হবে ? কিচ্ছু হবে না। বাবা বলছেন, আচার্য দ্রোণ অসাধারণ একজন মানুষ।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর হৃদয় আকাশের মতো বিশাল। সেই বিশাল হৃদয়ে একলব্যের মতো একজন নিষাদ সন্তানকে অবশ্যই স্থান দেবেন তিনি। কিন্তু যদি একলব্যকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ না করেন তিনি, যদি দূর দূর করে তাড়িয়ে দেন ? অস্থির মনে এসব ভাবতে থাকেন হিরণ্যধনু। তিনি খেয়াল করেন নি পিতা অনোমদর্শী পলকহীন চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। পিতার দিকে চোখ পড়তেই বিব্রত হলেন হিরণ্যধনু। মাথা অবনত করলেন তিনি।

অনোমদর্শী নরম গলায় বললেন, 'দ্বিধা ঝেড়ে ফেলো হিরণ্য। বড় কিছু পেতে হলে, ছোট কিছু ত্যাগ করতে হয়। দ্রোণাচার্যের কাছে একলব্যের অস্ত্রশিক্ষা গ্রহণ করা বিরাট একটা ব্যাপার। আর তোমার সন্তানবাৎসল্য ক্ষুদ্র একটা ব্যাপার। একটা ব্যক্তিগত আর অন্যটা সামষ্টিক। ও আর্যশিক্ষা সমাপ্ত করে এলে এই রাজ্যের মর্যাদা অনেক বেড়ে যাবে। অন্যান্য নিষাদ রাজারা তোমার পুত্রকে সমীহের চোখে দেখবে। আর আমাদের মধ্যে তো হানাহানি লেগেই আছে। তোমার পুত্রের ধনুর্শক্তি ভারতবর্ষে প্রচারিত হয়ে গেলে ব্যাধবংশের কোনো রাজা হিরণ্যধনুর রাজ্যাক্রমণে সাহস করবে না। দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলো পুত্র। একলব্যের যাত্রার আয়োজন কোরো।'

হিরণ্যধনু কী যেন একটা বলতে চাইলেন। দ্বিধান্বিত চোখে পিতার দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

অনোমদর্শী জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছু বলতে চাইছ ?'

'হ্যাঁ বাবা, আপনার অনুমতি ছাড়া, মনে সাংঘাতিক দ্বিধা থাকা সত্ত্বেও একলব্যকে আমি আশ্বস্ত করেছি যে, তার যাত্রার ব্যাপারে আমার আপত্তি নেই।'

'এই তো যথার্থ বুদ্ধিমানের কাজ করেছ।'

'কিন্তু বাবা, আপনার অনুমতি না নিয়ে... ।'

হিরণ্যধনুর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে অনোমদর্শী বললেন, 'এ বিষয়ে আমার অনুমতি নেওয়াটা বাহুল্যের ব্যাপার। পুত্র তোমার। একলব্যের ওপর তোমার পূর্ণ অধিকার। আর এটা তো হিতকর কাজ। রাজ্যের হিত, একলব্যের মঙ্গল। দ্রোণাচার্যের কাছে একলব্যের অস্ত্রশিক্ষার ব্যাপারটি তোমার বংশগৌরব বাড়াবে। আর হ্যাঁ, তুমি তো একলব্যকে একেবারে যাত্রা করিয়ে দিয়ে আমার অনুমতি প্রার্থনা করছ না।'

'তা করি নি বাবা। কিন্তু সম্মতি তো দিয়েছি। এমনভাবে চাপাচাপি করছিল সে... ।'

'সম্মতি দিয়ে তুমি ভালোই করেছ। আমার সঙ্গে পরামর্শের কথা ভেবে যদি তুমি একলব্যকে তাৎক্ষণিক সম্মতি প্রদান না করতে, তাহলে সে মুষড়ে পড়ত। হতাশা তাকে ঘিরে ধরত। ভাবত, তুমি তার উচ্চাশার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছ। তুমি তাৎক্ষণিক সম্মতি দিয়ে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছ।' একটু দম নিয়ে অনোমদর্শী আবার বললেন, 'তা ছাড়া একলব্যের আকাঙ্ক্ষা আর তোমার সিদ্ধান্ত বিষয়ে আমার তো কোনো দ্বিমত নেই।'

পিতার কথা শুনে সেই অপরাহ্নে হিরণ্যধনুর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পিতার অনুমতি ছাড়া পুত্রকে যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণের আদেশ দিয়ে একধরনের অপরাধবোধে বিব্রত



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিলেন হিরণ্যধনু। অনোমদর্শীর উদ্দীপনা আর সম্মতিতে তাঁর ভেতরের সকল দ্বিধা এবং অপরাধবোধ কেটে গেল।

হিরণ্যধনু পিতার কাছে গৃহান্তরে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলেন।

স্মিত হেসে পুত্রের দিকে তাকালেন অনোমদর্শী। মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'বিশাখার সঙ্গে আলোচনা করেছ কি ? একলব্যের ওপর তারই সর্বাধিকার।'

'আজ সকালে একলব্যের সঙ্গে আলাপের সময় বিশাখা উপস্থিত ছিল। আশা করি তার সম্মতি আছে। আর যদি না-ই থাকে, আপনার কথাগুলো তাকে বোঝালে সানন্দে রাজি হবে বলে আমার বিশ্বাস।' হিরণ্যধনু বললেন।

'তোমাদের সবার মঙ্গল হোক। অবিলম্বে একলব্যের যাত্রার আয়োজন কোরো।' অনোমদর্শী বললেন।

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওরে যাত্রী,
...ঘরের মঙ্গলশঙ্খ নহে তোর তরে,
নহে রে সন্ধ্যার দীপালোক,
নহে প্রেয়সীর অশ্রুচোখ।
পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্বাদ
শ্রাবণরাত্রির বজ্রনাদ।
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা,
পথে পথে গুপ্তসর্প গূঢ়ফণা।
নিন্দা দিবে জয়শঙ্খনাদ—
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।

সায়াহ্ন।

AMARBOI.COM

পাহাড়ি পথ।

এবড়োখেবড়ো। জঙ্গলাকীর্ণ। ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সরু একটা পথ এগিয়ে গেছে সামনের দিকে। অরণ্যবিজ্ঞ ব্যাধ সংবাদ এনেছে, এই পথ দিয়ে এগোলে একটা সময়ে হস্তিনাপুরের রাজপথের সন্ধান মিলবে। তবে তা বহু যোজন দূরে। বহু ক্রোশ, বহু যোজন অতিক্রম করলে তবেই কাঙ্ক্ষিত রাজপথের দেখা পাওয়া যাবে।

ওই সরু পথ ধরে একলব্য এগিয়ে চলেছে হস্তিনাপুরের দিকে। একা। আজ প্রত্যুষে যাত্রা শুরু করেছে একলব্য। যাত্রার সূচনাতে বেশকিছু সৈন্যসামন্ত তার সঙ্গে ছিল। বহুটা পথ একসঙ্গে এসেছিল তারা। হিরণ্যধনুর নির্দেশনা ছিল—হস্তিনাপুর পর্যন্ত তারা একলব্যের সঙ্গে যাবে। যাত্রার সময় একলব্য নিশ্চুপ থাকলেও একটা সময়ে সৈন্যদের থামিয়েছিল সে। বলেছিল, 'তোমরা রাজধানীতে ফিরে যাও। আমি এই দুর্গম পথ বেয়ে একাই যাব, হস্তিনাপুরে।'

দলপ্রধান বলেছিল, 'আমরা আপনার আদেশ মানতে অক্ষম যুবরাজ। মহারাজ যা বলেছেন, তা-ই মানতে হবে আমাদের। হস্তিনাপুর পর্যন্ত আপনার সঙ্গ না ছাড়ার নির্দেশ আছে আমাদের ওপর।'

'রাজার আদেশ রাজ্যসীমার অভ্যন্তরে বলবৎ থাকে। এখন আমরা মহারাজ হিরণ্যধনুর রাজ্যসীমার বাইরে। এখানে তাঁর আদেশ কার্যকর নয়। এই দলের প্রধান তুমি। কিন্তু


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানে আমিই সর্বাধিক মর্যাদাবান। মর্যাদাবানের আদেশ রক্ষা করা তোমার কর্তব্য দলপতি।' একলব্য জানে—এ খোঁড়া যুক্তি। রাজ্যের ভেতরে বা বাইরে সৈন্যরা রাজাদেশ মানতে বাধ্য। জেনেও একলব্য একথা বলেছে। কেউ তার সঙ্গে থাকুক—এটা সে চাইছিল না। অনেক লোক সঙ্গে থাকলে গতি শ্লথ হয়, মনোসংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। সে দ্রোণাচার্যের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছে। যেন সে তীর্থদর্শনে যাচ্ছে। তীর্থার্থীরা ঘর থেকে বেরোলেই তাদের মনপ্রাণ তীর্থমুখী হয়ে যায়। জাগতিক বিষয়-আশয় তাদের কাছে তুচ্ছ মনে হয়। মনে শুধু এই ভাবনা ক্রিয়াশীল থাকে, কখন তীর্থদর্শনে সক্ষম হব। একলব্যের মনেও তীর্থদর্শনের আকুতি। কখন দ্রোণাচার্যের শ্রীচরণে নিজকে সমর্পণ করে পরম তৃপ্তি লাভ করবে ? কবে আচার্যের শিষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়ে নিজেকে ধন্য মনে করবে ? এই সৈন্যদল, এই সাড়ম্বরতা তার কাছে অর্থহীন বলে মনে হচ্ছে। তার জীবনে মহার্ঘ হলো আচার্য দ্রোণের শিষ্যত্ব লাভ। তাই দলপতিকে এই খোঁড়া যুক্তি দেখাতে দ্বিধা করল না একলব্য।

দলপতি কিন্তু বুদ্ধিমান। বিনীত গলায় বলল, 'রাজ্য সীমানার বাইরে রাজাদেশ অন্যের কাছে গৌণ। কিন্তু সেই রাজ্যের প্রজার কাছে বা সৈন্যের কাছে রাজাদেশ সর্বদা, সর্বস্থানে মাননীয় এবং পালনীয়। আপনার আদেশ মানতে না পারার জন্য ক্ষমা চাইছি যুবরাজ।'

ফাঁপরে পড়ে গেল একলব্য। বুঝল—আদেশ দিয়ে এদের রাজি করানো যাবে না; আবেগ দিয়ে এদের পরাস্ত করতে হবে। গলায় যতটুকু সম্ভব আবেগ ঢেলে বলল, 'দেখো, আমি যাচ্ছি গুরুর কাছে। গুরুর কাছে যেতে হয় নিরাভরণ হয়ে। দীন বেশে একনিষ্ঠ মনে গুরুদর্শনে যেতে হয়। তোমরা আমার আভরণ। তোমরা যতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকবে, আমার মনে তীব্র একটা অহংকার কাজ করবে—আমি রাজপুত্র, আমার চারদিকে সৈন্যসামন্ত, বাজনাবাদ্যের জয়ডঙ্কা। এসবকিছু আমার ভেতরের একনিষ্ঠতাকে চুরমার করে দিচ্ছে। যে ভক্তি গুরুপ্রাপ্তির সর্বোত্তম পথ, তা একেবারেই নস্যাৎ করে দিচ্ছে তোমাদের উপস্থিতি। সুতরাং তোমরা আমাকে সাহায্য কোরো, তোমরা ফিরে যাও। আমি একান্ত মনে গুরুকে স্মরণ করতে করতে হস্তিনাপুরের দিকে এগিয়ে যাই।'

আবেগ সব মানুষকে কোনো না কোনো সময়ে স্পর্শ করে। আর বক্তা যদি হর্তাকর্তা কেউ হন, তাহলে অধীনস্থদের সেই আবেগ তীব্রভাবে আবৃত করে। একলব্যের আবেগজড়ানো কথাগুলো দলপতিকে স্পর্শ করল। আমতা আমতা করে বলল, 'মহারাজ যদি অপরাধ ধরেন ? যদি জিজ্ঞেস করেন, যুবরাজ একলব্যকে অর্ধপথে ত্যাগ করে কেন চলে এসেছ ?'

'বাবা আমার ভাবাবেগ জানেন। আমার তৃপ্তির মূল্য তাঁর কাছে সর্বাধিক। তোমরা বুঝিয়ে বললে বাবা বুঝবেন। ফিরে যাও তোমরা। আমাকে একা যেতে দাও।' একলব্য বলল।

দলপতি বলল, 'ঠিক আছে, আমরা ফিরে যাব। কিন্তু আমার একটা কথা আপনাকে রাখতে হবে। দু'জন পথপ্রদর্শক সৈন্য আপনার সঙ্গে যাবে। এই পথের অন্ধিসন্ধি জানে ওরা। জন্তুজানোয়ারের গতিবিধি বোঝে। চড়াই-উৎরাইয়ের খোঁজখবর ওদের নখদর্পণে। ওরা আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, হস্তিনাপুর পৌঁছে দেবে।'


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ঠিক আছে। আমি রাজি।' মৃদু বক্র একটা হাসি একলব্যের সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল।

ফিরে গিয়েছিল সৈন্যদল। ডঙ্ক আর লখা থেকে গিয়েছিল। দ্বিপ্রহর হতে কিছুটা সময় বাকি তখন। পথচলা শুরু করেছিল আবার। আগে ডঙ্ক, পাছে লখা। মাঝখানে একলব্য। চলতে চলতে চলতে সূর্য মাথায় স্থির। রাজমাতা বিশাখা সঙ্গে আহারসামগ্রী দিয়েছিলেন। একটা বিশাল বটবৃক্ষের নিচে আহারে বসল একলব্য। একটু দূরে ডঙ্ক আর লখা। অনতিদূরে সরোবর, প্রাকৃতিক।

আহার শেষ করে ডঙ্ককে একলব্য বলল, 'ফিরে যাও তোমরাও।'

ডঙ্ক আকাশ থেকে পড়ল, 'এ কী বলছেন যুবরাজ! ফিরে যাব! আমাদের ঘাড়ে কয়টি মাথা আছে! মহারাজ আমাদের মাথা কাটবেন।'

যুবরাজ একলব্য ইনিয়েবিনিয়ে অনেক কথা বোঝাল তাদের। দলপতিকে বলা কথাগুলো ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তাদের মতো করে বোঝাল। কিন্তু ডঙ্করা নাছোড়, 'জটিল পথ। দুর্গম। ভীষণাকার জঙ্গল। রাত্রি ভয়ঙ্কর। পথঘাট কিছুই চিনেন না আপনি। বেঘোরে প্রাণ যাবে আপনার। না যুবরাজ, আপনার নির্দেশ মানব না আমরা।'

একলব্যের একবার ইচ্ছে হলো প্রচণ্ড ধমক দেয়, বলে, 'এখনই ফিরে যাও তোমরা। নইলে মুণ্ডচ্ছেদ করব।'

কিন্তু একলব্য জানে—এ ধরনের মানুষ জীবন দিতে রাজি, রাজাদেশ লঙ্ঘন করতে নয়। তা ছাড়া, এই ঘটনার সঙ্গে নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর একমাত্র পুত্রের জীবনসংশয়ের ব্যাপারটি জড়িত যে। নিজেকে সংযত করল একলব্য। শান্ত স্বরে বলল, 'দেখো, তোমাদের মতো আমিও তো ব্যাধসন্তান। ছোটবেলা থেকেই এই অরণ্য, এই শ্বাপদ, পর্বতের এই বন্ধুর পথ আমার চেনা। এই পথ দিয়ে হয়তো কোনোদিন আমি আসি নি, কিন্তু এ ধরনের পথের প্রকৃতি তো আমার জানা। তা ছাড়া পথের পাশে পাশে তপোবন। মুনিঋষিদের সাহায্য পাব আমি। পথের সন্ধান জেনে নেব ওদের কাছ থেকে। রাত্রিকালে বা দ্বিপ্রহরে তপোবনে অতিথি হব। এভাবে একদিন পৌঁছে যাব আমি, আমার কাঙ্ক্ষিত স্থানে।'

ডঙ্ক আর লখা চুপ থেকে ছিল।

সেই দ্বিপ্রহর থেকে একলব্যের একা হাঁটা। হাঁটতে হাঁটতে এখন সায়াহ্ন। হাঁটা থামায় নি একলব্য। যতদূর সম্ভব একটানা হেঁটে পথ ফুরাতে হবে তাকে।

এখন তার হাঁটায় গতি নেই। দুপুরের আহারের পর, ডঙ্ক আর লখাকে ফেরত পাঠানোর পর, জোর কদমে হাঁটা শুরু করেছিল সে। সঙ্গে তেমন ভারী কিছু ছিল না। পিঠে শরভর্তি তূণ আর বাঁ কাঁধে ঝুলানো ধনুকটি। কোমরে কুঠার গোঁজা। ব্যাধরা একে টাঙ্গি বলে। গোঁজা টাঙ্গিটির হাতল কাঠের। ফলকটি লোহার। এক ধার ধারালো, অন্য ধার ভোঁতা। ধারালো দিক দিয়ে কাটা যায়, ভোঁতা দিক দিয়ে আঘাত করা যায়। নিকট-যুদ্ধে এটি দিয়ে শত্রুকে খণ্ডবিখণ্ড করা যায়। টাঙ্গি দিয়ে গাছ কেটে বনভূমিতে পথও করা যায়। বালক-বয়স থেকে


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একলব্যের টাঙ্গিপ্রীতি প্রবল। এই টাঙ্গিটি তার আবাল্য সঙ্গী। সকল আবরণ-আভরণ ত্যাগ করলেও একলব্য তীর-ধনুকের সঙ্গে টাঙ্গিটাও রেখে দিয়েছে নিজের সঙ্গে।

কোনো খাবার সে নিজের সঙ্গে নেয় নি। ডঙ্ক সাধাসাধি করেছিল খাবারের পোঁটলাটি সঙ্গে নেওয়ার জন্য। একলব্যের এককথা—নিরাভরণ হয়েই সে গুরুতীর্থের দিকে এগোবে। দ্বিপ্রহরে সৈন্যদের বিদায় করে নিজের শরীর থেকে রাজকীয় আবরণ খুলে ফেলেছিল। ডঙ্ক এবং লখার হাতে গছিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'তোমরাই রাখো এগুলো। বিক্রি করলে কিছু কড়ি মিলবে তোমাদের।'

সাধারণ বেশ ধারণ করেছিল একলব্য। পরনে একখণ্ড বস্ত্র, ঊর্ধ্বাঙ্গে রোদ-শীত নিবারণার্থে মোটা এক টুকরা কাপড়। পাদুকাও ত্যাগ করেছিল সে।

ডঙ্ক বিস্মিত গলায় বলেছিল, 'কাঁটা-খন্দকে ভর্তি পাহাড়ি পথটি। পা রক্তাক্ত হয়ে যাবে যে।'

লখার অনুরোধে আর পরামর্শে পায়ে বল্কল বেঁধে নিয়েছিল একলব্য, পাদুকার মতো করে। প্রথমদিকে পথ চলতে অসুবিধা হলেও এখন সয়ে গেছে।

দুপুর গড়িয়ে বেলা অপরাহ্নের দিকে গেলে গতি কমে এসেছিল একলব্যের। রাজপুত্র। তেমন করে কষ্টসহিষ্ণুতা রপ্ত করতে হয় নি তাকে কোনোদিন। আজই প্রথম কষ্টকর পথের যাত্রী হয়েছে সে। ফলে ক্লান্তি আর অবসন্নতা তাকে একটু একটু করে গ্রাস করতে শুরু করেছে। কিন্তু নিজের মন আর দেহের মধ্যে ক্লান্তিকে স্থান দিতে রাজি নয় সে। এখন থেকে তাকে স্বাবলম্বী হতে হবে। আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। অবসাদকে নিজের মনের মধ্যে জায়গা দিলে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে না সে।

মনে যতই জোর থাকুক, দেহেও তো জোর থাকতে হবে। অশেষ শ্রম শেষে দেহও বিশ্রাম চায়। একলব্য বুঝতে পারে এবার তাকে থামতে হবে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। আঁধার এবার পৃথিবীকে গ্রাস করা শুরু করবে।

কিন্তু কোথায় থামবে সে ? কোথায় রাত কাটাবে ? আশপাশে তো কোনো জনমানুষের চিহ্ন নেই। কোনো তপোবনেরও সন্ধান মিলবে কি না কে জানে ? হঠাৎ একলব্যের চোখ পড়ল আকাশের দিকে। পুবাকাশে বিরাট গোলাকার চাঁদ উঠেছে। পূর্ণিমা বোধ হয়। তিমির আর জোছনার দ্বন্দ্ব চলছে তখন প্রকৃতিতে। কে কাকে হটাবে ? হাঁটা থামাল না একলব্য। আরও কিছুদূর হাঁটার পর একটা আলো তার চোখে পড়ল।

শাণ্ডিল্য ঋষির তপোবন। শাণ্ডিল্য-গোত্রধারার প্রবর্তক শাণ্ডিল্যমুনি। ঈশ্বরকে পাওয়ার তিনটি মার্গ শাস্ত্রকাররা নির্দেশ করেছেন—জ্ঞানমার্গ, কর্মমার্গ এবং ভক্তিমার্গ। ভক্তিসূত্রের প্রচারক শাণ্ডিল্যমুনি। ঋষি শাণ্ডিল্যকে ঘিরে এই তপোবনে এক অবিমিশ্র মানবজীবনবোধের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। তপ, জপ, কর্ম—যা-ই এখানে নিষ্পন্ন হোক, সবকিছুর পেছনে ভক্তিবোধ সক্রিয়। এই তপোবনে মানব এবং মানবেতর প্রাণী সমানভাবে মূল্যায়িত হয়। কোনো প্রাণীকে হীন চোখে দেখা হয় না। সব প্রাণীতে প্রাণ আছে। শাণ্ডিল্য ঋষির এই তপোবনে সকল প্রাণ এক মূল্যসূত্রে গাঁথা। এখানে নেই আর্য-অনার্যের ভেদাভেদ, এখানে


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাত্রবর্ণের ওপর নির্ভর করে মানুষের সঙ্গে আচরণ করা হয় না। কারণ এই আশ্রমের মূলকথা—ভালোবাসা। সকল আশ্রমবাসীর হৃদয় ভালোবাসাময়। শাণ্ডিল্য ঋষিকে ঘিরে যে শিষ্যবর্গের অবস্থান, সবারই অন্তর স্নিগ্ধ, সহনশীল, শান্ত। এই তপোবনের উঠানে একলব্য যখন গিয়ে দাঁড়াল, সাদরে সম্ভাষিত হলো।

সংসারত্যাগী শাণ্ডিল্য। তপোবনবাসী সাধক। শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখমণ্ডল। চোখ দুটো দিয়ে অন্তঃকরণ পড়তে পারেন। এই ঋষির জীবনে লৌকিক হৃদয়চর্চার কোনো স্থান নেই। ঈশ্বরসাধনায় তাঁর সর্বসত্তা উৎসর্গীকৃত। ভেতরে কোনো অস্থিরতা নেই।

একলব্যকে কাছে টেনে নিলেন শাণ্ডিল্য। পথশ্রান্তি দূর করার জন্য শিষ্যদের নির্দেশ দিলেন। একলব্য সমভিব্যাহারে রাত্রির আহার করলেন তিনি। আহার্যদ্রব্য বলতে ফল-মূল—এসব। আহার শেষে ঋষি শাণ্ডিল্য অগ্নিকুণ্ডের চারদিকে সশিষ্য আসন গ্রহণ করলেন। সংক্ষেপে একলব্যের কাছে তার পথচলার কারণ জেনে নিলেন মুনিবর শাণ্ডিল্য। 'তোমার জয় হোক' বলে আলাপ শেষ করলেন। শয্যাকক্ষ নির্দেশ করার জন্য একজন শিষ্যকে আদেশ দিলেন। একলব্যকে উদ্দেশ করে বললেন, 'সকালে যাত্রার আগে কিছু মুখে দিয়ে যেয়ো।'

প্রত্যুষে ঘুম ভাঙল একলব্যের। তারও আগে তপোবন জেগে গেছে। অতি প্রত্যুষে ঋষি শাণ্ডিল্য শয্যাত্যাগ করেন। শিষ্য সমভিব্যাহারে অদূরে সরোবরে গিয়ে অবগাহন করেন। তারপর তপোবনে প্রত্যাগমন করেন। সমবেত কণ্ঠে সূর্যপ্রণাম সম্পন্ন করেন। শিষ্যরা ভিক্ষার উদ্দেশে বের হয়ে যান। ঋষি শাণ্ডিল্য ধ্যানে মগ্ন হয়ে পড়েন।

সূর্যপ্রণামের সমবেত কণ্ঠধ্বনিতে একলব্যের ঘুম ভেঙেছে। পর্ণকুটিরের তৃণশয্যায় উঠে বসেছে সে। গত দিনের পথ হাঁটার ক্লান্তি তখনো সারা শরীরে জড়িয়ে আছে।

আড়মোড়া ভেঙে ক্লান্তি দূর করতে চাইল একলব্য। শরীরে অবসাদকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না। তার আরাধ্য এখনো অনেক দূরে। বহু পথ অতিক্রম করার পর সেই আরাধ্যের সান্নিধ্য পাওয়া যাবে।

শয্যা থেকে উঠে দাঁড়াতে যাবে, ওই সময় এক শিষ্য গৃহদরজায় এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'যুবরাজ, সূর্যোদয় হয়ে গেছে। আপনার প্রস্তুতির সময় পার হয়ে যাচ্ছে। আর বিলম্ব করা ঠিক হবে না। আপনার প্রাতরাশ প্রস্তুত। প্রাতঃকৃত্য শেষ করে আসুন।'

একলব্য মাথা নত করে বলল, 'আমি তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে আসছি।'

তার সমস্ত মুখে কৃতজ্ঞতার হাসি ছড়িয়ে পড়ল।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষমার দীপ্তি দেয় স্বর্গের আলো
প্রেমের আনন্দেরে—
ভালো আর মন্দেরে।

পূর্বাহ্ণ।

গভীর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে একলব্য।

সকালে বাতাসে শৈত্যভাব ছিল। এখন বাতাস তেতে উঠেছে। তবে তেমন করে গরম লাগছে না একলব্যের। কিছুক্ষণ আগে সে খাড়া পাহাড় অতিক্রম করে এসেছে। এখন হাঁটছে ঢালু পথ দিয়ে। পাহাড়ের শীর্ষাঞ্চল থেকে নিচের দিকে নামছে। পূর্বদিকেই হাঁটছে সে। ডঙ্ক আর লখা বলেছে, সর্বদা পূর্বমুখ করে চলতে হবে। হস্তিনাপুর সোজা পূর্বদিকে। পথের বাঁকের জন্য কখনো কখনো উত্তরে দক্ষিণে হাঁটতে হচ্ছে তাকে। হাঁটতে হাঁটতে পূর্বদিকে হাঁটার পথ খুঁজে নিচ্ছে সে। সূর্যই তার নিশানা। সকালে সূর্য পূর্ব গগনে থাকে, বিকেলে পশ্চিমে। দ্বিপ্রহরে সমস্যা হয় তার।

কখনো কখনো ব্যাধপল্লির দেখা পায়। ওই ব্যাধপল্লিতে দ্বিপ্রহরের আহার সারে। নিজের পরিচয় দেয় না কখনো একলব্য। রাজপুত্র জানলে ব্যাধদের সমীহ-শ্রদ্ধা বেড়ে যাবে। মানুষরা তার সঙ্গে মিশবে না। দূরত্ব বজায় রেখে তাকে আপ্যায়ন করবে। একলব্য তা চায় না। সে সাধারণ ব্যাধদের সঙ্গে সাধারণ হয়েই মিশতে চায়। তাদের কাছে পথের সন্ধান জেনে নেয়। কেউ কেউ কয়েক ক্রোশ তার সঙ্গে এগিয়ে যায়। বিনয়ে বিগলিত হয়ে একলব্য তাদের বিদায় করে।

রাতে কোনো ঋষি-তপস্বীর আশ্রমে আশ্রয় নেয়। অধিকাংশ রাতই বিশাল বৃক্ষের ডালে চড়ে কাটায়। ফলমূলই তার আহার্য। কোন ফল খাদ্য আর কোন ফল অখাদ্য—সেটা একলব্যের ভালো করে জানা। সে যে অরণ্যসন্তান। তরুলতা-বৃক্ষাদি তার আবাল্য চেনা।

শাণ্ডিল্য মুনির আশ্রম ছেড়ে এসেছে আজ সপ্তম দিন। পথে এক ব্যাধের সঙ্গে দেখা হয়েছিল কিছুক্ষণ আগে। ও বলেছে, আর বেশি দূরে নয় হস্তিনাপুর। আর একটা দিন হাঁটলেই রাজপথের সন্ধান পাবে। ভেতরটা কেঁপে উঠেছিল হঠাৎ করে। কেন এ কাঁপন ? বহু কাঙ্ক্ষিতজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে বলে, না মা-বাবা-পিতামহ—এঁদের কাছ থেকে অনেকানেক যোজনক্রোশ দূরে চলে এসেছে বলে ? এ কাঁপনের মাহাত্ম্য ভালো করে বুঝে উঠতে পারছে না একলব্য।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মায়ের কথা মনে পড়ে গেল একলব্যের। মায়ের জলেভাসা করুণ মুখটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। কী বেদনা-চুরচুর চোখেই না তাকিয়ে থেকেছিলেন মা! পিতা আর পিতামহের চরণে প্রণাম সেরে মাকে প্রণাম করতে গিয়েছিল একলব্য। পুত্রকে কঠিনবাহুতে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন বিশাখা। তাঁর দু' চোখ থেকে অঝোর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। কিছুক্ষণ পর মায়ের বুক থেকে নিজেকে ছাড়াতে চাইলেও পারছিল না। বিশাখা যেন কিছুতেই বুকের আশ্রয় থেকে পুত্রকে ছাড়তে চাইছিলেন না। অনেকক্ষণ পরে অনেক চেষ্টায় মাতৃবক্ষ-বিচ্ছিন্ন হতে পেরেছিল একলব্য। ভেতরটা ভেঙে যাচ্ছিল তখন তার। মায়ের দিকে পেছন ফিরেছিল সে। বেশ কিছুদূর এসে মায়ের দিকে ফিরেছিল একলব্য। দেখেছিল—মা চোখ মুছছেন। সেই সময়ের অশ্রু-ভাসানো মায়ের মুখটা তার মনে গেঁথে গিয়েছিল। এখন হাঁটতে হাঁটতে মায়ের সেই মুখটাই ভেসে উঠল একলব্যের চোখের সামনে। তার বুকটা ভারী হয়ে গেল। বুকটা কেঁপে কেঁপে উঠল।

ব্যাধ-পরিবার সন্তানবহুল। কমপক্ষে সাত-আটজন করে বাচ্চাকাচ্চা প্রত্যেক পরিবারে। রাজন্য আর সাধারণ ব্যাধের মধ্যে তফাৎ নেই এ ব্যাপারে। যেন সন্তান উৎপাদনের প্রতিযোগিতা চলে ব্যাধসমাজে। খাওয়াতে পারবে কি না, পরাতে পারবে কি না—এ চিন্তা করে না নিষাদদম্পতি। সন্তানধারণের ক্ষমতা না হারানো পর্যন্ত সন্তান প্রসব করে যায় ব্যাধনারী।

ব্যতিক্রম শুধু রাজপরিবারে। অনোমদর্শীর বংশলতিকায় একজন করে পুত্র। অনোমদর্শীর বাবাও ছিলেন পিতার একমাত্র সন্তান। অনোমদর্শীর ঘরে অবশ্য দুটো সন্তান—এক ছেলে আর এক মেয়ে। মেয়েটি বিবাহযোগ্য হয়ে উঠলে পার্শ্ববর্তী কুন্তলা নিষাদরাজ্যের রাজকুমারের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন। আর পুত্র হিরণ্যধনু বর্তমানে নিষাদরাজ্যের মহারাজা।

ক্ষত্রিয় রাজাদের মতো ব্যাধরাজের ঘরে বহু নারী নেই। কোনো রক্ষিতা নেই। তেমন কোনো দাসী নেই, যাদের সঙ্গে রাজারা অবাধে সঙ্গম করেন। ক্ষত্রিয় রাজাদের মধ্যে একনিষ্ঠতা বলে কোনো ব্যাপার নেই। তাঁরা বহুগামী। যথেচ্ছাচারী। কোনো একজন নারীকে এককভাবে হৃদয়ে স্থান দেন না ক্ষত্রিয়রাজরা।

ব্যাধসমাজ এর ব্যতিক্রম। এই সমাজে বহুবিবাহ প্রথা নেই, স্ত্রীত্যাগের কোনো নিয়ম নেই, পণপ্রথা নেই। মহারাজ থেকে সামান্য প্রজা পর্যন্ত সবারই ঘরে একজনই পত্নী। ফলে এই সমাজ সপত্নী-কোন্দলমুক্ত। তবে প্রত্যেকটি পরিবারে বহুসন্তানের সমাবেশ। কিন্তু সন্তানবাহুল্য থেকে নিষাদ রাজপরিবারটি মুক্ত। কন্যা যতটাই হোক, পুত্র কিন্তু একজন। অনোমদর্শীর বহু ঊর্ধ্বতন পুরুষ থেকে একেবারে হিরণ্যধনু পর্যন্ত এই নিয়ম প্রবহমান। এরও হয়তো একটা কারণ আছে। ক্ষত্রিয়দের ভ্রাতৃবিরোধের কথা ব্যাধরাজাদের না জানার কথা নয়। যুগে যুগে নারী ও ভূমির জন্য ক্ষত্রিয় রাজপুত্রদের মধ্যে হানাহানি লেগেই আছে। সেই সত্য যুগ থেকে এই দ্বাপর যুগ পর্যন্ত। 'রামায়ণ' কাহিনিও এই ব্যাধ রাজপরিবারটিকে সতর্ক করেছে।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাল্মীকির 'রামায়ণে' ভ্রাতৃপ্রেমের গাঢ়তার কথা যেমন আছে আবার ভ্রাতৃবিরোধের কথাও তো আছে। রাম-লক্ষ্মণ-ভরতের কাহিনির মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের কথা আছে, সুগ্রীব-বালীর কাহিনি তো রক্তপাতের। রাম-লক্ষ্মণের ওই যে অযোধ্যা ত্যাগ, রাম কর্তৃক বালী নিধন—এসবের মাঝখানে তো দাঁড়িয়ে আছে ওই ভূমি আর নারী। আর রাম-রাবণের যুদ্ধ! সীতার জন্যই তো হলো। এক লক্ষ পুত্র আর সোয়া লক্ষ নাতি যে রাবণের, সেই রাবণের বংশে শেষ পর্যন্ত বাতি জ্বালাবার কেউ থাকল না। ওই সীতার জন্যই তো। রাবণরা তিন ভাই—রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ। এই বিভীষণই তো রাবণবংশের ধ্বংসের কারণ হলো। একাধিক ভাইয়ের কারণেই তো হলো এরকম। এই সকল ঘটনা থেকেই হয়তো নিষাদ রাজপরিবারটি শিক্ষা গ্রহণ করেছে। ব্যাধরাজারা এক পুত্রেই সন্তুষ্ট থেকেছেন বংশানুক্রমে।

একজন পুত্রসন্তান হলে মাতা-পিতার হৃদয়টি ওই সন্তানে নিবদ্ধ থাকে। মা-বাবার সকল ভাবনা-চিন্তা-আকাঙ্ক্ষা-ভালোবাসা ওই একজনাতেই জড়িয়ে থাকে। এই প্রাণধনটি যতক্ষণ চোখের সামনে থাকে, ততক্ষণ মনটা প্রশান্তিতে ভরে থাকে। চোখের আড়াল হলেই যত উৎকণ্ঠা-উদ্বেগ। হৃদয়টা দুমড়ে-মুচড়ে যেতে চায়। হাহাকারে ভেতরটা শ্মশানে পরিণত হতে চায়।

মহারানি বিশাখার বেলায়ও তা-ই হয়েছে। একমাত্র পুত্র একলব্য বহুদূরের অজানা রাজ্যে যাত্রা করেছে। দুর্গম পথ, শ্বাপদসংকুল অরণ্য, উত্তুঙ্গ পর্বতমালা, হিংস্র নিষাদ—এসব অতিক্রম করেই তো একলব্যকে হস্তিনাপুরে পৌঁছাতে হবে। সদ্য তরুণ, কোমল দেহ, অভিজ্ঞতাশূন্য একলব্য। ঠিকঠাকমতো গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে তো ? বিশাখার অন্তরটা তাই কেঁপে কেঁপে উঠেছিল। অজানা শঙ্কায় মাতৃহৃদয় উদ্বেগাকুল হয়ে পড়েছিল। তাই তো মহারানির দু'চোখজুড়ে অশ্রু। এই অশ্রুসিক্ত মুখমণ্ডলই বারবার একলব্যের চোখের সামনে ভেসে উঠছিল।

হঠাৎ জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাতে লাগল একলব্য। চোখের সামনে থেকে মায়ের কোমল মুখটি সরিয়ে দিতে চাইল সে। এই মুহূর্তে মায়ের মুখচ্ছবিটি চোখের সামনে ভাসতে দিলে চলবে না। তাতে তার সংকল্প নড়বড়ে হয়ে পড়বে। চলার গতি কমে আসবে। নিষ্ঠা হারাবে সে। তাই ডানে-বাঁয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে পেছনের স্মৃতিগুলো মন থেকে বের করে দিতে চাইল একলব্য।

হঠাৎ প্রচণ্ড হাহাকার ধ্বনিতে সংবিৎ ফিরে পেল একলব্য। সামনে তাকাল সে। দেখল— একটা এলাকায় আগুনের লেলিহান শিখা। ধোঁয়ায় আকাশ ঢাকা পড়েছে। দ্রুত সেদিকে পা চালাল একলব্য। যত নিকটে যাচ্ছে—আর্তনাদ, হিংস্র কণ্ঠের হুংকার স্পষ্ট হয়ে উঠছে একলব্যের কানে। বাতাসে ভেসে আসা লতাগুল্ম, বৃক্ষ-পত্রের পোড়া গন্ধ নাকে এসে লাগছে তার। বহ্নিদগ্ধ স্থানের দিকে আরও দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল সে।

নিকটে গিয়ে দেখল—একটা তপোবনের পর্ণকুটিরগুলো দাউদাউ করে জ্বলছে। সেই আগুন তপোবনের চারদিকের বৃক্ষ-লতায় ছড়িয়ে পড়েছে। গোটা উঠানজুড়ে জলপাত্র, ফলাধার, শয্যাসামগ্রী, পাদুকা, কুশাসন এসব। কয়েকজন ঋষির মাথা, শরীর থেকে রক্ত



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝরছে। কিছু ঋষি বৃক্ষ-শাখা হস্তে আত্মরক্ষা করে যাচ্ছেন। জটাজুটধারী বল্কল পরিহিত একজন তপস্বী একটু দূরের একটা বৃহৎ আম্রবৃক্ষের তলায় দাঁড়িয়ে আছেন। চক্ষু তাঁর বিস্ফারিত। কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে মণি দুটো তাঁর। মনে বেদনা না উল্লাস, হাহাকার না বিস্ময় সঠিক বোঝার উপায় নেই। সারা মুখ দীর্ঘ দাড়িতে আবৃত। তবে তিনি যে বেশ উত্তেজিত, ভয়ংকর ক্রোধ যে তার সমস্ত দেহজুড়ে, সেটা তপস্বীর নেত্রদ্বয় দেখে অনুধাবন করা যাচ্ছে।

আর এই আশ্রমের চারদিক জুড়ে এক দঙ্গল নিষাদের উল্লম্ফন। তাদের দেহ কুচকুচে কালো। কারও দেহ দীর্ঘ, কারও মাঝামাঝি। পরিধানে স্বল্প কাপড়। ছোট করে ছাঁটা চুল সবার। শুধু একজনের বাবরি চুল। তার দেহ সুঠাম। শালপ্রাংশু। ক্রোধান্বিত চোখমুখ। ডানহাতের তর্জনী উঁচিয়ে সঙ্গীদের নির্দেশ দিচ্ছে। তার কণ্ঠ উত্তেজিত।

একলব্য এই দহন, এই আক্রমণ, এই উত্তেজনার পেছনে যে কারণ, তার কিছুই বুঝল না। তবে ঘটনা-সংঘটনের স্থানে দ্রুতপায়ে যেতে যেতে এইটুকু অনুধাবন করতে পারল যে, একদল হিংস্র ক্রোধমত্ত নিষাদ একটা তপোবন আক্রমণ করেছে। তপস্বীরা নিরস্ত্র। ক্রোধজিৎ তাঁরা। এবং সংখ্যায় অল্প। তাই নিষাদ-আক্রমণে তপোবন লণ্ডভণ্ড, অগ্নিদগ্ধ। রক্তাক্ত, লাঞ্ছিত ঋষিরা শুধু প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

নিষাদ-নেতাটির একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে বজ্রকঠিন কণ্ঠে একলব্য জিজ্ঞেস করল, 'কারা তোমরা ? নিরস্ত্র ঋষিদের আক্রমণ করেছ কেন ?'

দলনেতা বামহাত বাড়িয়ে তার সামনে থেকে একলব্যকে সরিয়ে দিতে চাইল। তার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। কিন্তু বামহাতের ধাক্কায় একলব্যকে সরিয়ে দিতে পারল না মেঘা। অবহেলায় অলীকভাবে ধাক্কাটা দিয়েছিল সে। ভাবে নি, তার বজ্রহাতের ঠেলায় সামনে দাঁড়ানো তরুণটিকে সরাতে পারবে না। হাতটা যেন পাষাণে ধাক্কা খেল। এবার সামনে দাঁড়ানো যুবকটির দিকে ভালো করে চোখ ফেরাল মেঘা।

মেঘার চোখে চোখ রেখে এবার বরফশীতল গলায় একলব্য জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি ? কেন সদলে মুনিঋষির আশ্রমে তাণ্ডব চালাচ্ছ ?'

'তুমি কে যে, তোমাকে আমার পরিচয় দিতে হবে ? আর কারণ বলতে হবে এই যুদ্ধের ?'

'একে যুদ্ধ বলে ? যুদ্ধ হয় সশস্ত্র দুইজনাতে অথবা অস্ত্রসজ্জিত দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী দলে। তাকিয়ে দেখো ওঁদের হাতে কোনো অস্ত্র নেই। ওঁরা নিরীহ, ওঁরা শান্ত, শান্তিপ্রিয়। এরকম কিছু মানুষকে আক্রমণ করেছ কেন ?'

'তার ব্যাখ্যা কি তোমাকে দিতে হবে ? তুমি এমন কী রাজাগজা যে, আমার কাছে কারণ জানতে চাইছ ?'

'আমি যে-ই হই, উত্তর না দিয়ে ওঁদের দিকে আর অস্ত্র তুলতে পারবে না।'

'দেখে মনে হচ্ছে—আমাদেরই গোত্রের তুমি। তোমার কথা, দেহগঠন এর প্রমাণ বহন করছে। তাই বলছি—তোমাকে আঘাত করার আগে আমার সামনে থেকে সরে দাঁড়াও। নইলে তোমার দেহে মাথা থাকবে না।'


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবার হুংকার দিয়ে উঠল একলব্য, 'কত বড় ধনুর্ধর তুমি, প্রমাণ কোরো আমার সামনে। এখনই যদি এই ঋষিদের ওপর আক্রমণ না থামাও, সবাইকে যমালয়ে পাঠাব আমি।'

একলব্যের বজ্রনিনাদি কণ্ঠ শুনে আক্রমণরত ব্যাধরা বিরত হলো। দ্রুতবেগে মেঘা আর একলব্যের নিকটে চলে এল। ব্যাধরা একলব্যকে বৃত্তাকারে ঘিরে ধরল।

একলব্যের গুরুগম্ভীর কর্তৃত্বযুক্ত কণ্ঠ শুনে মেঘা ঘাবড়ে গেল। নিজের অজান্তে দু'পা পিছিয়ে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যে সংবিৎ ফিরে পেল। ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলল, 'যুদ্ধ করতে চাও আমার সঙ্গে ? খেঁকশেয়াল বাঘের সামনে দাঁড়িয়ে আস্ফালন করছ ? কাঁধে তীরধনুক আর কোমরে গোঁজা একটা টাঙ্গি। কী নিয়ে যুদ্ধ করবে ? অসিযুদ্ধ জানো ?'

'তীরধনুক, টাঙ্গি, অসি দিয়ে বা খালি হাতে—যেভাবেই যুদ্ধ করতে চাও তুমি, আমি সম্মত।' একলব্যের মুখমণ্ডলে অবহেলা ঝিলিক দিয়ে উঠল।

সহজন থেকে একটা অসি নিয়ে একলব্যের দিকে ছুড়ে দিল মেঘা।

কয়েক মুহূর্তমাত্র টিকে থাকতে পারল মেঘা, একলব্যের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে। মেঘার কণ্ঠনালিতে অসির অগ্রভাগ চেপে ধরল একলব্য। তারপর হেলায় তরবারিটি দূরের ভূমিতে নিক্ষেপ করল। ইশারায় মেঘাকে উঠে দাঁড়াতে বলল।

মৃদুকণ্ঠে বলল, 'আমি একলব্য। নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র।'

সবাই উপুড় হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকাল।

'জয়, যুবরাজ একলব্যের জয়।' সমবেত কণ্ঠে বলে উঠল সবাই।

সবাইকে নিয়ে ঋষির সামনে উপস্থিত হলো একলব্য। ততক্ষণে যা জ্বলার, তা জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। জোড় হাতে একলব্য ক্ষমা প্রার্থনা করল ঋষির কাছে। একলব্য ঋষি জৈমিনীর সামনে হাঁটুগেড়ে বলল, 'মহাত্মন, আমি ওদের হয়ে আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। ওরা অবোধ। মহাত্মা দুরাত্মা চেনবার ক্ষমতা ঈশ্বর ওদের দেন নি। নইলে কেন ঈশ্বরসাধনায় মগ্ন ঋষিদের ওরা আক্রমণ করে ?'

'তুমি কে যুবা ? ক্রোধে উন্মত্ত, হিংসায় জ্বলন্ত এই মানুষগুলোর মধ্যে তোমাকে তো চেনা যাচ্ছে না।' জৈমিনীর কণ্ঠস্বরে বেদনার ছোঁয়া টের পাওয়া যাচ্ছে।

একলব্য করজোড়ে বলল, 'আমার নাম একলব্য। নিষাদরাজ্যে আমার বসবাস। হিরণ্যধনু আমার পিতা। অপরাধ মার্জনা করবেন—আপনার যথার্থ পরিচয় আমার জানা নেই।'

ম্লান মৃদু হাসি তপস্বী জৈমিনীর চোখেমুখে ছড়িয়ে পড়ল। তিনি বললেন, 'তোমার পিতা বা পিতামহ আমার যথার্থ পরিচয় জানে। তোমার বয়স অল্প, আমার নাম বোধহয় তোমার শ্রবণগত হয় নি। আমি জৈমিনী।'

নামটা শোনামাত্র একলব্য জৈমিনীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণতি জানাল। তার দেখাদেখি অন্য নিষাদরাও। ঋষি জৈমিনী দুই হাত বাড়িয়ে একলব্যকে মাটি থেকে টেনে তুললেন। বুকে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেনে নিয়ে বললেন, 'তোমার পরিচয় পেয়ে এবং তোমার ভক্তিশ্রদ্ধা দেখে আমি তৃপ্ত হয়েছি। আমি ওদের অপরাধ ক্ষমা করে দিলাম।' আক্রমণ-উন্মত্ত নিষাদদের দিকে তর্জনী প্রসারিত করে কথা শেষ করলেন ঋষি।

একলব্য বলল, 'আমি আক্রমণের কারণ জানি না। তবে এইটুকু বুঝছি—ওরা অপরাধী। কারণ তপোবনবাসী ঈশ্বরধ্যানে মগ্ন ঋষিরা কোনোরকম অন্যায় করতে পারেন না।'

এবার সুমন্ত কথা বলে উঠলেন। সুমন্ত ঋষি জৈমিনীর পুত্র। একলব্যের মতোই তরুণ। গৌরবর্ণ, দীর্ঘদেহী। তবে একলব্যের মতো সুঠামদেহী নন। তপস্যা আর স্বল্পহারের কারণে তাঁর দেহ শীর্ণ। কিন্তু কণ্ঠ ভরাট ও সুললিত।

সুমন্ত বললেন, 'এই তপোবনের চারদিকে নানা গাছ। নানা ফলের—হরিতকি, দাড়িম্ব, আম্র, কামরাঙা, কলা এসবের। নানা ফুলের—কদম্ব, চাঁপা এবং নানা কাঠের। বিশেষ করে ছোটোবড়ো নানা আকারের চন্দন গাছ এই তপোবন ঘিরে। তুমি তো জানো—পূজা-আর্চার উপকরণের মধ্যে চন্দনকাষ্ঠ বিশেষভাবে মূল্যবহ। এরা নানা সময়ে এসে ওই চন্দনবৃক্ষ কেটে নিয়ে যায়। শাখা-প্রশাখা কাটলে আমাদের তেমন আপত্তি ছিল না। কিন্তু ওরা চন্দনবৃক্ষের মূলোৎপাটন করে নিয়ে যায়। তাদের এই দুষ্কর্মে আমরা বাধা দিয়েছি। তাতেই এই বিপত্তি, এই অগ্নিকাণ্ড, জীবননাশী আক্রমণ।'

একলব্য মেঘার দিকে ফিরে বলল, 'আমি তোমাকে ধিক্কার জানাচ্ছি। তোমার সঙ্গে যারা এই দুষ্কর্মে সহযোগী হয়েছে, তাদের অপরাধের সীমা নেই। আমি ওদের হয়ে সমস্ত তপোবনবাসীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনারা আমাদের ক্ষমা করুন।'

তারপর একটু থেমে আবার বলল, 'ওরা নিজ হাতে এই তপোবন আবার গড়ে দেবে। যত সময় লাগুক, পুনর্নির্মাণ কাজ শেষ না করে ওরা লোকালয়ে ফিরে যাবে না। আর কোনো দিন এই রকম দুষ্কর্ম ওরা করবে না।' মেঘা এবং সমবেত নিষাদদের দিকে তাকিয়ে কথা শেষ করল একলব্য।

সবাই সমস্বরে বলল, 'যুবরাজ, আপনার নির্দেশ আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। জয় হোক যুবরাজের। ঋষি, আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন।'

নিষাদরাজ্য যেখানে শেষ কৌরবরাজ্যের সেখানে শুরু, সেই সন্ধির স্থানে ঋষি জৈমিনীর তপাশ্রম। সরস্বতী নদীর তীরে এই আশ্রম। পঞ্চনদীর দেশ ছেড়ে আর্যগোষ্ঠী ভারতবর্ষের এই স্থানে প্রবেশ করেছিল একদা। কোন স্থানে বসতি স্থাপন করবে, এ নিয়ে তাদের মধ্যে ইতস্ততা ছিল। নদী এদের কাছে পূজনীয়। বহু বিবেচনার পর সরস্বতী আর দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী ভূমিকে বসবাসের জন্য বেছে নিল আর্যরা।

কালক্রমে রাজ্যলোভ এবং ধনলোভ দ্বারা তাড়িত হয়ে ভারতবর্ষের নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল আর্যরা। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লেও তারা আদিবাসস্থানকে ভুলল না। ভূমি আর জলাধার তাদের সাহিত্যে-ধর্মে-সংস্কৃতিতে বড় জায়গা নিয়ে থাকল। তাদের কাছে


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরস্বতী হয়ে গেল দেবনদী। এই নদী ও তার পরিপার্শ্ব ঋষি-তপস্বীদের কাছে পবিত্রতম স্থান হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকল। এই নদীর পারে নানা মুনিঋষি তাদের তপাশ্রম গড়ে তুললেন। ঋষি জৈমিনী তাঁদের একজন।

তপস্বী জৈমিনী প্রতি প্রাতে সরস্বতীজলে স্নান সেরে সূর্যপ্রণাম সম্পন্ন করে সশিষ্য আশ্রমে বসে সামগান করেন।

ঋষি জৈমিনীর আশ্রম মনোহর। শান্ত সৌম্য পরিবেশ চারদিকে। উন্মত্ত ব্যাধদের দ্বারা তপোবনের পরিবেশ বিঘ্নিত হলেও কয়েকদিনের আপ্রাণ চেষ্টায় তপোবনটি আগের চেহারায় ফিরে এল। মেঘা ও তার অনুসারীদের নিজেদের গাঁয়ে ফিরে যাওয়ার আদেশ দিল একলব্য। মহাত্মা জৈমিনীর কাছে বিদায় যাচ্না করলে ঋষি বললেন, 'আর দুটো দিন থেকে যাও বৎস। এ কয়টি দিন তোমার ভীষণ কায়িক পরিশ্রম গেছে। ওদের সঙ্গে তুমিও এই তপোবন পুনর্গঠনের জন্য যথেষ্ট খেটেছ।'

'এটা আমার কর্তব্য ছিল মহাত্মন। ওদের অপরাধের অংশীদার আমিও। ওরা আমার গোত্রভুক্ত।' একটু থেমে একলব্য আবার বলল, 'আমার অভীষ্ট অনর্জিত। ভবিষ্যৎ অজানা। গন্তব্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত আমার হৃদয় অশান্ত। আমাকে যাত্রার অনুমতি দিন মহাত্মন।'

এ কয়দিনে ঋষি জৈমিনী একলব্যের অভীষ্ট সম্পর্কে জেনে নিয়েছেন। প্রথম যেদিন শুনেছিলেন, গম্ভীর হয়ে থেকেছিলেন। কী যেন নিবিষ্ট মনে ভেবেছিলেন। কী যেন বলতে চেয়েছিলেন একলব্যকে। তারপর সংযতবাক হয়েছিলেন। কিন্তু একটা বিচলিত ভাব তাঁর চোখে কপালে ছড়িয়ে পড়েছিল। বলেছিলেন, 'আচার্য দ্রোণকে আমি চিনি। তিনি পৃথিবীশ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর। তাঁর শিষ্য হতে পারা শ্লাঘার ব্যাপার। তবে তিনি একটু লোভী প্রকৃতির।' শেষ পঙ্ক্তিটির শব্দ শুধু ঋষির আপন কান পর্যন্ত পৌঁছেছিল।

আজ যাত্রার জন্য একলব্যের অনুমতি প্রার্থনা শুনে ঋষি জৈমিনী একটু থমকে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ মৌন থেকে বলেছিলেন, 'তোমার শুভযাত্রায় বাধা দেব না একলব্য। আজকের দিন ও রাতটা থেকে যাও। কাল প্রত্যুষে যাত্রা কোরো। মনে রেখো শ্রদ্ধাবানই জ্ঞান লাভ করে।' বলে মৌন হয়েছিলেন ঋষি জৈমিনী।

সূর্যাস্তকাল।

সরস্বতীর জলে সূর্যের শেষ রশ্মি। স্বর্ণাভ জল। মৃদু লয়ে সরস্বতী বহমান। এ অংশটি সরস্বতীর শেষ প্রান্ত। সামান্য এগিয়ে গিয়েই দেবনদী সরস্বতী অদৃশ্য হয়ে গেছে। এরপর ধু-ধু মরুভূমি। মরুভূমিটি নিষাদরাজ্যের অন্তর্গত। এই মরুভূমিতেই সরস্বতীজলধারা অন্তর্ধান হয়ে গেছে। এটাকে বলে সরস্বতীর বিনশন। কেন এখানে সরস্বতী তার গতি থামাল ?

পৃথিবীতে বহু বহু নদী আছে, যারা সামনের মরু-প্রান্তর, উত্তুঙ্গ পর্বতমালা হেলায় অতিক্রম করে সমুদ্রে পতিত হয়েছে। তাহলে সরস্বতীর মতো গতিমান নদীটি সামান্য



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মরুভূমির কাছে হার মানল কেন ? গোধূলির ম্লান আলো গায়ে মেখে সরস্বতীর তীরে বসে ভাবছিল একলব্য। হঠাৎ পিতামহ অনোমদর্শীর কথা মনে পড়ে গেল একলব্যের।

সেদিন বিকেলে কোপবতী নদীতীরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন অনোমদর্শী। পুত্রের হাতে রাজ্যভার তুলে দেওয়ার পর মাঝেমধ্যে একলব্যকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন তিনি। কোপবতী নদীর তীরেই চলে আসতেন বেশির ভাগ সময়। প্রহরীরা দূরে অবস্থান নিত। অনোমদর্শী নাতির হাত ধরে জললগ্ন পার ঘেঁষে দাঁড়াতেন। নদীকে নিয়েই তিনি বেশির ভাগ কথা বলতেন। নদীকথার সঙ্গে আসত বহিরাক্রমণকারীদের কথা, পূর্বপুরুষদের শৌর্যবীর্যের কথা, ফসল-বৃক্ষদের কথা। নদী যে মানবজীবনের অমূল্য বান্ধব—সে কথা বারবার করে বলতেন অনোমদর্শী।

সেদিন বিকেলে হঠাৎ সরস্বতীর কথা বললেন। বললেন, আমাদের রাজ্যে খুব বেশি নদী নেই। হাতেগোনা চার-পাঁচটা। তাও আবার সব নদী নাব্য নয়। এই কোপবতী আর পাবনী নিষাদরাজ্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এই নিষাদরাজ্যের ব্যবসাবাণিজ্য পরিচালিত হয় এই দুই নদী দিয়ে। এইটুকু বলে অনোমদর্শী কোপবতীর ওপার পর্যন্ত দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দিয়েছিলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এসেছিল তাঁর বুক চিড়ে।

তার পর বলেছিলেন, 'আমাদের দেশ আরও সুজলা-সুফলা হয়ে উঠত, ধনধান্যে সমৃদ্ধ হতো যদি স্রোতস্বিনী সরস্বতী আমাদের রাজ্য পর্যন্ত পৌঁছাত। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, বিনশনে এসে সরস্বতী থেমে গেল। সামনে মরুভূমি দেখে স্রোতবেগ থামিয়ে দিল নদীটি। আসলে অনেক দূর পর্যন্ত চলতে চলতে সরস্বতী ক্ষীয়মাণ হয়ে এসেছিল। বিনশন অংশটি সরস্বতীর পরিণতি স্থল। দুর্বল গতি আর স্বল্পধারার জলের জন্য মরুভূমিটি অতিক্রম করতে পারল না নদীটি। কিন্তু প্রকৃতির এই স্বাভাবিকতাকে ঘৃণার গল্পে মুড়িয়ে প্রচার করল আর্যরা।'

এতক্ষণ অবাক হয়ে দাদুর কথা শুনছিল একলব্য। একটু ফাঁক পেয়ে বলে উঠল, 'ঘৃণার গল্প!'

'হ্যাঁ, ঘৃণার গল্প।' উত্তেজিত গলায় অনোমদর্শী বলে উঠেছিলেন। বলেছিলেন, 'সরস্বতী আর্যদের প্রধানতম নদী, পবিত্রতমও বটে। এই নদীকে নিয়ে ওদের অনেক গর্ব। ওদের পুরাণে, মণ্ডলে, সূক্তে, মন্ত্রে সরস্বতীর অশেষ গুণগান। তারা বলছে, হে জননী সরস্বতী, আমাদের ত্যাগ করে তুমি কোথাও যেয়ো না। তুমি আমাদের বন্ধুভাবে গ্রহণ কোরো। অধিক জলপ্রবাহ দিয়ে আমাদের দুঃখ দিয়ো না। এই যে নদী সরস্বতী, তাকে নিয়ে আমরা নিষাদরা গর্ব করতে পারলাম না। কারণ সে আমাদের রাজ্যে প্রবেশ করল না। এই প্রবেশ না করাকে আর্যরা ঘৃণার গল্পের সঙ্গে মিশিয়ে দিল। ওরা বলল, পবিত্র নদী সরস্বতী নিষাদদের ঘৃণা করে। সরস্বতী ওদের স্পর্শকে এড়াবার জন্য বিনশনে থেমে গেল। নিষাদরা যদি এর জল স্পর্শ করে, তবে তা অপবিত্র হয়ে যাবে। তাই নিষাদদের ছোঁয়া এড়াবার জন্য নিষাদরাজ্যের একটু আগেই সরস্বতী পৃথিবীর বিবরে প্রবেশ করেছে। এখন তুমিই বলো কাহিনিটি কি ঘৃণার নয় ? এ রকম করে করেই ক্ষত্রিয়রা আমাদের বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চালিয়েছে। তাদের সঙ্গে মিশেছে ব্রাহ্মণরা। ব্রাহ্মণদের মেধা আর ক্ষত্রিয়দের বাহুবল মিলে ওরা এমন একটা শক্তিবৃত্ত তৈরি করেছে, যার সঙ্গে আমরা পাল্লা দিতে পারছি না। এমন একটা সময় আসবে যখন পৃথিবীর কাছে আমরা বর্বর, অশিক্ষিত, দুরাচারী জাতি হিসেবে নির্ণীত হব আর ওরা নন্দিত হবে দেবতার মতো গুণান্বিত হয়ে।'

দাদুর সেদিনের সেই আক্ষেপের কথা আজ বড় বেশি করে মনে পড়ছে একলব্যের। দুপুরের আহার শেষে সরস্বতীপারে এসে বসেছে সে। ঋষি জৈমিনী তার সঙ্গে শিষ্য দিতে চেয়েছিলেন কয়েকজন। একলব্য বলেছিল, 'একা যেতে চাই আমি। জীবনে প্রথমবার এই নদী দেখা। এ নদীর সৌন্দর্যকে নিজের মতো করে উপভোগ করতে চাই মহাত্মন।'

'তথাস্তু' বলে ঋষি জৈমিনী বিরত হয়েছিলেন।

আঁধার ঘনায়মান। তপোবন অনতিদূরে। একলব্য অরণ্যচারী। আঁধার, শ্বাপদ—কোনো কিছুতেই ত্রাস নেই একলব্যের। সরস্বতীতীরে বসে ভাবছে একলব্য—এ কী অসহনীয় ব্যাখ্যা নদীটির গতি হারিয়ে যাওয়ার! সেদিন দাদুর বলা কাহিনিটি মনে গেঁথে গিয়েছিল। কিন্তু কাহিনিটি তাকে তেমন করে ভাবায় নি সে সময়। আজ সরস্বতীতীরে বসে অন্তর্গত ভাবনায় একলব্য আকুল হয়ে উঠল।

একলব্য শুধু অস্ত্রদক্ষ হয়ে ওঠে নি, শাস্ত্রজ্ঞানও তার ছিল। দাদুর প্রণোদনায় সে সগোত্রের শাস্ত্রাদি পাঠ করেছে। নিবিষ্ট মনে অধ্যয়ন করেছে আর্যশাস্ত্রাদি। ইতিহাস-ভূগোলের প্রতি তার দুর্বার আকর্ষণ। বিশেষ করে নিষাদদের বিষয়ে তার জানার আগ্রহ প্রবল।

একলব্য জানে—আর্যেতর গোষ্ঠীর মধ্যে নিষাদরা সবচেয়ে পুরাতন। ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক জায়গাতে ছড়িয়ে ছিল তারা। আর্যরা নিষাদদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখত। তবে তা শুধু প্রয়োজনের তাগিদে, নিজেদের স্বার্থের জন্য। 'রামায়ণে' খুব ফলাও করে বলা হয়েছে—রাম সপরিবারে পান্থজনের সখার মতো চণ্ডালরাজ গুহকের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন, এক রাতের জন্য। রামের অনার্যপ্রীতির কথা খুব বড় করে অঙ্কন করেছেন বাল্মীকি। কিন্তু এ-ও তো সত্যি যে, গুহক সে রাতে ভোজনের আহ্বান জানিয়েছিলেন রাম-লক্ষ্মণ-সীতাকে, তা যে কৌশলে এড়িয়ে গিয়ে রাতটা অনাহারে কাটিয়ে দিয়েছিলেন রাম, তা সামান্যভাবে হলেও উল্লেখ আছে 'রামায়ণে'। চণ্ডালবাড়িতে ভোজন না করার কারণ কী ? শুধু ঘৃণা, শুধুই স্পর্শদোষ। এই তো ?

আরেকটি কথা মনে পড়ছে একলব্যের। তাও দাদু অনোমদর্শী বলেছিলেন। নদীপারে নয়, তাঁর শয্যাগৃহে। সেদিনের বিকেলটা অলসভাবেই কেটেছিল অনোমদর্শীর। প্রত্যহ বিকেলের দিকে হিরণ্যধনু একবার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যান; বিশাখাও খোঁজখবর নেন শ্বশুরের। তাঁর বিকেলের জলখাবারের তদারক করার দায়িত্ব বিশাখার। সেদিন পরিচারিকা জলখাবার পরিবেশন করতে করতে জানাল—রাজমহিষীর শরীরটা আজ খারাপ যাচ্ছে। তাই মা আমাকে দিয়ে খাবার পাঠিয়েছেন।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাতে অনোমদর্শী কিছু মনে করেন নি। সাময়িক বা দীর্ঘকালীন—কত রকমের অসুখবিসুখ নারীদের হতে পারে। পুত্রবধূ নিশ্চয় সেরে উঠবেন। কী কারণে সেই বিকেলে হিরণ্যধনুও এলেন না। ক'দিন আগেই অনোমদর্শী সংবাদ পেয়েছেন, নিষাদরাজ্যের উত্তর সীমানায় আর্যরা হানা দিয়েছে। এ নিয়ে হিরণ্যধনু বোধ হয় ব্যস্ত। ওদের মোকাবিলার প্রস্তুতিতে যথাসম্ভব তিনি মগ্ন। কেউ না আসায় মনটা বড় অবসন্ন লাগছিল অনোমদর্শীর। বার্ধক্যে মানুষ সঙ্গ চায়। একটা বেলা কারও সঙ্গে কথা বলতে না পেরে প্রাণটা তাঁর হা-হুতাশ করছিল।

হঠাৎ করেই সেই সন্ধ্যায় একলব্য উপস্থিত হয়েছিল দাদুর ঘরে। চৌদ্দ বছরের একলব্যকে চোখের সামনে দেখে ভেতরটা নেচে উঠেছিল অনোমদর্শীর। এই যে তাঁর উত্তরপুরুষ, যার মধ্যে তিনি বেঁচে থাকবেন। এই সেই একলব্য, যার মধ্যে তাঁর বহু পূর্বপুরুষের রক্তধারা প্রবাহিত হচ্ছে। এই একলব্যের মধ্যদিয়ে নিষাদবংশ বিস্তারিত হবে অনাদি ভবিষ্যতের দিকে।

'কী দেখছেন দাদু অমন করে ? আমার দিকে এ রকম করে তাকিয়ে আছেন কেন ?'

একলব্যের প্রশ্ন শুনে বাস্তবে ফিরলেন অনোমদর্শী। 'কিছু না' বলে ভাবনাটাকে মন থেকে সরিয়ে দিলেন। 'এসো এসো, কাছে বসো। আমার পাশ ঘেঁষে এই বিছানায় বসো।' নিজের শয্যা দেখিয়ে একলব্যকে কাছে আহ্বান করলেন তিনি।

সেই সন্ধ্যায় নানা কথা হয়েছিল উভয়ের মধ্যে। অনোমদর্শী সুযোগ পেলেই রাজরাজড়া, যুদ্ধকাহিনি, ধর্মকাহিনি, শাস্ত্রগল্প—এসব শোনান নাতিকে। তিনি নিষাদদের দেবতার কথা যেমন বলেন, তেমনই বলেন আর্য দেবদেবীর কথা। বেশি করে বলেন আর্যদের বৈষম্যনীতির কথা। বলেন, 'আর্যরা এদেশে এসেছে উন্নত ভাষা-সাহিত্য, উন্নত অস্ত্র আর পোষমানা ঘোড়া নিয়ে। এই তিনটির বদৌলতে তারা প্রায় বিনা বাধায় ভারতবর্ষকে নিজেদের করতলগত করতে পেরেছে। বিজিত মানুষদের শাস্ত্র-সংস্কৃতিকে তারা অবনমিত করেছে। সর্বদা বলে বেড়িয়েছে—সসাগরা পৃথিবীতে আর্যরা হলো শ্রেষ্ঠতম জাতি। তাদের এই হুঙ্কার-চেঁচামেচিতে কেউ বাধা দেয় নি। একমাত্র আমরা ছাড়া।'

'সে কেমন দাদু ?' একলব্য জিজ্ঞেস করেছিল।

'আর্যদের আসার আগে ভারতবর্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী বাস করত। তাদের শক্তি সামর্থ্য ছিল নগণ্য। তারা সহজেই আর্যশক্তির সামনে মাথা নত করেছে। আমরা করি নি।'

'আমরা করিনি!' অবাক চোখে আবার প্রশ্ন করেছিল একলব্য।

অনোমদর্শী যেন একলব্যের প্রশ্ন শুনতে পান নি। আপনমনে বলে চলেছেন, 'ভারতবর্ষে নিষাদরা ছিল প্রবল শক্তিধর। নানা স্থানে ছড়িয়ে ছিল তারা। তাদের সংঘশক্তি দুর্দমনীয়। নানা যুদ্ধে আমাদের কাছে পরাস্ত হয়েছে আর্যরা। একসময় তারা যখন বুঝতে পারল—নিষাদরা বশীভূত হবার নয়, তখন সহাবস্থান শুরু করল আর্যরা। এরা শক্তিতে আমাদের সঙ্গে পেরে না উঠলেও সংস্কৃতিতে ভীষণ একটা মার দিল আমাদের।'


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মানে!' বলল একলব্য।

'সাহিত্য আর শাস্ত্র নির্মাণ তো ওদের হাতে। তাই কৌশলের আশ্রয় নিয়ে নিষাদদের অপদস্থ করল তারা। ঋষি বাল্মীকির কথাই ধরো। 'রামায়ণে'র কাহিনি তো তোমাকে শুনিয়েছি। 'রামায়ণ' নির্মাণের মূলসূত্রের কথা তোমাকে জানাই নি। আজ সেই কাহিনিই শোনো।' অনোমদর্শী গলা খাঁকারি দিলেন। পালঙ্কের একপাশে হেলান দিয়ে বসলেন।

নাতির দিকে সোজা তাকিয়ে আবার বললেন, 'তোমাকে তো আগেই একদিন শুনিয়েছি, বাল্মীকি জীবনের প্রথমদিকে রত্নাকর দস্যু ছিলেন। একদিন নারদের কথায় তাঁর ভাবান্তর হলো। বহু বছর তপস্যা করে নিজেকে পরিবর্তন করলেন। এমন সাধনা যে, উইয়ের ঢিবি তাঁকে ঢেকে ফেলেছিল। উইয়ের ঢিবিকে বল্মীক বলে। এইজন্য পরিবর্তিত রত্নাকরের নাম হয়ে গেল বাল্মীকি।' তারপর নাতির দিকে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। বললেন, 'আমার কথা বুঝতে পারছ তো তুমি ?'

একলব্য ডান দিকে মাথাটা কাত করল।

'বাল্মীকি একদিন স্নান করতে গেলেন সরোবরে। জলে ডুব দিয়ে উঠলে তাঁর কানে ক্রৌঞ্চির ক্রন্দন ভেসে এল। ক্রৌঞ্চ বোঝো তো ? ক্রৌঞ্চ হলো কোঁচবক। সরোবরে ডুব দেওয়ার ফলে বাল্মীকির দিব্যজ্ঞান লাভ হয়ে গেছে। তিনি তখন পাখিদের কথা বুঝতে পারছেন। ক্রৌঞ্চির ক্রন্দনের কারণ কী ? এক ব্যাধ মানে নিষাদ ক্রৌঞ্চিসঙ্গী ক্রৌঞ্চকে তীরবিদ্ধ করেছে। মারা গেছে ক্রৌঞ্চ। তাই সঙ্গী-বিরহে আকুল হয়ে কাঁদছে ক্রৌঞ্চি।

ক্রৌঞ্চির বিরহব্যথায় ভীষণ নাড়া খেল বাল্মীকির ভেতরটা। প্রথমে আকুলিত হলেন, পরে হলেন ক্রোধান্বিত। তিনি নিষাদকে অভিশাপ দিলেন—তুই কোনোকালেই সামাজিক প্রতিষ্ঠা পাবি না। তুই না শুধু, তোর পরবর্তী বংশধারাও আমার এই অভিশাপে অভিশপ্ত থাকবে। বাল্মীকির উচ্চারিত অভিশাপ বাক্যটি এ রকম—'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।'

অনোমদর্শীর কথার মাঝখানে এবার কথা বলে উঠল একলব্য, 'দাদু, পশুপাখি শিকার করাই তো ব্যাধদের কাজ। সেটাই তাদের খাদ্য সংগ্রহের প্রধান উপায়, জীবন ধারণের একমাত্র পথ। বাঘ-সিংহ যেমন বেঁচে থাকার জন্য ইতর প্রাণীদের হত্যা করে, নিষাদরাও তো তা-ই করে। এতে ব্যাধের অপরাধ কী ? বাল্মীকির অভিশাপ দেওয়ার কারণ কী ?'

'ওখানেই আমার বলার বিষয়। বাল্মীকির এই অভিশাপ কি অহেতুক আর পক্ষপাতমূলক নয় ?' উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে নিজেই উত্তর দিলেন অনোমদর্শী, 'বাল্মীকি ছিলেন আর্য প্রতিনিধি। সচেতনভাবে হোক বা অচেতনভাবে, অভিশাপটা কিন্তু বৈষম্যমূলক। কালে কালে 'রামায়ণ' পঠিত হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে। যুগান্তরের মানুষদের কাছে এই বৈষম্য-প্রণোদিত অভিশাপের কথা পৌঁছে যাবে এবং আমরা মানে নিষাদরা নিন্দিত হতে থাকব আবহমানকাল ধরে।' অনোমদর্শী একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন। তার মুখমণ্ডল বিষণ্ণতায় ছেয়ে গেছে। সেই বিকেলে আর কোনো কথা বলেন নি অনোমদর্শী।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজকের গোধূলিতে, এই সরস্বতী নদীপারে বসে এসব কথা ভাবছে একলব্য। ক্ষত্রিয়দের মধ্যে নিষাদদের জন্য কোনো মমতা নেই তাহলে ? শুধু ক্ষত্রিয় কেন, ব্রাহ্মণদের মধ্যেও কি আছে ? যদি থাকত তাহলে বাল্মীকির এই হীন অভিশাপ কেন ? তিনি তো ব্রাহ্মণ। পাশাপাশি দুটো জাতি দীর্ঘকাল ধরে ভারতবর্ষে বাস করছে। নিষাদরা আদি জনগোষ্ঠী, আর্যরা বহিরাগত। ভারতবর্ষের ওপর আদি জনগোষ্ঠীর অধিকারই তো সর্বপ্রথম। কিন্তু সেটা মানতে রাজি নয় আর্যরা। যুদ্ধকালে ক্ষত্রিয়রা নিষাদশক্তিকে কাজে লাগিয়েছে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। বাইরে বন্ধু বন্ধু, ভেতরে ভেতরে বৈষম্যের একটা লক্ষ্মণরেখা ওরা দাগিয়ে রেখেছে উভয় জাতির মাঝখানে। তাই যখনই সুযোগ পেয়েছে, ছলে-কৌশলে নিষাদদের দাবিয়ে রাখার পথ অবলম্বন করেছে। সরস্বতী নদী আর বাল্মীকির ঘটনা তা-ই তো প্রমাণ করে।

তাহলে তার বাসনার কী হবে ? আচার্য দ্রোণ তো ক্ষত্রিয়-আশ্রিত ব্রাহ্মণ। তিনি কি উদারতা দিয়ে একলব্যকে বুকে টেনে নেবেন ?

অবশ্যই নেবেন। তিনি যে গুরু। গুরুদের চোখে কোনো বিদ্বেষ-বৈষম্য থাকে না।

পৃথিবীকে আঁধার ঘিরে ধরলে একলব্য ঋষি জৈমিনীর আশ্রমে ফিরে এল।

AMARBOI.COM


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুরাগে চাওয়া-পাওয়ার হিসেব থাকে,
ভক্তি তারও বড়ো। তাতে আবেদন নেই, নিবেদন আছে।

অযোনিসম্ভূত।

দ্রোণ।

ভরদ্বাজতনয়। অযোনিজ। ভরদ্বাজও অযোনিজাত। উতথ্য ঋষির স্ত্রী মমতা। মমতা গর্ভবতী। উতথ্যের ভাই বৃহস্পতি। গর্ভবতী মমতার সঙ্গে সঙ্গম প্রার্থনা করেন বৃহস্পতি। দেবরের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয় মমতা। মমতাকে বলাৎকার করে বসে বৃহস্পতি। বৃহস্পতির বীর্য মমতার যোনির বাইরে নিক্ষেপিত হয়। ভূমিতে পতিত এই বীর্য থেকে এক পুত্রের জন্ম হয়। তাঁর নাম ভরদ্বাজ। ভরদ্বাজ উতথ্যের ক্ষেত্রপুত্র আর বৃহস্পতির প্রত্যক্ষপুত্র। যোনি-অভ্যন্তরে লালিত হয় নি বলে ভরদ্বাজ অযোনিসম্ভূত। দুইজন দ্বারা উৎপন্ন বলে তিনি দ্বাজ।

দ্রোণও স্খলিত বীর্যোৎপন্ন সন্তান। তপ-জপ-শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করে একদা ভরদ্বাজ ঋষিতে পরিণত হন। হরিদ্বার আশ্রমে ভরদ্বাজের বেড়ে ওঠা।

পিতা ভরদ্বাজই দ্রোণের প্রথম গুরু। বেদ-বেদাঙ্গ পিতার কাছেই অনুশীলন করেছিলেন দ্রোণ। দ্রোণের অস্ত্রগুরু অগ্নিবেশ্য। অগ্নিবেশ্য অগ্নিপুত্র এবং ভরদ্বাজশিষ্য। অগ্নিবেশ্যের নিকট অস্ত্রশিক্ষার সময় দ্রোণের সহপাঠী ছিলেন পাঞ্চালরাজ পৃষতের পুত্র দ্রুপদ। উভয়ের পিতা পরস্পরের বন্ধু ছিলেন। দ্রোণ ও দ্রুপদের মধ্যেও গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।

দ্রোণ সৌম্যদর্শন। দীর্ঘবাহু, মহাতেজা ও শক্তিমান। তিনি বৃহস্পতির মতো শাস্ত্রজ্ঞ, শুক্রাচার্যের মতো বুদ্ধিমান। ক্ষমা, দয়া, সত্য ও সরলতার প্রতি তাঁর গভীর পক্ষপাতিত্ব। ব্রাহ্মণোচিত বহুবিধ গুণের আধার তিনি। জপতপ ব্রাহ্মণের একমাত্র কাজ। ব্রাহ্মণ হয়েও দ্রোণ শস্ত্রজীবী। কারণ তিনি দারিদ্র্য থেকে মুক্তি চেয়েছিলেন।

দ্রোণ সমরে অপরাজেয়। কৌরবরাজপুত্রদের অস্ত্রগুরু হিসেবে নিযুক্তি পান দ্রোণ। ভীষ্মই তাঁকে এই পদে নিয়োগ করেন। তিনি ভারতবর্ষে অতুলনীয় অস্ত্রগুরু ছিলেন। মুগ্ধ হয়ে পিতামহ ভীষ্ম দ্রোণকে ভারতাচার্য উপাধি দেন। কুরুবংশের সঙ্গে দ্রোণের একটা অচ্ছেদ্য সুসম্পর্ক তৈরি হয়। শুভানুধ্যায়ী হিসেবে রাজসভায় তিনি সম্মানিত। স্পষ্ট বক্তা তিনি। অন্যায় আর অধর্মের বিরুদ্ধশক্তি। ভবিতব্যে বিশ্বাসী।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে তাঁর মৃত্যুর উপায় বলে দিয়েছিলেন। দ্রোণও তাঁর পরোক্ষ হত্যাকারীকে বহু আগে চিনতে পেরেও তাকে অস্ত্রদক্ষ করে তুলেছিলেন। তিনি জানতেন—তাঁর মৃত্যুর কারণ হবে ধৃষ্টদ্যুম্ন। সে কথা সেনাপতি হবার পর দুর্যোধনকে জানিয়ে দিয়েছিলেন আচার্য দ্রোণ।

এসব বহু পরের কাহিনি। তারও আগে কথা আছে, ঘটনা আছে।

ব্রাহ্মণদের ধনলিপ্সা নেই, ভূম্যধিকারী হওয়ার বাসনাও নেই তাঁদের; অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা তো দূরের কথা। ওটা তো ক্ষত্রিয়দের কাজ। ব্রাহ্মণ হিসেবে তাঁদের কাজ তো বেদ-বেদাঙ্গ পাঠ করা, শাস্ত্রানুশীলন করা। কিন্তু দ্রোণের ক্ষেত্রে এসব হয়ে ওঠে নি। দারিদ্র্যের কশাঘাতে ব্রাহ্মণ হয়েও দ্রোণ একসময় ধনলোভী হয়ে উঠেছিলেন। গ্রন্থ ত্যাগ করে হাতে তুলে নিয়েছিলেন অস্ত্র আর শস্ত্র।

দ্রোণাচার্যের জন্মের মধ্যে কোনো মহিমা নেই; নেই কোনো গৌরব। সেকালে কোনো ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়গৃহে কোনো পুত্রসন্তান জন্মালে যে আনন্দধ্বনি শোনা যেত, দ্রোণের জন্মলগ্নে তেমন করে কোনো শঙ্খধ্বনি বা রমণীকুলের জয়ধ্বনি ওঠে নি কোনো গৃহকোণে।

মাতা-পিতার ক্ষণিক উৎসুকতা আর বাধাবন্ধনহীন চপলতার ফসল দ্রোণ। মহর্ষি ভরদ্বাজ সংযমরুদ্ধ একজন মানুষ। সমস্ত বাহ্যসুখ থেকে নিজেকে গুটিয়ে তপে-জপে ব্যাপৃত থাকতেন তিনি। সেদিন আশ্রমের হবির্ধান-মণ্ডপে যজ্ঞক্রিয়া অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। যজ্ঞকার্য কিছুটা এগিয়ে দেওয়ার পর স্নানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন তিনি। গঙ্গাদ্বারের শীতল জলে স্নান করার জন্য কলস হাতে বেরিয়ে পড়েছিলেন তিনি।

ধীরেসুস্থে স্নানও সেরেছিলেন ভরদ্বাজ। নির্জন স্থানে স্নান সমাপন শেষে হঠাৎ সম্মুখে তিনি স্বর্গের শ্রেষ্ঠ অপ্সরা ঘৃতাচীকে দেখতে পেলেন। উন্মুক্ত প্রকৃতি, স্নিগ্ধ-সৌরভ-অন্বিত নদীপার, উতল হাওয়া, অসাধারণ রূপবতী রমণী—এসব ভরদ্বাজকে চঞ্চল করে তুলল। এই সময় প্রকৃতি বুঝি মহর্ষির ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সংকল্পবদ্ধ হলো। শুধু মহর্ষি ভরদ্বাজ নন, উল্টো দিক থেকেও সাড়া মিলল।

ঘৃতাচী ভরদ্বাজকে দেখে এমন সরস আপ্লুত ভাব প্রকাশ করতে লাগলেন, যাতে মুনির সংযম বিঘ্নিত হয়। মুনিকে দেখিয়ে দেখিয়ে তিনি তাঁর অতি সূক্ষ্ম পরিধেয় বসনখানি পরিবর্তন করা আরম্ভ করে দিলেন। ওই সময় উন্মুক্ত স্থানে উতলা হাওয়া বইল। সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে গেলেন ঘৃতাচী।

ভরদ্বাজ নগ্নবক্ষা উদোম শরীরের ঘৃতাচীকে দেখতে পেলেন এবং তাঁর সংযম বিঘ্নিত হলো। ভরদ্বাজ ও ঘৃতাচীর মধ্যে কোনো শারীরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় নি। দ্রোণ ওঁদের মানসিক সম্মিলনের সন্তান। স্খলিত বীর্য যজ্ঞীয় কলসিতে রেখেছিলেন ভরদ্বাজ। সেখানেই জন্ম দ্রোণের। ভরদ্বাজ দ্রোণকে লালনপালন করেছিলেন।

শৈশব থেকে জননী পরিত্যক্ত দ্রোণ। মায়ের স্নেহযত্নহীন অবস্থায় দ্রোণের শিশুকাল কেটেছে পিতা ভরদ্বাজের আশ্রমে। ধ্যানে-যজ্ঞে ব্যাপৃত মহর্ষি কোনোদিন দ্রোণকে কোলে বসিয়ে বাৎসল্য প্রকাশ করেন নি।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভরদ্বাজ আশ্রমের আচার্য ছিলেন। শিশুপুত্রটিকে আর কিছু দিতে না পারলেও বৈদিক ব্রাহ্মণের উত্তরাধিকারটুকু দিয়েছিলেন। দ্রোণকে ভালো করে বেদ-বেদান্ত পড়তে হয়েছিল। কিন্তু এই বহুতর অধ্যয়ন তাঁর ভালো লাগছিল না। অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, যজনযাজন অথবা দানপ্রতিগ্রহ—এগুলো দ্রোণের ওপর ভারী পাথর হয়ে চেপে বসেছিল। যজনযাজন আর দক্ষিণার ওপর নির্ভর করে জীবন চালানোর মধ্যে ব্রাহ্মণের যে ত্যাগের মহিমা, তার প্রতি দ্রোণ কিছুতেই আকৃষ্ট হতে পারছিলেন না। এর জন্য দায়ী তাঁর পিতা ভরদ্বাজ।

ভরদ্বাজের বৃত্তিবৈচিত্র্য দ্রোণকে যাজনবৃত্তি থেকে অস্ত্রবিদ্যামুখী করেছিল। মহর্ষি ভরদ্বাজ যাজযজ্ঞ নিয়ে ব্যাপৃত থাকলেও অবসর সময়ে ধনুর্বাণ চালনা অভ্যাস করতেন। তবে তিনি শখের ধনুর্ধর ছিলেন না। তাঁর অস্ত্রবিদ্যাজ্ঞান ছিল সমীহ জাগানোর মতো। পিতার অস্ত্রচালনা গুণটি বালক দ্রোণের মনে ভীষণ প্রভাব ফেলেছিল। মহর্ষির কাছে অস্ত্রচালনা গৌণবৃত্তি, কিন্তু দ্রোণমনে তা মুখ্য হয়ে দেখা দিয়েছিল। তাই দ্রোণ অস্ত্রবিদ্যায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

একদিন পিতার সামনে জোড়হাতে দাঁড়িয়ে দ্রোণ বলেছিলেন, 'আমি আপনার শিষ্য হতে চাই।'

'শিষ্য তো আছই। তুমি আমার কাছে বেদ-বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করছ। আমি পিতা হলেও তোমার শিক্ষাগুরু।' অবাক চোখে তাকিয়ে পুত্রকে বলেছিলেন ভরদ্বাজ।

'আমার শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে।'

'অসম্পূর্ণ থেকে গেছে!' তারপর সংযত কণ্ঠে ভরদ্বাজ বললেন, 'আমি যতদূর বুঝি, শাস্ত্রজ্ঞান তোমার সম্পূর্ণত অর্জিত হয়েছে। একজন ঋষিপুত্রের যা যা অধ্যয়ন করা প্রয়োজন, তা তা তোমার অধীত হয়ে গেছে। তোমার শিক্ষার তো কিছু বাকি নেই আর।'

'আছে।' সংক্ষিপ্ত উত্তর দ্রোণের।

'আছে! কী বাকি আছে তোমার গ্রহণের ?'

'অস্ত্রবিদ্যা। অস্ত্রবিদ্যা অর্জিত হয় নি বাবা এখনো আমার।'

এবার ভরদ্বাজের চোখ কপালে উঠল। 'তুমি ব্রাহ্মণ সন্তান। যজনযাজন, পুজোআর্চা তোমার কাজ। অস্ত্রবিদ্যা তো ক্ষত্রিয়ের জন্য। ওরা যুদ্ধবাজ জাতি। অবিরাম শত্রুবেষ্টিত থাকে তারা। আত্মরক্ষার জন্য বা পরস্ব লুণ্ঠন করার জন্য অস্ত্রচালনা-কৌশলকে করায়ত্ত করে তারা। তুমি কী করবে অস্ত্রবিদ্যা অর্জন করে ?'

'পিতা, আপনি ব্রাহ্মণ হয়েও কি এই বিদ্যাচর্চা করছেন না ?'

ভরদ্বাজ দ্বিধান্বিত কণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ করছি। তবে তা তো আমার দ্বিতীয় বিদ্যা। প্রথম কাম্য তো ধ্যানযজ্ঞ।'

'ধরে নিন—আমিও শখের বশে এই দ্বিতীয় বিদ্যাটি লাভ করতে চাইছি। আপনি আমাকে বিমুখ করবেন না পিতা। আমাকে অস্ত্রশিক্ষায় দীক্ষিত করুন।'

দোটানায় পড়ে গেলেন মহর্ষি ভরদ্বাজ। ঋষি ব্রাহ্মণ হয়ে তিনি যদি নিজ পুত্রকে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অস্ত্রশিক্ষা দেন, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে কথা উঠবে। বলা হবে—নিজে ব্রাহ্মণ হয়ে পুত্রকে স্বধর্ম ত্যাগ করতে শেখাচ্ছেন, ব্রাহ্মণের বৃত্তি পরিত্যাগ করতে প্ররোচিত করছেন।

ভরদ্বাজ একটি কৌশলের আশ্রয় নিলেন। পরম মমতায় ছেলেকে কাছে টানলেন। নিচুস্বরে বললেন, 'তোমাকে অস্ত্রবিদ্যা দান করা আমার পক্ষে অসুবিধা আছে। তুমি এক কাজ কোরো, তুমি অগ্নিবেশ্যের কাছে যাও।'

দ্রোণ জিজ্ঞেস করলেন, 'অগ্নিবেশ্য কে ?'

ভরদ্বাজ বললেন, 'তার প্রথম পরিচয়—সে অগ্নির পুত্র, দ্বিতীয় পরিচয় সে আমার শিষ্য—আমার কাছে অস্ত্রচালনা কৌশল শিখেছে সে। তৃতীয় পরিচয়—অগ্নিবেশ্য একজন খ্যাতিমান ধনুর্ধর। সে-ই তোমাকে যথোপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলবে।'

আনন্দের একটা পাতলা আভা দ্রোণের সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল। অন্যত্র গমনোদ্যত হলেন দ্রোণ। ভরদ্বাজ একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে পড়ার ভঙ্গি করে বললেন, 'তোমাকে একটি দরকারি কথা বলা হয় নি পুত্র, অগ্নিবেশ্যের কাছে একটা অমোঘ অস্ত্র আছে।'

'কী নাম সে অস্ত্রের ?'

'আগ্নেয় অস্ত্র।' বলে কিছুক্ষণ নীরব রইলেন ভরদ্বাজ। তার পর দ্রোণের দিকে কোমল চোখে তাকিয়ে বললেন, 'অসাধারণ একজন শিষ্য এই অগ্নিবেশ্য। তার অস্ত্রচালনা-প্রতিভায় আমি ভীষণ প্রীত হয়েছিলাম। সে আমাকে এতই মুগ্ধ করেছিল যে, সর্বোত্তম আগ্নেয় অস্ত্রের বিদ্যাটি আমি তাকে শিখিয়ে দিয়েছিলাম। যদি পারো এই বিদ্যা তুমি অগ্নিবেশ্যের কাছ থেকে শিখে নিয়ো। গুরুকে প্রীত করার জন্য একটা জিনিসের খুব প্রয়োজন।'

উৎসুক কণ্ঠে দ্রোণ জিজ্ঞেস করলেন, 'কী জিনিসের প্রয়োজন বাবা ?'

'বিনয়। ব্রহ্মচর্য, অধ্যবসায়, মনোযোগ এবং বিনয়—এই চারটি গুণ যে শিষ্যের থাকবে, সে সর্বোত্তম শিষ্য হতে পারবে। তবে মনে রাখবে, সবার ওপরে থাকা চাই বিনয়। আমি আশা করছি—বিনয় দ্বারা তুমি অগ্নিবেশ্যের মন জয় করতে পারবে। অগ্নি-অস্ত্র তোমার অধিগত হবে।' ধীরে ধীরে মহর্ষি ভরদ্বাজ কথা শেষ করলেন।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তদ্‌ভোগ্যং ভবিতা রাজ্যং সখে সত্যেন তে শপে।'
সত্য-প্রতিজ্ঞা করে বলছি, আমার রাজ্য আমার মতো তোমারও ভোগ্য হবে।

এক প্রত্যূষে পিতার কাছ থেকে বিদায় নিলেন দ্রোণ।

গোটা দিন হেঁটে পথ ফুরালেন। সাঁঝবেলায় বালক দ্রোণ অগ্নিবেশ্যের শিক্ষাশ্রমে উপস্থিত হলেন। আত্মপরিচয় দিলেন। বুকের কাছে দ্রোণকে টেনে নিলেন অগ্নিবেশ্য। শিষ্যদের নির্দেশ দিয়ে খাবারের ব্যবস্থা করালেন। দ্রোণের আসার কারণ জানতে উৎসুক হলেন। কিন্তু সমস্ত দিনের কায়িক শ্রমের ক্লান্তি দ্রোণের চোখে-মুখে-দেহে। অগ্নিবেশ্য ঠিক করলেন—এখন নয়, কাল জিজ্ঞেস করা যাবে দ্রোণের আগমনের হেতু। তাঁর শোয়ার ব্যবস্থা করে নিজ কক্ষে গেলেন অগ্নিবেশ্য।

বালক দ্রোণের আগমনের কারণ জেনে একটু বিস্মিতই হয়েছিলেন অগ্নিবেশ্য। যিনি নিজ হাতে তাঁকে অস্ত্রবিদ্যা শিখিয়েছেন, তিনিই নিজ পুত্রকে পাঠিয়েছেন তাঁর কাছে! সকল প্রকার অস্ত্রবিদ্যার আধার তো মহর্ষি ভরদ্বাজ। তাহলে নিজে পুত্রকে স্বহস্তে শিক্ষা না দিয়ে তাঁর কাছে পাঠালেন কেন ? ভরদ্বাজ ত্রিকালজ্ঞ ঋষি। তিনি সৎবুদ্ধিসম্পন্ন। নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনো গূঢ় কারণ আছে। তিনি সবকিছু বিবেচনা করেই দ্রোণকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছেন নিশ্চয়ই।

অগ্নিবেশ্য উচ্চবাচ্য করলেন না। দ্রোণকে শিষ্যত্বে দীক্ষা দিলেন।

গুরুগৃহে শিক্ষার্থী দ্রোণের অবস্থান খুব সুখকর হলো না। ভরদ্বাজ-আশ্রমে তিনি ছিলেন আচার্যপুত্র। একটা বিশেষ উচ্চতায় তাঁর আদরযত্ন হতো। অগ্নিবেশ্য-আশ্রমে দ্রোণ সাধারণ শিষ্য ছাড়া আর কিছু নন। গুরুপুত্র বটে, কিন্তু শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে মুখ্য-গৌণ নেই। সবাই সমান। দ্রোণ আর অন্যান্য সাধারণ শিক্ষার্থীকে সমানভাবে মূল্যায়ন করা হতো। অপরাপর শিষ্যের মতো গুরুর সংসারের দেখভাল করতে হতো দ্রোণকে। ফলে তাঁর যথেষ্ট কায়িক পরিশ্রম হতো।

অনেক কাল, অনেকটা বছর দ্রোণকে গুরুগৃহে থাকতে হয়েছে। বহিরিন্দ্রিয় আর অন্তরিন্দ্রিয় দমন করে সমস্ত বাহ্যসুখকে বিসর্জন দিয়েছেন দ্রোণ। ব্রহ্মচর্য পালন করেছেন। বিনয় শিক্ষা করেছেন। আর গুরুসেবা তো করেছেনই নিত্যদিন। তৈলহীন মলিনতায় দ্রোণের মাথার চুলে জট বেঁধেছে। তার পরও অবসাদ তাঁকে গ্রাস করে নি। কখনো কখনো বিষণ্নতা তাঁকে বিব্রত করতে চেয়েছে, কিন্তু দ্রোণ গা-ঝাড়া দিয়ে সকল বিষণ্নতাকে মন থেকে বের করে দিয়েছেন। তাঁকে যে আগ্নেয়াস্ত্র লাভ করতে হবে।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অস্ত্রশিক্ষা ছিল পরিশ্রমের। অশেষ পরিশ্রমের মধ্যেও একটা ব্যাপার তাঁকে শান্তি দিত। তা হলো বন্ধুত্ব। দ্রুপদের বন্ধুত্ব তাঁর সকল ক্লান্তি-অবসাদ নিমিষেই হরণ করত।

দ্রুপদের পিতা পৃষত। পৃষত পাঞ্চালদেশের রাজা। রাজা পৃষত ভরদ্বাজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। একজন রাজার সঙ্গে ব্রাহ্মণ-ঋষি ভরদ্বাজের বন্ধুত্বের একটা কারণ ছিল। ভরদ্বাজ ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও অস্ত্রবিদ্যা খুব ভালোই জানতেন। রাজা পৃষতেরও অস্ত্রকৌশল জানা খুবই প্রয়োজন। কিন্তু বয়স আর আভিজাত্য সমানুপাতিক হওয়ায় নিজে শিষ্য হতে না এসে রাজা পৃষত ভরদ্বাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে নিজপুত্র দ্রুপদকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু ভরদ্বাজ-আশ্রমে তো ঋক সাম যজুর্বেদ পড়ানো হয়, অস্ত্রশিক্ষা তো দেওয়া হয় না। এই ত্রৈবিদ্যা পড়ার অছিলায় ভরদ্বাজের কাছে দ্রুপদের অস্ত্রশিক্ষা করানোটাই পৃষতের মূল উদ্দেশ্য ছিল। পৃষত মনে মনে জানতেন—ক্ষত্রিয়োচিত অস্ত্রশিক্ষার প্রতি ভরদ্বাজের এতটাই আগ্রহ যে, একসময়ে না একসময়ে দ্রোণকে তিনি অস্ত্রশিক্ষা দেবেনই। সেই সুযোগ দ্রুপদও নিতে পারবেন। শাস্ত্র বা অস্ত্র—পুত্রদ্রোণকে ঋষি ভরদ্বাজ যে শিক্ষাই দেন না কেন, দ্রুপদকে বাদ দিয়ে দেবেন না। সেইজন্য বালক দ্রুপদকে ভরদ্বাজ-আশ্রমে পাঠিয়েছেন রাজা পৃষত।

একটা সময়ে পৃষতের বিশ্বাস সত্যে পরিণত হলো। ভরদ্বাজ যখন দ্রোণকে অগ্নিবেশ্যের কাছে পাঠালেন, পৃষতপুত্র দ্রুপদেরও স্থান হলো অগ্নিবেশ্যের আশ্রমে। দুজনে গুরুগৃহে আবাসিক হলেন। সুখ-দুঃখ, বঞ্চনা-প্রাপ্তি, পূর্বলব্ধ কষ্ট এবং ভবিষ্যতের বাসনা—এইসব কিছু দুজনে ভাগাভাগি করেন।

এইভাবে ব্রাহ্মণ দ্রোণের সঙ্গে পাঞ্চালরাজপুত্র দ্রুপদের একটা নিবিড় নৈকট্য তৈরি হয়ে গেল। গুরুগৃহে একই সমতলে জীবন যাপন করলে এবং একই শিক্ষা গ্রহণ করলে মানুষের মধ্যে উঁচু-নিচু ভেদাভেদ থাকে না। ধনী-দরিদ্রের প্রভেদও ঘুচে যায় আবাসিক শিক্ষার্থীদের মন থেকে। দরিদ্রপুত্র দ্রোণের প্রতি রাজপুত্র দ্রুপদ সর্বদা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে রাখতেন। দ্রোণ খুব কৃতজ্ঞতা পোষণ করতেন দ্রুপদের প্রতি। দুই অসম পরিবারের দুই বালকের মধ্যে বন্ধুত্ব ও প্রিয়ত্ব গাঢ়তর হয়েছিল।

এইভাবে দিন গেছে, রাত গেছে, বছর গেছে, যুগও গেছে। দ্রোণ আর দ্রুপদ বালক থেকে যুবকে পরিণত হয়েছেন। তাঁদের শিক্ষাগ্রহণ প্রক্রিয়াও সমাপনের কাছাকাছি।

একদিন দ্রুপদ দ্রোণকে জিজ্ঞেস করলেন, 'দীর্ঘদিন তোমাকে একটি প্রশ্ন করব বলে মনস্থির করে রেখেছি। কিন্তু একটা সংকোচ এসে আমাকে ঘিরে ধরে। প্রশ্নটা না করাই থেকে যায়।'

'কী প্রশ্ন তোমার ?' দ্রোণ সামনের বৃক্ষরাজির দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে জিজ্ঞেস করেন।

'তুমি তো ব্রাহ্মণ। যজনযাজন তোমার বৃত্তি। শাস্ত্রাদি পাঠ করে নিজেকে এবং তোমার চারদিকের মানুষজনকে আলোকিত করা তোমার কাজ। এই বৃত্তি ছেড়ে অস্ত্রবিদ্যার প্রতি তুমি অনুরাগী হলে কেন ?'


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্রুপদের কথা শুনে দ্রোণ কোনো জবাব দিলেন না। উদাস চোখে দ্রুপদের দিকে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। দ্রুপদ দ্রোণের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু দ্রোণ কোনো উত্তর দিচ্ছেন না দেখে দ্রুপদ আবার বললেন, 'ত্যাগ আর বৈরাগ্য ব্রাহ্মণের ভিত্তি।'

'দারিদ্র্যও। ব্রাহ্মণরা আজীবন দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত হবে। ভিক্ষুকের মতো ক্ষত্রিয়ের দান গ্রহণ করবে। দানের অর্থ ফুরিয়ে গেলে রাজা বা রাজন্যের সামনে ধনের জন্য আবার হাঁটু গেড়ে বসবে। এই তো! এই তো ব্রাহ্মণের জীবন ?' উষ্মা মিশ্রিত কণ্ঠে দ্রুত কথাগুলো বলে গেলেন দ্রোণ।

দ্রোণের কথায় দ্রুপদ থতোমতো খেয়ে গেলেন। কোনোদিন দ্রোণকে রাগতে দেখেন নি দ্রুপদ। সর্বদা বন্ধুর সঙ্গে নরমকণ্ঠে মিষ্টি সুরে কথা বলেছেন। আজ সামান্য একটা প্রশ্নে দ্রোণ এত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন কেন—বুঝে উঠতে পারছিলেন না দ্রুপদ। কী বলবেন—তাও ঠিক করতে পারছিলেন না। চুপ থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করলেন। মাথা নিচু করে বন্ধুর পাশে বসে থাকলেন দ্রুপদ।

দ্রোণ নিজকে সংযত করলেন। দ্রুত নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। বন্ধুর কাছে সরে এলেন। দ্রুপদের গলা জড়িয়ে নিজের দিকে টানলেন। মৃদুস্বরে বললেন, 'ক্ষমা কোরো বন্ধু তুমি আমাকে। ক্রোধ আমাকে বাস্তবতা ভুলিয়েছিল। ক্রোধ বড় মারাত্মক রিপু। পৃথিবীর অধিকাংশ জীবননাশী কাজ ক্রোধের কারণে হয়ে থাকে।'

এরপর কণ্ঠকে আরও নিচু করে দ্রোণ বলতে লাগলেন, 'আমার পিতা ভারতবর্ষের অত্যন্ত খ্যাতিমান একজন ঋষি। সবার কাছে তিনি প্রণম্য। তাঁর জ্ঞান, তাঁর বিচক্ষণতা, তাঁর বুদ্ধি-বিবেচনার জন্য এই ব্রহ্মাণ্ড তাঁর সামনে ঝুঁকে আছে। কিন্তু বন্ধু, শুধু জ্ঞান আর সম্মান দিয়ে তো পেট চলে না। শিষ্যদের মাধুকরী বৃত্তির কারণে তপোবনে দুবেলা আহার জুটত। খুব ছোটবেলা থেকে দারিদ্র্যকে দেখে দেখে আমার ব্রাহ্মণ্যবৃত্তির প্রতি ঘৃণা ধরে গেছে।'

'ঘৃণা ধরে গেছে!' বিস্মিত দৃষ্টি দ্রুপদের।

'হ্যাঁ, শিশুকাল থেকে অশ্রদ্ধা করতে শুরু করি আমি এই জপ-তপ-শাস্ত্রপাঠকে। কিন্তু তা করেছি মনে মনে। বাবাকে বড় ভয় ও শ্রদ্ধা করতাম। বাবা চাইলে আমাদের তপোবনের দারিদ্র্য ঘুচিয়ে দিতে পারতেন।'

'কেমন করে পারতেন গুরুদেব দারিদ্র্য ঘোচাতে ?'

'বাবা যদি ধনুর্বিদ্যা শিক্ষাকে মূল বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করতেন, তাহলে অনেক ক্ষত্রিয়শিষ্য জুটত তাঁর। অর্থ সমাগম হতো প্রচুর। তাহলে কী হতো ভেবে দেখো।'

'তোমার বাবা তো ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণোচিত বৃত্তিকে অবলম্বন করাই তো তাঁর ধর্ম।'

এবার দ্রোণ বেশ জোরের সঙ্গে বলে উঠলেন, 'এই ধর্মকে আমি মানি না। একজন মানুষ চাইলে তার বৃত্তি পরিবর্তন করতে পারবে না কেন ? ব্রাহ্মণরা যজনযাজন আর


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অহংকার নিয়েই শতাব্দীর পর শতাব্দী কাটিয়ে দিল। আমার এই অহংকার নেই। আমি পরিবর্তন আনতে চাই এই প্রথার।'

'পরিবর্তন আনতে চাও ? কী করে ?'

'ব্রাহ্মণ্যবৃত্তির প্রতি আমার শ্রদ্ধা নেই। ব্রাহ্মণরা সারাটা কাল ধনশালী আর ক্ষমতাবানদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে—তাও মানি না। একজন ব্রাহ্মণ অস্ত্রবিদ হলে দোষের কী ? আমি ধনুর্বিদ হলে আমার দারিদ্র্য ঘুচবে, আমার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে—এই আশা তো করতে পারি আমি, কী বলো ?'

দ্রোণের যুক্তির সামনে দ্রুপদ অনেকটা নির্বাক হয়ে গেলেন। শাস্ত্রের কোথাও এমন করে লিখা নেই যে, একজন ব্রাহ্মণসন্তান যুদ্ধ করতে পারবে না, একজন ব্রাহ্মণসন্তান অস্ত্রশিক্ষা গ্রহণ করে ক্ষত্রিয়োচিত অস্ত্রবিদ্যায় দক্ষ হতে পারবে না। আর ব্রাহ্মণরা সারা জীবন দারিদ্র্যে ডুবে থাকবেন কেন ? তাঁদের কি স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে নেই ? অবশ্যই আছে। দ্রোণের যুক্তি অকাট্য। গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন দ্রুপদ। দ্রোণের উচ্চ কণ্ঠে সংবিৎ ফিরল তাঁর। দ্রোণ বললেন, 'কিছু বলছ না যে!'

'তোমার যুক্তি যথার্থ।'

'সেইজন্য বাবাকে হাতেপায়ে ধরে আমি রাজি করিয়েছি। আমারই প্রবল অনুরোধে তিনি আমাকে গুরুদেব অগ্নিবেশ্যের আশ্রমে পাঠিয়েছেন। শোনো দ্রুপদ, ব্রাহ্মণের যা স্বধর্ম, সেই যজনযাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা অথবা দান প্রতিগ্রহণের যে সরলজীবন তা আমি চাই না। এই জীবনে সম্মান থাকতে পারে, মুক্তি নেই।' বললেন দ্রোণ।

একটু মৃদু হেসে দ্রুপদ বললেন, 'মানে তুমি তোমার জীবনের ধারাকে পাল্টে ফেলতে চাও ?'

'হ্যাঁ, যথার্থ বলেছ তুমি। আমি চাই উজ্জ্বল সমৃদ্ধির জীবন। যে জীবনে অর্থ, সম্মান, ভোগ, দাস-দাসী, হস্তী-অশ্ব-রথ আছে, সেই জীবনকে আমি করতলগত করতে চাই।' তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন দ্রোণ। অনেকটা স্বগত কণ্ঠে বললেন, 'জানি না, এইরকম সমৃদ্ধ জীবনের অধিকারী আমি হতে পারব কি না।'

'তুমি অতশত ভাবছ কেন দ্রোণ ? আমি আছি না!'

'মানে!' দ্রুপদের কথার মানে দ্রোণ ধরতে পারলেন না।

'শোনো, তুমি কত বড় ধনুর্ধর হবে আমি জানি না। তবে তুমি যে ভবিষ্যতে একজন ধনবান হবে, মানে রাজা হবে, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

'ঠাট্টা করছ আমাকে ? যার পিতার প্রধান অলঙ্কার দারিদ্র্য, যে সারাটা জীবন অর্ধেকপেট খেয়ে, সামান্য পরিধান করে কাটিয়ে দিল, সে হবে ধনবান রাজা!' তারপর একটু থেমে দ্রোণ বললেন, 'রাজপুত্র তুমি। পাঞ্চালের ভবিষ্যৎ নরপতিও বটে। তোমার উপহাসটা তো রাজকীয় হওয়া চাই। হয়েছেও বটে। রাজা হব আমি!' বলে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকলেন দ্রোণ।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরম ভালোবাসায় দ্রোণের হাতটা নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে টেনে নিলেন দ্রুপদ। বললেন, 'আমি তোমাকে বিদ্রূপ করি নি বন্ধু। সত্য কথাটাই বলেছি। তুমিই তো বলেছ—পাঞ্চালের ভবিষ্যৎ-রাজা আমি। আমি বাবার একমাত্র পুত্র। বাবার পরে আমিই রাজা হব পাঞ্চাল দেশের। পিতার বড় আদরের সন্তান আমি। আমি কথা দিচ্ছি—বাবা যেদিন আমাকে তাঁর রাজ্যে অভিষিক্ত করবেন, সেদিন আমার রাজ্য আমার মতো তোমারও ভোগ্য হবে।'

দ্রোণ দ্রুপদের কথার কোনো অর্থ বুঝলেন না। ফ্যালফ্যাল করে নিস্পলক চোখে দ্রুপদের দিকে তাকিয়ে থাকলেন শুধু।

'বুঝতে পারো নি তো আমার কথা ?' জিজ্ঞেস করলেন দ্রুপদ।

দ্রোণ ডানে-বামে মাথা নাড়লেন।

কোমল কণ্ঠে দ্রুপদ বললেন, 'প্রথম কথা—আমি তোমাকে বড় ভালোবাসি দ্রোণ। দ্বিতীয় কথা—আমি যা বলেছি, মিথ্যে বলি নি। আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করে বলছি, তুমি নিশ্চিত থাকো—আমি রাজা হলে আমার রাজ্যের অর্ধেক হবে তোমার। ওই অর্ধেক রাজ্যের রাজা হবে তুমি। রাজা হলে তোমার বাসনার পরিপূরণ হবে। তোমার দারিদ্র্য ঘুচবে। অর্থ-বৈভব, দাস-দাসী—সবই হবে তোমার।'

দ্রোণ তখনো তাঁর শ্রবণেন্দ্রিয়কে বিশ্বাস করতে পারছেন না। এ কী বলছেন দ্রুপদ ? বালসুলভ বাগাড়ম্বর, না রাজাসুলভ প্রতিজ্ঞা ? দ্রুপদ শুধু 'প্রতিজ্ঞা করছি' বললেন না। বললেন, 'সত্য প্রতিজ্ঞা করে বলছি।' সত্য শব্দটির সঙ্গে তো ধর্ম জড়িত। তাহলে দ্রুপদ কি ধর্মের নামে প্রতিজ্ঞা করে বলছেন যে, রাজ্যের অর্ধ, সুখভোগ তাঁরও অধীন হবে ?

অন্তর্দ্বন্দ্বের ছাপ দ্রোণের চোখেমুখে স্পষ্ট হয়ে উঠল। দ্রুপদ স্পষ্ট বুঝতে পারলেন—দ্রোণের ভেতরে বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের একটা প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব চলছে। তাঁর কথা বিশ্বাস করবেন, না উড়িয়ে দেবেন—এ নিয়ে বিপুলভাবে বিচলিত দ্রোণ। তাঁর এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানো দরকার।

স্পষ্ট ভাষায় দ্রুপদ বলে উঠলেন, 'তদ্‌ভোগ্যং ভবিতা রাজ্যং সখে সত্যেন তে শপে।'

দ্রুপদের স্পষ্ট প্রতিজ্ঞাবাণী শুনে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন দ্রোণ। সহসা বসা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর দেখাদেখি দ্রুপদও দণ্ডায়মান হলেন। দ্রোণ হঠাৎ বুকের কাছে টেনে নিলেন দ্রুপদকে।

দ্বিপ্রহর। দুপুরে অগ্নিবেশ্য সশিষ্য আহার করেন।

তাঁকে ঘিরে শিষ্যরা বৃত্তাকারে ভোজনে বসেন। প্রত্যেকের সামনে কলাপাতা রাখা হয়। সেখানে নানা ফলমূল। একাংশে অন্ন আর ব্যঞ্জন। প্রথমে সকলে ফল খান, তারপর ব্যঞ্জনান্ন। কিন্তু সর্বপ্রথমে আচমন করেন। জলপাত্র থেকে ডান হাতে জল নিয়ে কদলিপত্রের চারপাশে ছিটিয়ে দেন। ডান হাতের বুড়ো-তর্জনী-মধ্যমা সহযোগে সামান্য ব্যঞ্জনান্ন তুলে নেন সকলে। তারপর ডান হাতটা কপালে ঠেকান। স্রষ্টার উদ্দেশে ওই ব্যঞ্জনান্ন জলসিঞ্চিত


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্থানে ভক্তিভরে রাখেন। তারপর খাওয়া শুরু করেন। গুরুদেব খাদ্য মুখে নিলে অন্যরা খাওয়া শুরু করেন। এটাই আশ্রমের বিধি। খাওয়া শেষ করে অগ্নিবেশ্য গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। কয়েক ঘটিকা দিবানিদ্রায় কাটান তিনি।

সেদিন খাওয়ার পর নিজ কক্ষে গেলেন না অগ্নিবেশ্য। উঠানের মাঝখানে একটা বৃহৎ বিল্ববৃক্ষ। তার গোড়া মাটি দিয়ে বাঁধানো। সাধারণত ওখানেই গুরুদেব গিয়ে বসেন। শিষ্যদের সঙ্গে শাস্ত্রালাপ করেন। আজকে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটালেন অগ্নিবেশ্য। অন্যদের বিশ্রামাগারে পাঠিয়ে দ্রোণ আর দ্রুপদকে থেকে যেতে বললেন। তাঁদের সঙ্গে নিয়ে বিল্ববৃক্ষের গোড়ায় বাঁধানো বেদিতে গিয়ে বসলেন গুরুদেব।

দ্রোণ-দ্রুপদ বিস্মিতই হলেন। এই ভরদুপুরে কোন কথাটা বলবেন বলে গুরুদেব দুজনকে ডেকে আনলেন এখানে! নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু। দুজনের বক্ষই দুরু দুরু। অজান্তে কোনো অপরাধ করে ফেলেন নি তো! অগ্নিবেশ্যের সামনে যোগাসনে বসলেন দুজনে। বৃক্ষের গোড়াটা ছায়াচ্ছন্ন। দুজনে প্রশ্নবোধক চোখে গুরুর দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

অগ্নিবেশ্য শিষ্য দুজনের ত্রস্ততার ব্যাপারটি বুঝতে পারলেন। বললেন, 'তোমরা সন্ত্রস্ত হয়ো না। একটা বিষয় তোমাদের বলব বলে এখানে ডেকে এনেছি।'

তারপর মমতাভরা তৃপ্তির চোখে শিষ্য দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকলেন অগ্নিবেশ্য। কিছুক্ষণ পর বললেন, 'তোমাদের বিদ্যার্জন সম্পন্ন হয়েছে। তোমরা এখন নিজ গৃহে ফিরে যেতে পারো। আমার যা কিছু জানা, তার প্রায় সবটাই তোমাদের শিখিয়ে দিয়েছি। তোমরা এখন যুবক হয়ে উঠেছ। তোমরা যেমন অসি চালনায় দক্ষ হয়ে উঠেছ, তেমনি তীর চালনাতেও। তোমরা এখন জগতের খ্যাতিমান ধনুর্ধর। স্ব-স্ব ক্ষেত্রে কীর্তিধর হয়ে উঠবে তোমরা। তোমাদের ধৈর্য, জ্ঞানাহরণাগ্রহ আমাকে মুগ্ধ করেছে। তোমরা কষ্টসহিষ্ণু আর অধ্যবসায়ী। আর শিষ্যজীবনের সবচেয়ে বড় গুণ যেটা, সেই বিনম্র শ্রদ্ধাবোধ তোমাদের মধ্যে সম্পূর্ণত বিরাজমান। বাহুবলে, শারীরিক শক্তিতে আর অস্ত্রবিদ্যায় তোমরা পূর্ণ হয়ে উঠেছ। বৎসদ্বয়, তোমরা আমার আশীর্বাদপুষ্ট হয়েছ। তোমরা নিজ নিজ আলয়ে ফিরে যাও। আগামীকালই চলে যেতে পারো তোমরা। আজীবন তোমাদের ওপর আমার আশীর্বাদ বর্ষিত হবে।' দীর্ঘক্ষণ কথা বলে হাঁপিয়ে উঠেছেন অগ্নিবেশ্য। তাঁর কপালে স্বেদবিন্দু।

দ্রুপদ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন গুরুদেবকে। জোড়হাতে বললেন, 'তাহলে আমি যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকি গুরুদেব ?'

'অবশ্যই।' অগ্নিবেশ্য দ্রুপদকে অবশ্যই বললেন বটে, কিন্তু কপালটা তাঁর সামান্য কুঁচকানো। দৃষ্টি তাঁর দ্রোণের ওপর নিবদ্ধ।

দ্রুপদ যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলেও, গুরুদেবকে প্রণাম করলেও দ্রোণ তার কিছুই করলেন না। পূর্ববৎ যোগাসনে বসে রইলেন। চোখ ইশারায় দ্রুপদকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে পূর্ণদৃষ্টিতে দ্রোণের দিকে তাকালেন অগ্নিবেশ্য।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ রকম অবস্থায় আশ্রম-আশ্রিত শিক্ষার্থীরা সাধারণত উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। দীর্ঘদিন পরিবার-পরিজন বিচ্ছিন্ন থাকার দরুন তাঁদের মধ্যে একধরনের অস্থিরতা-অস্বস্তি তৈরি হয়। পিতা-মাতার জন্য, স্বস্থানের অধিবাসীদের জন্য, সর্বোপরি পরিচিত গৃহকোণের জন্য তাঁদের ভেতর চাপা হাহাকারের সৃষ্টি হয়। কখনো কখনো আশ্রমজীবনকে বন্দিজীবন বলেও মনে হয় তাঁদের। গুরুর এ ধরনের আশীর্বাদপুষ্ট অনুমতি পেলে সেই বন্দিজীবনে মুক্তজীবনের হাওয়া বয়। ভেতরের রুদ্ধ সব অর্গল খুলে যায় তাঁদের। স্বগৃহে ফিরে যাওয়ার জন্য উদগ্র আগ্রহ সৃষ্টি হয় তাঁদের মধ্যে।

দ্রুপদের মধ্যে সেই স্বাভাবিক আগ্রহ দেখে অগ্নিবেশ্য অখুশি হলেন না, বরং তৃপ্তিবোধ করলেন। কিন্তু বিচলিত বোধ করতে লাগলেন দ্রোণের মধ্যে কোনো ভাবান্তর না দেখে। দ্রোণ তো মানুষ, স্বাভাবিক মানুষ। তাঁর মধ্যে রাগ-অনুরাগ আছে। ক্রোধ-অস্থিরতা আছে। হাস্য-পরিহাসপ্রিয়তাও কখনো কখনো অগ্নিবেশ্য দ্রোণের মধ্যে লক্ষ করেছেন। পিতা ভরদ্বাজের প্রতি তাঁর অপরিসীম ভক্তি। দীর্ঘদিন সেই পিতা থেকে দ্রোণ দূরে আছেন। পিতাকে দেখার প্রচণ্ড আগ্রহ তো তাঁর মধ্যে থাকা উচিত। কিন্তু কোথায়, তাঁর কথা শুনে সে রকম কোনো ব্যগ্রতা তো দ্রোণের মধ্যে দেখা গেল না ? কী কারণ ? তাঁর অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা কি অসম্পূর্ণ থেকে গেছে ? না কোনো গোপন কথা বলতে চান দ্রোণ ? মনের ভেতর আঁতিপাঁতি করে খুঁজে দেখলেন অগ্নিবেশ্য—দ্রোণের কোনো শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে কি না। সেরকম কোনো কিছুই খুঁজে পেলেন না নিজের মধ্যে। তাহলে দ্রোণের এই অস্বাভাবিকতার কারণ কী ? কপাল কুঁচকে প্রশ্নবোধক চোখে শিষ্যের দিকে তাকিয়ে থাকলেন গুরুদেব।

দ্রুপদ সেস্থান থেকে অপসৃত হলে দ্রোণ করজোড়ে বললেন, 'মহাত্মন, আমি বুঝতে পারছি, আমার অস্বাভাবিক আচরণে আপনি বিচলিত বোধ করছেন। আমার একটা নিবেদন আছে বলে দ্রুপদের মতো স্বাভাবিক আচরণ করি নি আপনার সামনে।'

'কী তোমার নিবেদন ?' অগ্নিবেশ্যের চোখ আর কপাল থেকে বিস্ময়ের চিহ্ন তখনো মুছে যায় নি।

'আমার অস্ত্রবিদ্যার্জন এখনো সম্পন্ন হয় নি।'

'সম্পন্ন হয় নি!'

'না, মহাত্মন! আমার শিক্ষা এখনো অসম্পূর্ণ থেকে গেছে।'

'তোমার কথা আমি ঠিকমতন বুঝতে পারছি না। বুঝিয়ে বলো।' কিছুটা বিরক্তি অগ্নিবেশ্যের কথায়।

'আপনি সকল অস্ত্রবিষয়ে আমাকে জ্ঞান দান করেছেন, শুধু একটা অস্ত্র ছাড়া।'

'কোন অস্ত্রের কথা বলছ তুমি ?'

দ্রোণ মাথা নত করে নরম স্বরে বললেন, 'ব্রহ্মাস্ত্র। ব্রহ্মাস্ত্র লাভ হয় নি আমার এখনো।'


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অগ্নিবেশ্যের সহসা আগ্নেয় অস্ত্রটির কথা মনে পড়ে গেল। এই অস্ত্রবিদ্যাটি তিনি তো দ্রোণপিতা ভরদ্বাজের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন। প্রথমে গুরুদেব ভরদ্বাজ দ্বিধান্বিত ছিলেন—এই অস্ত্রটি অগ্নিবেশ্যের হাতে অর্পণ করবেন কি না। পরে তাঁর আনুগত্য, সহনশীলতা, অধ্যবসায় আর সৌম্যভাব দেখে ভরদ্বাজ মত পাল্টেছিলেন। ব্রহ্মাস্ত্রটি তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন তিনি।

ব্রহ্মাস্ত্রের কথা দ্রোণ জানল কোথা থেকে ? নিশ্চয়ই পিতার কাছ থেকে জেনেছেন। এই আগ্নেয় অস্ত্রটি কি দ্রোণকে দেওয়া উচিত ? গুরুদেব ভরদ্বাজ বলেছিলেন—এই অস্ত্র যার-তার জন্য নয়। যে ক্রোধের অধীন, যে কষ্টসহিষ্ণু নয়, যার হিতাহিত জ্ঞান স্বল্প, সে কখনো এই অস্ত্র পাওয়ার যোগ্য নয়। কিন্তু দ্রোণের তো এই গুণগুলো আছে। তিনি তো অস্ত্রটি পাওয়ার যোগ্যতা রাখেন।

আর একটি বিষয় অগ্নিবেশ্যের মাথায় খেলে গেল। গুরুদেব ভরদ্বাজও বোধ হয় চান যে, দ্রোণ ব্রহ্মাস্ত্রের অধিকারী হোক। সেই কারণেই হয়তো শিষ্য হিসেবে তাঁর কাছে পাঠিয়েছেন দ্রোণকে। নইলে অন্য কোনো অস্ত্রগুরুর কাছে দ্রোণকে পাঠাতেন তিনি। অন্য অস্ত্রগুরুরা তো ব্রহ্মাস্ত্রের সন্ধান জানেন না।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে অগ্নিবেশ্য বললেন, 'বৎস, বড় দুর্দমনীয় অস্ত্র এটি। জগতের কয়েকজন মাত্র জানেন এই অস্ত্রের বিদ্যাটি। অসহিষ্ণু, ক্রোধান্বিত মানুষের হাতে এই চরম অস্ত্রটি পড়লে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছারখার হয়ে যাবে।'

'আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি—ক্রোধ-লোভ-মোহ দ্বারা আমি কখনো প্রভাবিত হব না।'

অগ্নিবেশ্য স্থির চোখে দ্রোণের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তিনি অন্তর্চক্ষু দিয়ে দেখতে পেলেন—এই যুবকটি ভবিষ্যতে অস্ত্রসাধনায় ভুবনবিখ্যাত হয়ে উঠবেন। পরবর্তী প্রজন্মের গুরু হওয়ার সকল গুণ অগ্নিবেশ্য তাঁর এই শিষ্যটির মধ্যে স্পষ্ট অনুভব করতে লাগলেন। তিনি মনে মনে ঠিক করলেন, ব্রহ্মাস্ত্রটি তিনি দ্রোণের হাতে তুলে দেবেন। কিন্তু তার আগে দ্রোণের সঙ্গে কিছু কথা বলা প্রয়োজন।

অগ্নিবেশ্য বললেন, 'বৎস দ্রোণ, এই অস্ত্রটির প্রকৃত নাম ব্রহ্মশির। এটি মারাত্মক এক অস্ত্র। বিধ্বংসী, সর্বগ্রাসী। অতি ভয়ংকর এই ব্রহ্মশির নিমিষেই শত-সহস্র মানুষকে নিধন করার ক্ষমতা রাখে।'

'পিতার কাছে শুনেছি ব্রহ্মাস্ত্রের বিপুল ভয়ঙ্করতার কথা।' বললেন দ্রোণ।

অগ্নিবেশ্য বললেন, 'অস্ত্র-শিক্ষার সঙ্গে অস্ত্র প্রয়োগের সংযম যার মধ্যে আছে, সে-ই শুধু এই ব্রহ্মাস্ত্রটি পাওয়ার অধিকার রাখে।'

দ্রোণ কথা বললেন না। একাগ্রচিত্তে অগ্নিবেশ্যের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

'তোমাকে আমি ব্রহ্মাস্ত্রটি প্রদান করব। কিন্তু তার আগে প্রতিজ্ঞা করতে হবে তোমায়।' বললেন অগ্নিবেশ্য।

'কী প্রতিজ্ঞা গুরুদেব ?' দ্রোণের দু'চোখে আনন্দ-আলো ছড়িয়ে পড়ল।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবার অগ্নিবেশ্য গুরুগম্ভীর গলায় আদেশের সুরে বললেন, 'এই অস্ত্র কখনো সাধারণ মানুষের ওপর প্রয়োগ করতে পারবে না। স্বল্পশক্তির যোদ্ধাকে এই মারাত্মক অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করতে পারবে না। বলো, এই দুটো শর্ত তুমি মেনে চলবে কি না ?'

'আপনার আদেশ শিরোধার্য করে রাখব আমি।' বিনীত কণ্ঠে বললেন দ্রোণ।

গুরুগৃহে অস্ত্রচর্চার শেষ পুরস্কার পেলেন দ্রোণ। ঋষি অগ্নিবেশ্য ব্রহ্মশির অস্ত্রটির মন্ত্র এবং এটি ছোড়ার কৌশল অতিযত্নে দ্রোণকে শিখিয়ে দিলেন।

ব্রহ্মাস্ত্র পাওয়ার পর দ্রোণ পিতৃ-আশ্রমে ফিরে এলেন। এই সময় তাঁর মনে পরম সন্তুষ্টি থাকার কথা। কিন্তু অস্ত্রবিদ্যা শেখা আর ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্তির ফলে তাঁর মনে যেরকম তৃপ্তি থাকার কথা, সে রকম আনন্দ তিনি নিজের মধ্যে অনুভব করছেন না। আরও শেখার, আরও অর্জন করার জন্য প্রবল উচাটনভাব তাঁর মধ্যে বিরাজ করতে লাগল। তিনি বুঝতে পারছেন, ঋষি অগ্নিবেশ্যের কাছ থেকে অর্জিত অস্ত্রবিদ্যা শেষবিদ্যা নয়। অগ্নিবেশ্যের চেয়ে আরও মহৎ অস্ত্রশিক্ষাগুরু এই ভারতবর্ষে নিশ্চয়ই আছেন। তাঁদের কাছ থেকে বিদ্যার্জনের জন্য প্রচণ্ড একটা আকাঙ্ক্ষা দ্রোণকে আকুল করে তুলল।

কার কাছে যাবেন তিনি ? কোন মহৎ অস্ত্রবিদ্ তাঁকে শ্রেষ্ঠতমের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারবেন ?

এই সময় তিনি পরশুরামের কথা অবগত হলেন। পরশুরাম মহাপরাক্রমশালী ঋষি। তিনি ধনুর্বেদ এবং অস্ত্রবিদ্যায় অত্যন্ত যশস্বী পুরুষ। তিনি পিতৃ-অনুরক্ত। মহাদেবকে তপস্যায় তুষ্ট করেন তিনি। বজ্রতুল্য অস্ত্রসমূহ মহাদেবের কাছ থেকে তিনি লাভ করেছেন। জীবিত ও মৃত অস্ত্রবিদ্‌দের মধ্যে পরশুরাম অগ্রগণ্য।

এসব কাহিনি শুনে শুনে পরশুরামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করার প্রবল বাসনা জাগে দ্রোণের মনে। তিনি মনস্থির করেন, মহর্ষি পরশুরামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর কাছ থেকে অস্ত্রবিদ্যা শিখবার আবেদন জানাবেন।

আরও একটা ঘটনার কথা তখন তাঁর কানে এল। এই সময় তিনি জানতে পারলেন পরশুরাম তাঁর সমস্ত ধন ব্রাহ্মণদের দান করে দিচ্ছেন। দ্রোণের মধ্যে ধনলিপ্সা জাগল। পরশুরামের এই কাহিনিটি শুনে তিনি ঠিক করলেন, যে-কোনো মূল্যে মহাত্মা পরশুরামের সঙ্গে দেখা করবেন।

কিন্তু পরশুরামের নিকট উপস্থিত হতে হতে দ্রোণ বেশ দেরি করেই ফেললেন। পরশুরাম তখন মহেন্দ্র পর্বতে অবস্থান করছিলেন। ভরদ্বাজ-আশ্রম থেকে মহেন্দ্র পর্বত বহুদূরে। বহু শ্রম, অশেষ কষ্ট সহ্য করে, বন্ধুর পথ অতিক্রম শেষে পরশুরামের আশ্রমে উপস্থিত হলেন দ্রোণ। তাঁর উদ্দেশ্য—পরশুরামের কাছে মহাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্রের পাঠ নেওয়া। কিন্তু পরশুরামের সামনে গিয়ে সব গুলিয়ে গেল দ্রোণের। সিদ্ধান্ত বদলালেন তিনি।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঋষি পরশুরামের সামনে নতজানু হয়ে দ্রোণ বললেন, 'আমি একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান। সারাটা জীবন অভাব-অনটনের সঙ্গে আমার বসবাস। মহাত্মন, শুনেছি আপনি দানবীর। আপনার সকল সম্পদ ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিলিয়ে দিচ্ছেন—।'

'তুমি যথার্থ শুনেছো যুবক।' নিমীলিত চোখে পরশুরাম বললেন।

'তাহলে আমাকে দারিদ্র্যের কশাঘাত থেকে মুক্ত করুন। আমাকে ধন দিন, যাতে নিত্যদিনের অভাব থেকে আমি মুক্তি পাই।'দ্রোণ করুণ কণ্ঠে বললেন।

এবার পরশুরাম পূর্ণদৃষ্টিতে দ্রোণের দিকে তাকালেন। দীর্ঘদেহী, গৌরবর্ণ, উন্নত নাসা, ব্যক্তিত্বশালী দ্রোণকে দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। বললেন, 'বৎস, তোমার প্রকৃত পরিচয় দাও।'

'আমি মহর্ষি ভরদ্বাজের পুত্র দ্রোণ।'

দ্রোণের কথা শুনে পরশুরামের অন্তরটা ব্যথায় টনটনিয়ে উঠল।

নরম কণ্ঠে বললেন, 'ঋষি ভরদ্বাজের পুত্র তুমি! তোমার মনোহর চেহারা দেখে আমি মুগ্ধ। কিন্তু পুত্র, আমি যে তোমার প্রার্থনার পরিপূরণ করতে অক্ষম।'

দ্রোণ হতাশ গলায় বললেন, 'কেন মহাত্মন ? শুনেছি—দান গ্রহণেচ্ছু ব্রাহ্মণের প্রসারিত দুটো হাত আপনি আপনার ধনৈশ্বর্য দিয়ে ভরিয়ে দিচ্ছেন। আমিও আমার খালি হাত দুটো ধন-প্রার্থনায় আপনার দিকে প্রসারিত করেছি। শূন্য হাতে ফেরাবেন কেন ?'

'আমি যে নিরুপায় বৎস।'

'অপরাধ মার্জনা করবেন। আপনার এই অসহায়তা কি শুধু আমার জন্য ?'

'হ্যাঁ, শুধু তোমার জন্যই। তোমার পূর্ববর্তী ব্রাহ্মণ পর্যন্ত আমি ধনসম্পদ দিতে পেরেছি। আমার যা কিছু ছিল ওসবের সবটাই আমি ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছি। তোমাকে দেওয়ার মতো কোনো কিছুই অবশিষ্ট নেই এখন আমার কাছে।'

'কোনো কিছুই নেই ?'

দ্রোণের শেষ প্রশ্নে পরশুরাম বিহ্বল হলেন। একটু থমকে গেলেন যেন। তাঁর মধ্যে ইতস্তত ভাব জাগল। তিনি মনস্থির করে ভাবতে লাগলেন। তাঁর যা কিছু ধন-অর্থ ছিল, সবই তো দরিদ্র ব্রাহ্মণদের মধ্যে দান করে দিয়েছেন। তাহলে এই ব্রাহ্মণসন্তানকে তিনি কি কিছুই দিতে পারবেন না! একজন ব্রাহ্মণ তাঁর দরজা থেকে খালি হাতে ফিরে যাবে! তিনি কোনো কূলকিনারা খুঁজে পেলেন না।

ম্রিয়মাণ কণ্ঠে পরশুরাম বললেন, 'বৎস, তোমাকে দেওয়ার মতো সত্যি আমার কাছে কোনো ধনসম্পদ নেই। তবে...।'

পরশুরামের অর্ধসমাপ্ত কথা শুনেও দ্রোণ চুপ করে থাকলেন। পরশুরাম চিন্তায় নিমগ্ন হলেন।

তারপর গভীর নিদ্রা থেকে জাগ্রত মানুষের কণ্ঠে বললেন, 'তবে আমার কাছে তোমাকে দেওয়ার মতো দুটো জিনিস আছে। নানারকম অস্ত্রশস্ত্র আর আমার এই শরীরটি।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ দুটোর যেকোনো একটি আমি তোমাকে দান করতে প্রস্তুত আছি। বলো তুমি কোনটা পেতে আগ্রহী ?'

হঠাৎ বিপুল আনন্দে দ্রোণের চোখমুখ ভেসে গেল। তিনি তো অস্ত্রের জন্যই পরশুরামের কাছে এসেছিলেন। ধনলোভে বিভ্রান্ত হয়ে তিনি সিদ্ধান্তচ্যুত হয়েছিলেন। তাই অস্ত্র বাদ দিয়ে সম্পদ চেয়ে বসেছিলেন পরশুরামের কাছে। কিন্তু ঈশ্বরের কী কৃপা! বাঞ্ছিত জিনিসই তাঁর জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন তিনি। এইজন্যই বোধহয় তাঁর আগে মহর্ষির কাছে কেউ অস্ত্রগুলো যাচ্না করে নি।

দ্রোণ পরশুরামের সামনে হঠাৎ হাঁটু গেড়ে বসলেন। বললেন, 'গুরুদেব, আমি আপনার কাছে অস্ত্রশস্ত্র প্রার্থনা করছি।'

তারপর বেশ কিছুদিন ধরে পরশুরাম দ্রোণকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিলেন। একান্ত মনে দ্রোণ সেই শিক্ষা গ্রহণ করলেন।

শেষ পর্যন্ত দ্রোণ ভারতবর্ষের একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ধনুর্ধরে রূপান্তরিত হলেন।

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা।

অসাধারণ অস্ত্রশিক্ষায় শিক্ষিত যুবক দ্রোণ পিতার আশ্রমে ফিরে এলেন।

তখন দ্রোণ অন্য মানুষ। তাঁর চোখ খুলে গেছে, মন প্রসারিত হয়ে গেছে। আশ্রমের সীমাবদ্ধ গণ্ডি ছাড়িয়ে তাঁর জগৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। তাঁর সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ—দ্রোণ স্পষ্ট বুঝতে পারছেন। পিতৃ-আশ্রমে ফিরে দেখলেন—সেই আগের মতোই আশ্রমের ক্রিয়াকর্ম চলছে, পূর্ববৎ স্বাহা-স্বধা-বষট্‌কার ধ্বনিতে আশ্রমাঙ্গন মুখরিত। এই যজ্ঞক্রিয়া এবং ব্রাহ্মণের ওঙ্কার ধ্বনি দ্রোণের ভালো লাগল না।

তাঁর মন অনাগত দীপ্তিমান ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হচ্ছে। আগের মতো আশ্রমের কাজে মন লাগাতে পারছেন না তিনি। তপোবনের চেয়ে তপোবনের বাইরে ঘুরে বেড়াতে পারলে তাঁর মন অধিকতর তৃপ্তি পাচ্ছে। একটা উদাসীন ভাব সর্বদা দ্রোণকে ঘিরে রেখেছে।

পিতা ভরদ্বাজ পুত্রের এই অন্যমনস্কতা, এই অস্থিরতা লক্ষ করেন। তিনিও এককালে দ্রোণের মতোই যুবক ছিলেন। যুবক মনের হাহাকার তিনি এই বৃদ্ধ বয়সেও অনুধাবন করতে পারেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস—কোনো নারীকে নিজের করে পাওয়ার জন্য যৌবনঋদ্ধ পুরুষের মধ্যে যে হাহাকার জাগে, দ্রোণের মধ্যেও তা-ই জেগেছে। নইলে কেন ব্রাহ্মণসন্তান হয়েও যাগযজ্ঞে মন নেই দ্রোণের ? কেন দ্রোণ তপাশ্রমের শান্তসৌম্য পরিবেশ ছেড়ে বনে-অরণ্যে একা একা ঘুরে বেড়ান ?

ঋষি ভরদ্বাজ একদিন দ্রোণকে কাছে বসালেন। বললেন, 'পুত্র, আমি বৃদ্ধ হয়েছি। যে-কোনো সময় পরপারের ডাক আসতে পারে।' বলে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন ঋষি। দ্রোণ কিছু বলেন কি না তা শুনবার জন্য অপেক্ষা করলেন আরও কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, 'তুমি ভাবছ—কী কথা বলবার জন্য এই ভূমিকাটুকু করছি ? তুমি যথার্থ ধরেছ। আমি তোমার বিয়ের কথাই বলছি। তুমি এখন যৌবনলগ্ন। শাস্ত্রপাঠ আর অস্ত্রপাঠ—দুটোই প্রায় সমাপন করেছ তুমি। তুমি বিবাহযোগ্য হয়ে উঠেছ। তুমি বিয়ে কোরো।'

কী আশ্চর্য! পিতা কী করে বুঝতে পারলেন তাঁর মনের কথা! পিতার কথার অবতরণিকা শুনে তাঁর একটা কথাই মনে হয়েছিল—পিতা তাঁর বিয়ের কথা বলতে চান। এবং বললেনও তা-ই। অন্তর্যামী নাকি তিনি!



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্রোণ কোমল গলায় বললেন, 'পিতা, আমার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, প্রাপ্য করতলগত নয়। দারিদ্র্যময় জীবন। এই সময় একজন নারীকে অনিশ্চিত জীবনের মধ্যে টেনে আনা কি বিচক্ষণতার কাজ হবে ? আমি এই মুহূর্তে বিয়ে করতে চাই না পিতা।'

'মানুষ বাগান করে পুষ্পসৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য। সেই পুষ্পে যখন মধু সঞ্চারিত হয়, বাগান আরও মনোলোভা হয়ে ওঠে। তুমি আমার বাগানের ফুল। বিবাহ সেই ফুলে সৌরভ সঞ্চার করবে। তোমার স্ত্রী, সন্তান—এদের দেখে যেতে পারলে আমার আনন্দের অন্ত থাকবে না পুত্র।'

'আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত নই পিতা। কারণ ওদের আমি অনাদর-অনাহারের জীবন উপহার দিতে চাই না।'

'কে বলল ওরা আদর যত্ন পাবে না ? আমি গৃহী নই বটে, সন্তান-সংসার সম্পর্কে একেবারে তো অনভিজ্ঞ নই। তুমিই তো তার প্রমাণ।'

'কিন্তু দারিদ্র্য থেকে তো ওরা মুক্তি পাবে না। দীনতা তো সর্বদা তাদের কুরে কুরে খাবে।'

ভরদ্বাজের কাছে এ প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। দারিদ্র্য তাঁর আজন্ম সঙ্গী। পুত্র দ্রোণেরও তা-ই। তাঁর উত্তরাধিকারীরাও তো দৈন্য থেকে মুক্তি পাবে না কোনোদিন। ভরদ্বাজ অধোবদনে নিরুত্তর রইলেন।

দ্রোণ ধীরে ধীরে বললেন, 'আমি আপনার কথা রাখব বাবা। তবে এখন নয়। যদি কখনো আমার ধনৈশ্বর্য লাভ হয়, সেদিন প্রথম যে কাজটি করব, তা হলো—বিয়ে।'

এই সময় দ্রোণ ভাবছেন—তাঁর অবস্থার পরিবর্তন তো একদিন হবেই। দ্রুপদ সত্য প্রতিজ্ঞা করে বলেছে—আমি রাজা হওয়ার পর যা ভোগ করব, তা তোমারও ভোগ্য হবে। পিতা পৃষতের মৃত্যুর পর সে পাঞ্চালরাজ্যের নৃপতি হবে। নৃপতির হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, কোষাগার ভর্তি সোনাদানা, কড়ি, মণিমুক্তা, প্রাসাদভর্তি দাস-দাসী। এসবের আস্বাদন তো তিনিও করতে পারবেন। শুধু সময়ের ব্যাপার। রাজা পৃষতের মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, এই যা।

পিতার কথায় সংবিৎ ফিরল দ্রোণের, 'তাহলে তুমি এখন বিয়ে করবে না ?'

'আমাকে ক্ষমা করবেন পিতা।'

ভরদ্বাজ মৌন হলেন। দ্রোণের এ কথার পরে আর কোনো কথা বলতে ইচ্ছে করল না তাঁর। হাত ইশারায় পুত্রকে স্থানত্যাগ করতে বললেন।

বিয়ের ব্যাপারটি নিয়ে দ্রোণ আগে তেমন করে ভাবেন নি। একটা সময়ে বিয়ে করবেন, অন্য দশজন যুবক যে-রকম করে ভাবে, সে-রকম করেই হালকাভাবে ভেবেছিলেন হয়তো। কিন্তু পিতার সঙ্গে কথোপকথনে হঠাৎ করে যে কথাটি প্রথমে তাঁর মনে পড়ল, তা হলো দারিদ্র্য। পুরুষানুক্রমে অভাব-দীনতা তাঁদের সঙ্গী। দারিদ্র্যক্লান্ত জীবনে সৌন্দর্য আর ভালোবাসার যথার্থ বিকাশ হতে পারে না। সেই জায়গায় একজন নারীকে নিয়ে এসে তার


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনটা বিষণ্ন করে তোলার অধিকার তো দ্রোণের নেই। তাই তিনি পিতৃ-প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন।

পিতা ভরদ্বাজ তাঁকে গৃহী করবার জন্য অনুরোধ-উপরোধ করেছিলেন। তিনি বৃদ্ধ হয়েছিলেন। পুত্রের যৌবনলগ্নে পুত্রবধূর মুখ দেখে যেতে চেয়েছিলেন। হয়তো তাঁর অন্তর্চক্ষে পৌত্র বা পৌত্রীর কোমল মুখও আবছা ভেসে উঠেছিল। তৃতীয় পুরুষের মুখ দেখে বিপুল তৃপ্তি পাওয়ার বাসনা হয়তো তাঁর হৃদয়ে জাগরুক হয়েছিল। এজন্য পুত্র দ্রোণকে এত সাধাসাধি, এত অনুরোধ-উপরোধ। কিন্তু ভাগ্য বিপরীতে। দ্রোণ বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করলেন।

ভরদ্বাজের জীবৎকালে দ্রোণ বিয়ে করলেন না। হঠাৎ মারা গেলেন ভরদ্বাজ। পিতার মৃত্যুর জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন না দ্রোণ। তিনি মুষড়ে পড়লেন। পিতৃবিয়োগের ফলে তাঁর হৃদয়ে নিদারুণ শূন্যতা নেমে এল। বাবার কথাগুলোই বারবার মনে পড়তে লাগল তাঁর।

জননীকে তিনি কখনো চোখে দেখেন নি। মাতৃস্নেহ বলে যে একটা কথা আছে, তা থেকে বঞ্চিত তিনি। প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে পিতা ভরদ্বাজই তাঁর সবকিছু। সেই পিতাকেই কষ্ট দিয়েছেন—এ রকম চিন্তা তাঁকে অবসাদগ্রস্ত করল। তাঁর মনে গভীরভাবে বৈরাগ্যের সৃষ্টি হলো। বৈরাগ্যদীর্ণ হৃদয় তাঁকে পুনরায় তপস্যামুখী করে তুলল।

সাধনার জন্য পিতার আশ্রমের পরিবেশ অনুকূলে ছিল। অতঃপর সেই আশ্রমে বসেই দ্রোণ যোগ-ধ্যান-তপস্যায় মগ্ন হলেন। চঞ্চল মনকে স্থির করার সাধনা শুরু হলো। তপস্যা মনকে স্থির করে, একমুখী করে।

তপস্যার ঐকান্তিকতায় একটা সময়ে দ্রোণের মনের মালিন্য, অবসাদ এবং অনিষ্ট ভাবনা দূরীভূত হয়ে গেল। সবদিক ঠিক হলো বটে, কিন্তু মনের শূন্যতাটুকু গেল না। বিয়ে করার জন্য পিতার সানুনয় উপরোধ-বাক্য আবারও তাঁকে পীড়িত করতে শুরু করল। ধন-মান সম্পত্তির উচ্চচূড় অভিলাষ তাঁর কাছে অর্থহীন বলে মনে হাত লাগল। তিনি স্থির করলেন—বিয়ে করবেন। পিতার অনুরোধ এবং পিতৃঋণবোধ তাঁকে বিয়ে করার জন্য প্রণোদিত করল।

দার পরিগ্রহ করলেন দ্রোণ। কৃপের ভগ্নি কৃপীকে ভার্যারূপে গ্রহণ করলেন। মহর্ষি গৌতমের শরদ্বান নামে এক শিষ্য ছিলেন। জানপদী নামের এক অপ্সরাকে দেখে শরদ্বানের রেতঃপাত হয়। জন্ম নেন দুটো সন্তান—কৃপ আর কৃপী। পরিত্যক্ত এ দুটো শিশুকে কৃপা করে রাজা শান্তনু লালনপালনের মাধ্যমে বড় করলেন। এজন্য এঁদের নাম—কৃপ আর কৃপী। দ্রোণের দাবি ছিল, পাত্রীকে সুন্দরী হতে হবে এবং জ্ঞানী হতে হবে। কৃপী জ্ঞানী ছিলেন, রূপসি ছিলেন না। দুর্ভাগ্য দ্রোণের। পাত্রী জুটল এমন—সুন্দরী নন, কিন্তু পণ্ডিতা। কৃপীর আরেকটা অগুণ ছিল। তাঁর মস্তক ছিল কেশহীন।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার পরও কৃপীকেই বিয়ে করলেন দ্রোণ। তিনি ভাবলেন—স্ত্রীর রূপ যা-ই হোক, একটি ছেলে হবে আমার। স্ত্রীর অসৌন্দর্যের সান্ত্বনা হিসেবে তিনি তাঁর মহাপ্রাজ্ঞতা, ব্রতনিয়মনিষ্ঠা আর আচারপরায়ণতার কথাও ভাবলেন। সর্বোপরি ভাবলেন—বিয়ে করলে একটি ছেলে হবে, সেই ছেলে ঋষি ভরদ্বাজের অস্তিত্বকে অনাগতকালের দিকে প্রবহমান রাখবে।

বাবার কথায় এবং পুত্রলাভের লোভে লোভিত হয়ে দ্রোণ বিয়ে করলেন কৃপীকে। জনক-জননী পরিত্যক্ত অন্য এক ব্যক্তির কৃপা যে-নারীটির মধ্যে বর্তমান, তাঁকেই বিয়ে করলেন দ্রোণ। জন্মগৌরব আর লালিতপালিত হওয়ার আভিজাত্য—কোনোটাই ছিল না কৃপীর। পিতার সাময়িক রতিতৃপ্তির বিকারে দ্রোণের মতোই জন্ম তাঁর।

উভয়ের মধ্যে পার্থক্য অবশ্য আছে। দ্রোণ জননী পরিত্যক্ত শিশু হলে কী হবে, পিতা ভরদ্বাজ তাঁকে মানুষ করেছিলেন। কিন্তু কৃপী জনক ও জননী পরিত্যক্ত। সম্পর্কহীন একজন রাজার আশ্রয়ে বড় হয়ে ওঠা তাঁর। উভয়ের পিতার মধ্যে একটা বিষয়ে অদ্ভুত মিল। ভরদ্বাজ আর শরদ্বান—দু'জনেই অস্ত্রবিদ ও ধনুর্ধর।

ব্রাহ্মণ ঘরে জন্মাবার পরও বেদবিদ্যা ভুলে ধনুর্বেদ চর্চা করেন যাঁরা, তাঁরা ব্রাহ্মণ সমাজে মান্যতা পেতেন না তেমন। জপে-তপে-অধ্যয়নে মগ্ন ব্রাহ্মণরা অস্ত্রবিদ্যায় লগ্ন ব্রাহ্মণদের এড়িয়ে চলতেন। তাই দ্রোণ যখন বিয়ে করতে চাইলেন, ব্রাহ্মণসমাজ রাজি হলো না তাঁকে কন্যা দিতে। স্বধর্ম ও স্ববৃত্তি ত্যাগের কারণেই উপযুক্ত ব্রাহ্মণঘরের কোনো কন্যাকে দ্রোণ বিয়ে করতে পারলেন না। বিয়ে করতে হলো পালটি ঘরে, শরদ্বানকন্যাকে। শরদ্বান ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও দ্রোণের মতো বেদপাঠে রুচি দেখান নি, আগ্রহ দেখিয়েছেন ধনুর্বিদ্যায়। বৃত্তি ত্যাগের অপরাধে কুণ্ঠিত অল্পকেশিনী কৃপীকে বিয়ে করা ছাড়া দ্রোণের আর কোনো উপায় ছিল না।

অপছন্দের কন্যাকে বিয়ে করলে দাম্পত্যজীবন তো সুখেশান্তিতে ভরা থাকার কথা নয়। দ্রোণের জীবনও তা-ই ছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন বিচক্ষণ। ভেতরের অস্বস্তিকে তিনি কখনো টেনে বাইরে আনেন নি। নিজের মনোবেদনা ভেতরেই চেপে রেখেছিলেন।

কৃপী কিন্তু টের পেতেন। স্বামী যে তাঁকে তেমন করে ভালোবাসেন না—সেটা বুঝতে পারতেন তিনি। সেই বুঝতে পারার ব্যাপারটি একদিন স্পষ্ট করলেন স্বামীর সামনে, 'আর্যপুত্র, আপনি আমাকে ভালোবাসেন না।'

এই রকম কথা শুনবার জন্য দ্রোণ প্রস্তুত ছিলেন না। স্ত্রীর কথা শুনে চমকে তাঁর দিকে তাকালেন দ্রোণ। দেখলেন—কৃপী নিষ্পলক চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। অপ্রিয় অথচ সত্য কথার মুখোমুখি হলে মানুষ যেমন করে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে, দ্রোণেরও তা-ই হলো। বিব্রত চোখে কৃপীর দিকে তাকিয়ে থাকলেন শুধু।

শান্ত কণ্ঠে কৃপী আবার বললেন, 'সুন্দরী নই আমি আর্যপুত্র। একজন স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য একজন নারীর যে রূপলাবণ্য আর অঙ্গসৌষ্ঠব থাকার কথা, তার কোনোটাই নেই আমার, তাই আপনার চিত্তের সন্তোষ সাধনের উপযুক্ত নই আমি।'


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এসব কী বলছ তুমি কৃপী ? যথার্থ বলছ না তুমি।' দ্রোণের শেষ বাক্যে কণ্ঠটা একটু ধরা ধরা মনে হলো।

'মুখে যা-ই বলুন না কেন, ভেতরের অস্বস্তিকে লুকাতে শেখেন নি আপনি। প্রকৃত মানুষদের ক্ষেত্রে এরকমই হয়। মূর্খরা ভেতরের বিষাদকে ঢাকতে জানে, জ্ঞানীরা পারেন না। আপনি জ্ঞানী। তাই আমাকে বিয়ে করার মালিন্য আপনার চেহারায় স্পষ্ট হয়ে আছে।'

বহুক্ষণ মাথা নিচু করে থাকলেন দ্রোণ। বললেন, 'তুমি কৃতবিদ্য। বৈদিকজ্ঞান তোমার আয়ত্তে। পণ্ডিত তুমি। পাণ্ডিত্য তোমার মর্যাদা। তোমার মর্যাদা তোমার দেহরূপের অনেক উর্ধ্বে। আমি তোমার পাণ্ডিত্যকে তোমার দেহসৌন্দর্যের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান মনে করি।'

মৃদু হাসলেন কৃপী। তাঁর যা জানার জেনে গেলেন। অপ্রিয় কথা বাড়াতে নেই—পণ্ডিতরা ভালো করেই জানেন। কৃপীও এই অপ্রিয় প্রসঙ্গকে থামিয়ে দিলেন। বললেন, 'আমাকে ক্ষমা করবেন আর্যপুত্র। হঠাৎ মনে এল, বললাম। কিছু মনে করবেন না। দ্বিপ্রহর গড়িয়ে যাচ্ছে। চলুন, আহার করবেন।'

দ্রোণ অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'স্ত্রীর সৌন্দর্য আর মাধুর্য নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আমার অভীষ্ট একটা পুত্রসন্তান। কৃপী, তুমি আমাকে একটা পুত্র উপহার দাও।'

কৃপী হৃষ্ট চোখে স্বামী দ্রোণের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

দ্রোণের অভিলাষ পূর্ণ করলেন কৃপী। একটা পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। দ্রোণ-দম্পতি পুত্রের নাম রাখলেন অশ্বত্থামা। সন্তানের নাম রাখার ক্ষেত্রে মা-বাবা অথবা বয়োজ্যেষ্ঠ পরিজনের বাসনাই প্রধানত কাজ করে। অশ্বত্থামার নাম রাখার ক্ষেত্রে সেই প্রথা রক্ষিত হলো না। একটা ঘটনা পুত্রের নাম অশ্বত্থামা রাখার ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা পালন করল।

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর স্বাভাবিক মানবসন্তানের মতো কাঁদল না শিশুটি। কান্নার পরিবর্তে হ্রেষাধ্বনি বেরিয়ে এসেছিল শিশুটির মুখ থেকে। দেবাসুরের সমুদ্র-মন্থনজাত উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের ধ্বনি করেছিল সে। তাই দ্রোণ ছেলের নাম রাখলেন অশ্বত্থামা।

অশ্বত্থামাকে পেয়ে দ্রোণ অনন্ত বাৎসল্যের আস্বাদ পেলেন। এতদিন অরূপা স্ত্রীর কারণে মনের মধ্যে যে বেদনার কাঁটাটি খচখচ করছিল, মনোলোভা চেহারার অশ্বত্থামা দ্রোণের অন্তর থেকে তা দূর করে দিল। পুত্রকে নিয়ে তাঁর আনন্দের অন্ত থাকল না।

অল্প বয়স থেকে অশ্বত্থামার শরীর-স্বাস্থ্য সুন্দর হয়ে উঠল, প্রকাশ পেতে লাগল তার তেজ। এই বয়সে শারীরিক সুগঠনের জন্য দরকার উপযুক্ত খাদ্য আর যথাযথ লালন। পুত্রকে লালনের ব্যাপারে পিতা দ্রোণের কোনো ত্রুটি ছিল না। যে ব্যক্তি পুত্রলাভের আকাঙ্ক্ষায় বিয়ে করেছিলেন, তাঁর সমস্ত মন-প্রাণ তো লভ্য পুত্রের ওপর নিবিষ্ট থাকবেই। পুত্রকে যথাস্বাচ্ছন্দ্যে বড় করা শুরু করেছিলেন দ্রোণ।

কিন্তু অর্থকষ্ট পুত্রলালনের প্রধান অন্তরায় হয়ে দেখা দিল। আশ্রমে জীবনযাপনের জন্য কত আর অর্থ লাগে। পিতার আশ্রম সুখেরই ছিল। বসবাসের সমস্যা তাঁর ছিল না, কিন্তু


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাদ্যসমস্যা ছিল প্রকট। আশ্রমে যে শিষ্যরা ছিল, ভরদ্বাজের মৃত্যুর পর তারা একে একে আশ্রম ত্যাগ করল। গুরু না থাকলে শিষ্যরা থাকবে কেন ? গুরুর স্থানটা দ্রোণ নিতে পারতেন। কিন্তু যাগযজ্ঞ করা, শিষ্য পড়ানো—এসব যে দ্রোণের ভালো লাগে না। শিষ্যরা ভরদ্বাজ-আশ্রম ত্যাগ করলে খাদ্যাভাব প্রকট হয়ে দেখা দিল। শিষ্যদের শ্রমলব্ধ ভিক্ষান্নে আশ্রমের ভরণপোষণ হতো। শিষ্যহীন আশ্রম অন্নহীন হয়ে পড়ল।

কিন্তু দ্রোণ এই দারিদ্র্য কাটিয়ে উঠতে পারতেন, যদি যজনযাজন-অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় তিনি মন দিতেন। কিন্তু তাঁর মন তো পড়ে আছে ধনুর্বিদ্যায়। দ্রোণ যদি পৈতৃক বৃত্তি ত্যাগ না করতেন, তাহলে যাগযজ্ঞের দক্ষিণায় তাঁর সংসার চলত। কিন্তু তিনি কোনো যজমান তৈরি করেন নি। ফলে অর্থাগমের সকল পথ রুদ্ধ হয়ে গেল। পুত্রলাভের পর অর্থসংকট তীব্র হলো দ্রোণের পরিবারে।

তারপরও ব্রাহ্মণ্যবৃত্তিকে গ্রহণ করলেন না তিনি। বরং অস্ত্রবিদ্যায় কোনো অর্থলাভ ঘটে কি না, সেই চেষ্টায় ব্রতী হলেন দ্রোণ। অর্জিত ধনুর্বিদ্যা তিনি আরও ভালো করে অভ্যাস করতে লাগলেন।

দ্রোণের বাসস্থান পাঞ্চালরাজ্যের রাজধানীর অদূরে। রাজধানী এবং রাজধানীর আশপাশে ধনবানের বসবাস। সেই সূত্রে বালক অশ্বত্থামার সঙ্গে ধনীর দুলালদের চেনা-পরিচয়। ধনীদের গৃহাভ্যন্তরের নানা রীতিনীতি অশ্বত্থামা জানতে শুরু করল। ধনীর দুলালদের খাদ্য-উপাদান, খাওয়ার পদ্ধতি—এসব অশ্বত্থামার অজানা থাকল না। সে দেখল—ধনীপুত্রদের খাদ্য লোভনীয়।

তাকে সবচাইতে বেশি আকৃষ্ট করল গাভীদুগ্ধ। সে জানল, বড়লোকের ঘরের ছেলেরা নিয়মিত দুগ্ধ পান করে। অশ্বত্থামার দুধ খাওয়ার খুব ইচ্ছে জাগল, কিন্তু বয়সে ছোট হলেও সে বুঝতে শিখেছে, বাবা তেমন অর্থবান নন। একটা গাভী জোগাড় করার ক্ষমতা তার বাবার নেই। বালক অশ্বত্থামার মনে কষ্ট জমা হতে থাকে। কিন্তু একজন বালকের পক্ষে না-পাওয়ার কষ্ট কতদিনই বা চেপে রাখা সম্ভব!

একদিন পিতা-মাতার কাছে দুধ খাওয়ার বায়না আরম্ভ করল অশ্বত্থামা। কিন্তু স্বাভাবিক কারণে দুধ জুটল না। ফলে বালক অশ্বত্থামা কেঁদে বুক ভাসাল। পুত্রের কান্না দ্রোণের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করল। মানসিক যন্ত্রণায় তিনি অধীর হয়ে উঠলেন।

পুত্রের জন্য একটা দুগ্ধবতী গাভী জোগাড়ে বের হলেন দ্রোণ। পাঞ্চালরাজ্যের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত তিনি অনেক ঘুরলেন। কিন্তু কেউ ভরদ্বাজ-সন্তান দ্রোণকে একটা গাভী দান করল না। অশেষ মানসিক ক্লেশ নিয়ে তিনি আশ্রমের দিকে রওনা দিলেন। ফেরার পথে একটা ঘটনা তাঁকে ভেঙেচুরে একেবারে দুমড়ে দিল।

সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়েছে। তেজ কমে এসেছে, শীতের শেষদিক। মাঠের ধারে নানা বয়সের বালকরা জমা হয়েছে। এদের কেউ কেউ খেলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। দ্রোণ ফিরতে ফিরতে মাঠের একেবারে কিনারা ঘেঁষে বালকদের একটা জটলা দেখলেন। উৎসুক দ্রোণ এগিয়ে গেলেন সেদিকে। নিকটে গেলে জটলার মধ্যিখানে ধেই ধেই নৃত্যরত অশ্বত্থামাকে


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখতে পেলেন তিনি। পুত্রকে দু'বাহু তুলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে নাচতে দেখে বিস্মিত হলেন দ্রোণ। আরও কাছে এগিয়ে গেলেন তিনি। শুনলেন—অশ্বত্থামা নাচতে নাচতে বলছে—দুধ খেয়েছি, দুধ খেয়েছি! কী স্বাদ! কী স্বাদ! দেখলেন—অশ্বত্থামার এই উদ্বাহু নৃত্য আর আত্মহারা আনন্দধ্বনি শুনে ধনীপুত্ররা হাততালি দিয়ে তাকে উপহাস করছে। ওখানেই তারা থেমে নেই। উপহাসের ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তারা বলছে, 'অশ্বত্থামা, তোর বাপ গরিব। টাকাপয়সা আয়ের ক্ষমতা নেই তোর বাপের। তাই পিটুলিগোলা সাদা জল খেয়ে নাচছিস তুই।'

আনন্দে মশগুল বলে অশ্বত্থামা ধনীর দুলালদের উপহাসধ্বনি শুনতে পেল না। কিন্তু দ্রোণ শুনতে পেলেন।

দুধের কথা শুনে শুনে অশ্বত্থামার মধ্যে একটা ঘোর তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সুযোগ পেলেই খেলার সঙ্গীদের সামনে সে দুধের প্রসঙ্গ তুলত। সঙ্গীরা তাকে নাচাবার জন্য দুগ্ধ বিষয়ে নানা অলীক শ্রুতিরোচক গল্প শোনাত। তাদের মিথ্যে গল্পকে সত্য বলে মনে করত অশ্বত্থামা। এইভাবে দুধ খাওয়ার জন্য প্রচণ্ড একটা আগ্রহ অশ্বত্থামার মধ্যে দানা বাঁধল। এই সুযোগটাই নিল খেলার সাথিরা। পিটুলিগোলা ফেনায়মান সাদা জলের পাত্রকে দুধের পাত্র বলে অশ্বত্থামার সামনে ধরল। অশ্বত্থামা তো বিহ্বল। এত ভালোবাসে ধনীপুত্ররা তাকে! সে ওদের প্রতারণা বুঝতে পারল না, উপহাস বুঝতে পারল না। এক ঝটকায় পাত্রটা হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে খেতে শুরু করল অশ্বত্থামা। উল্লসিত অশ্বত্থামা তৃপ্তির আনন্দে নাচতে শুরু করল। ওই সময় সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন দ্রোণ।

দুঃখে-অপমানে বিচূর্ণ হতে হতে ছেলের হাত ধরে আশ্রমে ফিরেছিলেন দ্রোণ। অশ্বত্থামাকে কৃপীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিলেন। আকুল হয়ে কেঁদে বুক ভাসিয়েছিলেন দ্রোণ। নিজেকে বড় ব্যর্থ পিতা বলে মনে হয়েছিল তাঁর।

দ্রোণ তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিলেন—এই আশ্রমে আর না, এই জীর্ণ কুটিরে দীন জীবনযাপন আর না। অভাব ঘুচাতে হবে, স্বাচ্ছন্দ্য আনতে হবে দৈনন্দিন যাপিতজীবনে।

তিনি ঠিক করলেন—পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের কাছে যাবেন তিনি। দ্রুপদ যে তাঁর প্রিয় সখা, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সহপাঠী।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সখায়ং বিদ্ধি মামিতি।
আমি তোমার বন্ধু। মনে নেই আমাকে ?

এবার দ্রোণের অভীষ্ট লাভ হবে।

গৃহ থেকে অন্নাভাবের হাহাকার দূর হবে, মাথার ওপর একটা নিশ্ছিদ্র চালা থাকবে। কৃপীর গায়ে নতুন বস্ত্র শোভা পাবে। পুত্র অশ্বত্থামা ধনীপুত্রের মতো পোশাক পরে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াবে। সর্বোপরি তাঁর গোয়াল থাকবে। দুগ্ধবতী গাভীরা সেই গোশালায় বাঁধা থাকবে। সকাল-সন্ধ্যা পাত্র পাত্র দুগ্ধ দোহন হবে। প্রতিদিন বারবার অনেকবার দুগ্ধ পান করবে অশ্বত্থামা। দুগ্ধ দিয়ে ছানা হবে, ঘৃত হবে, ক্ষীর হবে। হবে নানা রকম মিষ্টি। মিষ্টান্ন তৈরি করবেন কৃপী। সেখানে পর্যাপ্ত শর্করা মিশাবেন, বাদাম মিশাবেন। মুখের সামনে সেই মিষ্টান্ন এগিয়ে ধরে বলবেন, 'খান আর্যপুত্র। আমি একটু দু'চোখ ভরে দেখি।' খেতে খেতে দ্রোণ জিজ্ঞেস করবেন, 'অশ্বত্থামা খেয়েছে তো?' উত্তরে কৃপী বলবেন, 'কী আর বলব আর্যপুত্র, দুধের জন্য যে অশ্বত্থামা একদা হা-পিত্যেশ করত, এখন সেই অশ্বত্থামা দুধ খেতে চায় না। বলে, দুধ খেতে ভালো লাগে না, মা।' শুনে হা হা করে অট্টহাস্য করে উঠবেন তিনি।

'এ রকম করে উচ্চহাস্য করলেন যে, আর্যপুত্র ?' স্বামীর অট্টহাস্য শুনে পাশে চলমান কৃপী জিজ্ঞেস করলেন।

দ্রোণ সংবিতে ফিরলেন। একটু লজ্জা পেলেন তিনি। মনে মনেই ভাবছিলেন কথাগুলো। হাসিটা হঠাৎ কেন যে ভেতর থেকে এ রকম করে বেরিয়ে এল!

স্ত্রীর প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'না না, তেমন কিছু নয়। হঠাৎ করেই হাসিটা বেরিয়ে এল। এমনি এমনি। এই হাসির কোনো কারণ নেই।'

মুখে বললেন বটে, কিন্তু ভেতরের স্ফূর্তিকে লুকাতে পারলেন না দ্রোণ। ভেতরের উল্লাস তাঁর চোখেমুখে ছড়ানো।

কৃপী আর কথা বাড়ালেন না। চলার গতি বাড়িয়ে দিলেন। এর মধ্যে আর্যপুত্র বেশকিছু দূর এগিয়ে গেছেন। অশ্বত্থামাকে ডান হাতে ধরে সামনের দিকে দ্রুত এগোতে লাগলেন কৃপী।

রাজা পৃষতের মৃত্যু হয়েছে। পৃষতের পূর্ব নাম বাজ্জসেন। যেদিন তাঁর রাজ্যাভিষেক হয়, পিতা তাঁর কপালে চন্দনের পৃষত এঁকে দিয়ে সর্বতো মঙ্গল কামনা করেছিলেন। পৃষত মানে


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফোঁটাচিহ্ন। রাজ্যাভিষেকের দিন থেকে বাজ্জসেনের নাম পাল্টে গিয়েছিল। প্রজা-অমাত্যরা তাঁকে পৃষত নামে সম্বোধন করা শুরু করলেন।

পৃষত খ্যাতিমান নৃপতি ছিলেন। প্রজামঙ্গলের চেষ্টায় সর্বদা রত থাকতেন তিনি। পৃষতের রাজ্যের সর্বত্র উন্নতির চিহ্ন। তাঁরই পুত্র দ্রুপদ। দ্রোণের বাল্যবন্ধু। প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সুহৃদ। রাজা পৃষতের পরলোকগমনের পর পাঞ্চালরাজ্যের রাজা হয়েছেন দ্রুপদ। লোকপরম্পরায় এ সংবাদ শুনতে পেয়েছেন দ্রোণ। তাঁর আনন্দ আর ধরে না। যাঁর মিত্র নৃপতি হয়েছেন, তাঁর আবার দারিদ্র্য কী ?

এক নিমেষেই অভাব-অনটন উড়ে যাবে। দ্রোণের সামনে দাঁড়িয়ে দ্রুপদ কথা দিয়েছিলেন—রাজা হলেই তাঁর রাজ্য দ্রোণেরও ভোগ্য হবে।

এক বিকেলে তাঁর চতুর্পার্শ্বের ঘরবাড়ি, বৃক্ষতল, উঠান, আসন-বসন, রান্নার উপকরণ, এমনকি নিজের ও স্ত্রী-পুত্রের পোশাক-আশাক বড় জীর্ণ মনে হতে লাগল দ্রোণের। এই জীর্ণ-দীন অবস্থা থেকে যত তাড়াতাড়ি মুক্ত হওয়া যায়, ততই ভালো। তিনি মন স্থির করলেন—পরদিন প্রত্যুষেই সপরিবারে আশ্রম ত্যাগ করবেন। চলে যাবেন দ্রুপদরাজ্যের রাজধানীতে। দ্রুপদের সামনে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে বলবেন, 'বন্ধু, সুহৃদ আমার। কেমন আছ তুমি ?'

পরদিন অতি ভোরে রাজধানীর উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন দ্রোণ। যেতে যেতে ভাবছিলেন ওসব কথা। কৃপীর প্রশ্নে সেই ভাবনার জাল ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। কিছু একটা বলে বুঝ দিয়েছিলেন কৃপীকে। কিন্তু ভেতরের উচ্চাশা অন্যের সামনে প্রকাশিত হয়ে যাওয়ায় লজ্জা পেতেও শুরু করেছিলেন দ্রোণ। স্ত্রীর সামনে থেকে মুখ লুকাবার জন্য চলার গতি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

AMARBOI.COM

রাজপ্রাসাদের দৌবারিক পথ আটকে দিল।

'কে আপনি ? এই অসময়ে মহারাজাধিরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইছেন ?' দ্রোণের মলিন বসনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে জিজ্ঞেস করল দ্বারপাল।

অবহেলার হাসি হেসে দ্রোণ বললেন, 'আমার পরিচয় তোমায় দিতে হবে ? পরিচয় শনাক্ত করেই ঢুকতে দেবে আমাদের ? আমাকে সাক্ষাৎ দিতে দ্রুপদের আবার সময়-অসময় কী ?'

একনাগাড়ে প্রশ্নগুলো করে গেলেন দ্রোণ। দৌবারিকের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করলেন না। উপরন্তু দ্বারপালকে প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত করলেন।

দীনবেশী দ্রোণের উদ্ধত বাক্য শুনে দৌবারিক প্রথমে বিস্মিত হলো। বিস্ময় কেটে গেলে তার মনে ক্রোধ জন্মাল। ক্রোধান্বিত চোখে সে বলল, 'আপনার সাহস তো কম নয় ব্রাহ্মণ ? নিজের বসনভূষণের দিকে লক্ষ করেছেন ? সঙ্গের জনেরা বোধহয় স্ত্রী আর পুত্র। ওঁদের দেখে তো মনে হচ্ছে দীর্ঘদিন অনাহারে আছেন তাঁরা। আপনাকে দেখে অতি


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাধারণ একজন দরিদ্র হীন ব্রাহ্মণ বলে মনে হচ্ছে। তবে আপনি যে বিদ্বান—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মাননীয় নরপতিকে কীভাবে সম্বোধন করতে হয়, বিদ্বানের না জানার কথা নয়। কিন্তু আপনি আমাদের নরপতিকে শুধু দ্রুপদ বলে সম্বোধন করলেন। আপনার অর্জিত বিদ্যাতেও আমার সন্দেহ হচ্ছে।' দম নেওয়ার জন্য থামল দৌবারিক।

দৌবারিকের কথা শুনে অপমানে ভেতরটা জ্বলে গেল দ্রোণের। ইচ্ছে হলো—ধনুকে তীর জুড়ে দৌবারিকের মস্তকটা উড়িয়ে দিতে। কিন্তু নিজেকে অতি কষ্টে দমন করলেন তিনি। তাঁর উদ্দেশ্য তো মিত্র দ্রুপদের সঙ্গে মিলিত হওয়া। আগে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হোক, তারপর এই মূর্খ দৌবারিককে শায়েস্তা করা যাবে, অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া যাবে।

শান্তকণ্ঠে দ্রোণ বললেন, 'একসময় মহারাজ দ্রুপদ আর আমি সতীর্থ ছিলাম। অস্ত্রশিক্ষা করেছি একই গুরুর কাছে। বহু বছর পর মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছি। তুমি ভাই তার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগটা দাও আমাদের।'

দ্রোণের নরম কথা শুনে দৌবারিক নমনীয় হলো। উপরন্তু দ্রোণের কাঁধে তীরভর্তি তূণ আর ধনুক দেখে আগন্তুকের কথা তার বিশ্বাস্য বলে বোধ হলো। সে শুনেছে—তাদের মহারাজ বাল্যকালে ঋষি অগ্নিবেশ্যের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিখেছিলেন। আগন্তুকের কথা সত্য হলেও হতে পারে।

দৌবারিক বলল, 'ঠিক আছে। মহারাজ এখন বিচারকার্যে ব্যস্ত। তাঁর ব্যস্ততা কমলে সামনে যাবেন। রাজসভার বাইরে অপেক্ষাগৃহ আছে। সেখানে অপেক্ষা করবেন। সেখানে প্রহরী আছে। তাকে আপনি আপনার সাক্ষাৎ-প্রার্থনার কথা জানিয়ে রাখবেন। সময়মতো সে আপনাকে রাজসভায় পৌঁছে দেবে।'

'তোমার মঙ্গল হোক বৎস।' ডান হাত তুলে দ্রোণ বললেন।

কৃপী আর অশ্বত্থামা দ্রোণকে অনুসরণ করে প্রাসাদাভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন।

'সখা। কেমন আছ তুমি ? কুশলে আছ তো ?' বিপুল আবেগ ঝরে পড়ছে দ্রোণের কথায়। প্রহরী দ্রোণকে সপরিবারে রাজসভায় নিয়ে এলে উচ্চ সিংহাসনে বাল্যবন্ধু দ্রুপদকে আসীন দেখে সবিশেষ উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন দ্রোণ।

'কে সখা! ব্রাহ্মণ, তুমি কাকে সখা বলে সম্বোধন করছ ?' বরফশীতল কণ্ঠে বললেন মহারাজ দ্রুপদ।

'কী আশ্চর্য! তোমার মনে নেই আমাকে ? আমি দ্রোণ।'

'কোন দ্রোণ ? তোমার সঙ্গে কি আগে আমার কখনো দেখা হয়েছে ?'

'ছোটবেলার রসিকতা দেখি তুমি এখনো ভুলতে পারো নি দ্রুপদ। রাজা হওয়ার পরও তোমার হাস্য-পরিহাসবোধ অটুট রয়ে গেছে।' হাসতে হাসতে হালকা চালে বলে গেলেন দ্রোণ।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্রুপদ সারা মুখে রাজাসুলভ গাম্ভীর্য ছড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আমি তোমাকে চিনতে পারছি না ব্রাহ্মণ। কোন কালে আমাদের দু'জনের মধ্যে পরিচয় ছিল, তাও আমার মনে পড়ছে না।'

এবার হা হা করে হেসে উঠলেন দ্রোণ। বললেন, 'আর হেঁয়ালি কোরো না দ্রুপদ। অনেকদূর পথ অতিক্রম করে এসেছি। আমার মতো আমার পুত্র-পরিবারও ক্লান্ত সখা। আমি সেই দ্রোণ, যার সঙ্গে তুমি ঋষি অগ্নিবেশ্যের কাছে অস্ত্রশিক্ষা গ্রহণ করেছিলে।' হাসতে হাসতে দু'বাহু সামনের দিকে প্রসারিত করে সিংহাসনের দিকে এগিয়ে গেলেন দ্রোণ।

'থামো ব্রাহ্মণ। আর এগোবে না। যেখানে আছ সেখানেই দণ্ডায়মান থাক।' তারপর সভাসদদের দিকে তাকালেন দ্রুপদ। দেখলেন—সবার চোখেমুখে অপার জিজ্ঞাসা। বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে সভাসদরা তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন।

এই সময় দ্রোণ আবার বললেন, 'আমি তোমার বন্ধু বটে, মনে নেই আমাকে ?'

দ্রুপদ রুষ্টকণ্ঠে বললেন, 'ব্রাহ্মণ, তুমি শিক্ষাদীক্ষা ভালোভাবে অর্জন করতে পারো নি। তাই তোমার বুদ্ধি পরিপক্ব হয় নি। কোন দেশে কোন রীতি, কোন সমাজে কী রকম ব্যবহার করতে হয় তাও তুমি শেখ নি ব্রাহ্মণ।' দ্রোণকে চিনেও না চেনার ভান করলেন দ্রুপদ।

একসময় যে দ্রুপদ অবিমিশ্র বন্ধুত্বের কথা অনর্গল বলতেন, কত প্রতিজ্ঞা, কত আশ্বাস এবং কত কথামালা রচনা করেছেন দ্রোণের জন্য, তা আজ দিব্যি অস্বীকার করলেন।

এ রকমই হয় এই পৃথিবীতে। দীর্ঘদিনের অদেখায় পুরাতন বন্ধুত্ব আর সজীব থাকে না। যে বন্ধুত্ব একদা সত্য ছিল, আন্তরিক ছিল, কালের ধুলায় মলিন হয়ে সেই সজীব সত্যলগ্ন বন্ধুত্ব একেবারে অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। বাল্যকালের আবেগ পরিণত বয়সে এসে ফিকে হয়ে যায়। তাৎক্ষণিক বাস্তবতা সামনে এসে দাঁড়ায়।

দ্রোণ প্রকাশ্য রাজসভায় যখন দ্রুপদকে 'সখা' বলে সম্বোধন করলেন, দ্রুপদের মধ্যে তখন রাজকীয় সত্তা জেগে উঠল। তিনি দরিদ্র দ্রোণকে একেবারে আমলে নিলেন না। চোখেমুখে উপহাস ছড়িয়ে কুৎসিতভাবে হেসে উঠলেন দ্রুপদ। তাঁর দেখাদেখি সভায় উপস্থিত সবাই অট্টহাস্য করে উঠল।

দ্রুপদের প্রকৃত অভিপ্রায় এতক্ষণে অনুধাবন করতে পারলেন দ্রোণ। তিনি এক নিশ্ছিদ্র গভীর আঁধারে ডুবে যেতে লাগলেন। রাজসভার প্রদীপের উজ্জ্বল আলো তাঁর চোখের সামনে নিবে আসতে লাগল। কৃপীর ম্লান মুখ, অশ্বত্থামার ক্লান্ত-ক্ষুধার্ত চেহারা তাঁর দৃষ্টি থেকে হারিয়ে যেতে লাগল।

এই সময় দ্রুপদের কর্কশ কণ্ঠ দ্রোণের কানে আবার ভেসে এল, 'দরিদ্র ব্রাহ্মণ, তুমি আমাকে সখা সম্বোধন করে তৃপ্তি পেতে চাইছ ? আমার মনে পড়ছে না, তারপরও তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব যদি হয়েও থাকে, তা অস্বীকার করছি আমি। শোনো, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ জীর্ণ-জড় হয়ে পড়ে, সময়ান্তরে পুরাতন বন্ধুত্বও তেমনি জীর্ণ হয়ে যায়। তোমার-আমার বন্ধুত্ব ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গেছে এখন।'


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্রোণ দু'পাশে মাথা ঝাঁকিয়ে নিজেকে স্থির করলেন। স্তম্ভিত চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন দ্রুপদের দিকে। তারপর দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'গুরুদেব অগ্নিবেশ্যের আশ্রম, প্রতিশ্রুতি—সবই ভুলে গেলে তুমি দ্রুপদ ? সবই বিস্মৃত হলে সখা ?'

'একদিন তোমার সঙ্গে আমার একসঙ্গে থাকা হয়েছে ঋষি অগ্নিবেশ্যের আশ্রমে মানলাম।' দ্রুপদ এবার স্পষ্ট করলেন সবকিছু। বললেন, 'ওই সময় আমাদের দু'জনের উদ্দেশ্য আর অবস্থান এক ছিল। উদ্দেশ্য ছিল—অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা এবং অবস্থান ছিল তপাশ্রম। এখন তোমার উদ্দেশ্য আর আমার লক্ষ্য এক নয়। তুমি কৃপাপ্রার্থী আর আমি দাতা। আর দু'জনের অবস্থান দেখো—আমি রাজসিংহাসনে। আর তুমি ? তুমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছ দেখ।'

'তুমি আমাকে অপমান করছ সখা ?' দ্রোণ মার্জিত কণ্ঠে বললেন।

দ্রোণের কথা যেন কানে যায় নি দ্রুপদের। আগের মেজাজে বললেন, 'তুমি নির্বোধ দ্রোণ। তুমি বারবার আমাকে সখা সম্বোধন করে গৌরবান্বিত হতে চাইছ। তুমি তো জানো—গরিব কখনো ঐশ্বর্যশালীর সখা হতে পারে না, মূর্খ কখনো পণ্ডিতের সখা হয় না, বলহীন কখনো বীরের সখা হয় না।'

দ্রোণ এসব অপমান নীরবে হজম করলেন। যে-কোনো উপায়ে দারিদ্র্য ঘোচাতে হবে তাঁকে। যাযাবর জীবনের অবসান ঘটিয়ে এই রাজধানীর যে-কোনো একটা কোণে থিতু হতে হবে। তাই দ্রুপদের সকল উপহাস-অপমানকে একপাশে সরিয়ে রেখে দ্রোণ বললেন, 'প্রতিশ্রুতি! প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলে যে আমার সামনে।'

'কোন প্রতিজ্ঞা ? কীসের প্রতিশ্রুতি ?' দ্রুপদ অবহেলায় জিজ্ঞেস করলেন।

উৎকণ্ঠাভরা কণ্ঠে দ্রোণ বললেন, 'তুমি বলেছিলে—রাজা হওয়ার পর তোমার যে রাজকীয় ভোগ আর যে ধনসম্পদ লাভ করবে তুমি, তা আমারও ভোগ্য হবে। তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা কোরো দ্রুপদ।'

রাজা নয়, মহাধিপতি নয়, নৃপতি নয়, একেবারে দ্রুপদ বলে সম্বোধন! কী আশ্চর্য! মলিন বসন পরিহিত, জীর্ণপ্রায় দেহের এই ব্রাহ্মণের দুঃসাহস তো কম নয়! সম্বোধনের কথা না হয় বাদ দেওয়া যাক, রাজভাগ্যের অধিকার চেয়ে বসল! ক্রোধে দ্রুপদের মাথা ঘূর্ণিত হতে লাগল। দ্রোণকে কী বলবেন—ঠিক করতে পারছেন না তিনি। ব্রাহ্মণ হয়ে কাল হয়েছে। ব্রাহ্মণ না হয়ে অন্য কেউ হলে যমালয়ে পাঠাতেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ হত্যা যে মহাপাপ।

'শুধু রাজৈশ্বর্যের অর্ধেক নয়, রাজ্যেরও অর্ধেক আমাকে দেওয়ার সংকল্প করেছিলে দ্রুপদ।'

দ্রোণের কথায় দ্রুপদের মুখে যেন হলাহল পড়ল। ঘূর্ণিত চোখে বললেন, 'রাজ্যপাটের অর্ধেক ? তোমাকে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আমি ?'

'হ্যাঁ, করেছিলে। সেই গুরুগৃহে, এক অপরাহ্নে আমার গলা জড়িয়ে ধরে তুমি বলেছিলে—অহং প্রিয়তমঃ পুত্র পিতু-দ্রোণ মহাত্মনঃ। সেই বিকেলে তুমি আরও বলেছিলে—


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি নিশ্চিন্ত থাকো দ্রোণ—তদ্‌ভোগ্যং ভবিতা রাজ্যং সখে সত্যেন তে শপে। আজকের সিংহাসনে আসীন এই তুমি দ্রুপদই তো বলেছিলে—যেদিন আমি রাজ্যে অভিষিক্ত হব, সেদিন থেকে আমার মতো আমার রাজ্য তোমারও ভোগ্য হবে। আজ আমি এসেছি তোমার কাছে। তোমার কাছ থেকে আমার অধিকার আদায় করতে।'

'অধিকার! কোন অধিকার আদায়ের কথা বলছ তুমি দ্রোণ ?' দ্রুপদের অক্ষিগোলক বেরিয়ে আসতে চাইছে।

'প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে যে অধিকার তুমি আমাকে দিয়েছিলে। একদা রাজ্যাধিকার দিয়েছিলে তুমি আমায়।' দ্রোণের কণ্ঠ থেকে নমনীয় ভাব তিরোহিত হয়ে গেল।

দ্রোণ বুঝে গেছেন—দ্রুপদ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন না। তাঁর ভেতরে বিস্মৃতি, অকৃতজ্ঞতা আর অহংকার উৎকট হয়ে উঠেছে। নমনীয় বাক্যে বা অনুরোধ-উপরোধে তাঁকে টলানো যাবে না। তাই দ্রোণ প্রতিশ্রুত অধিকারের কথা উচ্চারণ করলেন।

এতে দ্রুপদের ক্রোধ বেড়ে গেল। তীব্র ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললেন, 'রাজসভায় উন্মাদের জায়গা নেই। সভাস্থলে ব্রাহ্মণকে অপমান করাও উচিত নয়। তাই আমার ক্রোধানল থেকে রেহাই পাচ্ছ তুমি। তুমি এখনই সভাস্থল ত্যাগ কোরো। নইলে...।'

'নইলে কী করবে তুমি ? বধ করবে আমায় ? কারাগারে নিক্ষেপ করবে ? এত সাহস তোমার ?' দ্রোণ গর্জে উঠলেন।

দ্রুপদ অমার্জিত কণ্ঠে বললেন, 'তোমার মতো দীনদরিদ্র দু'কড়ির ব্রাহ্মণকে এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারি আমি। ভাগ্যিস, তোমার সঙ্গে তোমার ভার্যা আর পুত্র ছিল। ওদের সামনে তোমাকে অপদস্থ করতে চাই না। তা ছাড়া এই দ্রুপদরাজ্যের একটা মর্যাদা আছে। তোমাকে অপমান করে আমি সেই মর্যাদা ক্ষুণ্ন করতে চাই না। শিগগির তুমি আমার সামনে থেকে দূর হও।'

ধনসম্পদের অধিকার চাইলে, হয়তো তা দিতেন দ্রুপদ। কিন্তু রাজ্যাধিকার চেয়ে বসলেন দ্রোণ! দ্রোণও প্রথমে সামান্য প্রাপ্তির আশায় এসেছিলেন পাঞ্চাল রাজসভায়। তাঁর মতো জ্ঞানবানরা জানতেন—রাজা-রাজপুত্ররা আবেগের বশে কত কিছুই না বলেন! বাস্তবে যে তা তাঁরা সচেতন বা অসচেতনভাবে ভুলে যান, তাও দ্রোণের অভিজ্ঞতার বাইরে ছিল না। তাই সামান্যতেই তৃপ্তি পেতে চেয়েছিলেন তিনি। যেটুকু পেলে সংসারের অভাব দূর হবে, দু'বেলা দু'মুঠো স্ত্রী-পুত্র আর নিজের মুখে তুলে দিতে পারবেন, সেটুকু পাওয়ার বাসনা নিয়েই দ্রুপদের কাছে এসেছিলেন দ্রোণ। কিন্তু দ্রুপদ প্রথম থেকেই তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার শুরু করলেন। এতদিনের প্রগাঢ় বন্ধুত্বকে অস্বীকার করলেন। উঁচু-নিচুর কথা তুলে তিরস্কার করলেন তাঁকে। তাও আবার একান্তে নয়। ভরা রাজসভায় স্ত্রী এবং পুত্রের সামনে তাঁকে একেবারে বিধ্বস্ত করে দিলেন।

ব্রাহ্মণত্ব জেগে উঠেছিল দ্রোণের। তাঁর অহংবোধ এবং আমিত্ব তীব্রভাবে জ্বলে উঠেছিল। তাই তিনি রাজ্যাধিকার চেয়ে বসলেন। এতে দ্রুপদ আরও ক্রোধান্বিত হয়ে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠলেন। এবং দ্রোণকে তাঁর রাজসভা ছেড়ে, তাঁর রাজ্য ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে নির্দেশ দিলেন দ্রুপদ। বললেন, তোমার বিপদ হবে দ্রোণ, যদি কালবিলম্ব না করে আমার সামনে থেকে চলে না যাও।

দ্রোণ নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। স্থিরদৃষ্টিতে দ্রুপদের দিকে দৃকপাত করলেন। তারপর চোখ ফেরালেন কৃপীর দিকে। দেখলেন—কৃপীর দু'চোখ বেয়ে অশ্রুধারা নামছে। নীরবে কেঁদে যাচ্ছেন তিনি। অকৃতবিদ্যদের মতো চিৎকার করে আকুল হয়ে কাঁদছেন না তিনি। কৃতবিদ্যের মতো নীরবে অশ্রুবিসর্জন করে বুক ভাসাচ্ছেন।

এবার অশ্বত্থামার দিকে তাকালেন দ্রোণ। থরথর করে কাঁপছে অশ্বত্থামা। মায়ের বাম হাত চেপে ধরে নিস্পলক চোখে দ্রুপদের দিকে তাকিয়ে আছে যুবকপ্রায় অশ্বত্থামা। সমস্ত মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে তার। ফলে গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল সাদাটে হয়ে গেছে। কপালে স্বেদবিন্দু। তার চোখ থেকে অগ্নি ঝরছে যেন। মায়ের কান্নায় সংক্রমিত হয় নি অশ্বত্থামা। তার চোখে-চেহারায় ক্রোধানল ছড়িয়ে আছে। এখনই ঝাঁপিয়ে পড়বে দ্রুপদের ওপর—এ রকমই অভিব্যক্তি তার।

অশ্বত্থামা দ্বারা প্রভাবিত হলেন দ্রোণ। রোষে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। বললেন, 'শুধু তোমার রাজসভা থেকে নয়, এই রাজধানী থেকে, এই পাঞ্চালরাজ্য থেকে আমি চলে যাব। কিন্তু যাওয়ার আগে...।'

দ্রোণের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে দ্রুপদ বললেন, 'হ্যাঁ তা-ই যাও। সেটাই তোমার জন্য মঙ্গল। আর হ্যাঁ দ্রোণ, অনেক কষ্ট করে বহু পথ অতিক্রম করে তুমি আমার কাছে এসেছ। তোমাকে তো খালি হাতে ফেরানো যায় না।'

একটু থামলেন দ্রুপদ। দ্রোণের চোখে চোখ রেখে বললেন, 'তুমি যখন প্রার্থী হয়ে এসেছ, একরাত্রির উপযুক্ত ভোজনদ্রব্য নিয়ে যাও। ওইটুকুতেই তৃপ্ত থাকতে হবে তোমাকে। এর চেয়ে বেশি ভিক্ষা চাইলে ওই ভোজনদ্রব্যটুকুও পাবে না তুমি।'

কোটর থেকে মণি দুটো বেরিয়ে আসতে চাইছে দ্রোণের। তিনি কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেললেন। থরথর করে কাঁপতে লাগলেন তিনি। বহুক্ষণ পরে আত্মস্থ হলেন। বজ্রকণ্ঠে বললেন, 'তুমি এই অপমানের ফল ভোগ করবে শিগগির। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের শাস্তি যে কী ভয়ংকর হতে পারে, হাড়ে হাড়ে টের পাবে তুমি।'

'কী করবে তুমি আমার ? শৃগাল হয়ে ব্যাঘ্রকে ভয় দেখাচ্ছ ?' দ্রুপদ জিজ্ঞেস করলেন।

'না, সমুদ্র হয়ে ক্ষুদ্র জলাশয়কে ভাসিয়ে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করছি। হুতাসন হয়ে সবকিছু পুড়িয়ে দেওয়ার পণ করছি।' তারপর উচ্চকণ্ঠে বললেন দ্রোণ, 'তোমার রাজসভায়, তোমারই মন্ত্রী-রাজন্যদের সামনে প্রতিজ্ঞা করছি—আমি তোমার রাজধানী ধ্বংস করব। তোমাকে বন্দি করে আমার এই পাদুকার নিচে নিক্ষেপ করব। তোমার রাজ্য কেড়ে নিয়ে পথের ভিখারি করে ছাড়ব তোমায়।' বলে পেছন ফিরলেন দ্রোণ। স্ত্রী-পুত্রের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেছন থেকে দ্রুপদের অট্টহাস্য শুনতে পেলেন দ্রোণ। তিনি শুনতে পেলেন দ্রুপদের কণ্ঠ, 'হীন নিরন্ন ব্রাহ্মণের সামর্থ্য কতটুকু আমি জানি। যজমানি করে যার দিনাতিপাত হয়, সে দেখাচ্ছে ভয়! ফুঃ!'

এবার ঘাড় ঘোরালেন দ্রোণ। কাঁধ থেকে ধনুকটা ডান হাতে নিয়ে বললেন, 'এই ধনুক ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি—একদিন তোমাকে মাটিতে লুটাব আমি। তোমার এই রাজধানী রক্তে ভাসিয়ে দেব।'

হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলেন দ্রুপদ। তাঁর ভেতরটা কেঁপে উঠল।

দ্রুপদ দেখলেন—পুত্রের হাত ধরে উন্নত মস্তকে রাজসভা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন দ্রোণ। পেছনে কৃপী। তার পদক্ষেপও দৃঢ়তাপূর্ণ।

AMARBOI.COM


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তদ্‌বেক্ষ্য কুমারাস্তে বিস্ময়োৎফুল্ললোচনাঃ।
ঘটনা দেখে রাজকুমারদের চোখ কপালে উঠল।

দ্রোণ ভার্যা আর পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে হস্তিনাপুর নগরের দিকে পা বাড়ালেন।

দ্রোণের জন্ম হয়েছে পাঞ্চালে, বাল্য ও কৈশোরও কেটেছে পাঞ্চালে। সেই জন্মস্থান ত্যাগ করে, দ্রুপদের ওপর উদগ্র প্রতিশোধস্পৃহায় উদ্দীপ্ত দ্রোণ কুরু রাজধানী হস্তিনাপুরের দিকে রওনা দিলেন।

পাঞ্চালদেশের পূর্বদিকে গোমতী নদী বয়ে চলেছে বুকভরা জল নিয়ে। পাঞ্চালের উত্তর-পশ্চিমে সুপ্রসিদ্ধ কুরুদেশ। সেই দেশে পৌঁছাতে হলে সুবিশাল এক অরণ্যভূমি পার হতে হবে আর পেরোতে হবে গঙ্গা নদী।

কুরুবংশ এবং পাঞ্চালবংশ অনাত্মীয় ছিল না। পাঞ্চালদেশের সবচাইতে নামি রাজা ছিলেন সৃঞ্জয়। তেমনি কুরুবংশের শ্রেষ্ঠ রাজার নাম কুরু। প্রথমদিকে এই দুই বংশের মধ্যে কোনো বিরোধ ছিল না।

কিন্তু কালক্রমে উভয় দেশের প্রভাব-প্রতিপত্তি বেড়ে গেল। ফলে পাঞ্চালদেশের সঙ্গে কুরুরাজ্যের সম্পর্কের অবনতি ঘটল। মাঝেমধ্যে যুদ্ধও লাগল। সেই যুদ্ধবিগ্রহ এক সময় এমন পর্যায়ে পৌঁছাল যে, কুরুরাজ্য কখনো পাঞ্চালদের দখলে চলে গেল, আবার কখনো পাঞ্চালরা বিধ্বস্ত হলো কুরুরাজ্যের রাজাদের হাতে। মহারাজ কুরুর পিতা সম্বরণ একবার পাঞ্চালরাজ দিবোদাসের আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে বনেজঙ্গলে, গিরিগুহায় ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হন।

এই রকম আক্রমণ-প্রতিআক্রমণ আর আস্ফালন উভয় রাজ্যের মধ্যে মাঝে মাঝেই চলত। রাজ্য দুটো একেবারে পাশাপাশি। ফলে দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক একটা আক্রোশ তৈরি হয়েই ছিল। সাধারণভাবে এটা সত্য যে, পাশাপাশি দুটো দেশের রাজনৈতিক সম্পর্ক কখনো মিত্রতার হয় না। পাঞ্চালদেশ আর কুরুরাজ্যের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হতে দেখা যায়। পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ দ্বারা লাঞ্ছিত-বঞ্চিত হয়ে দ্রোণ স্বাভাবিকভাবেই তাঁর গন্তব্য হিসেবে কুরুদেশকে বেছে নিলেন।

দ্রোণ যখন কুরু রাজধানী হস্তিনাপুরে পৌঁছলেন, তখন রাজা শান্তনু বেঁচে নেই। তাঁর পুত্ররা অকালে স্বর্গত। শান্তনু কিংবা তাঁর বাবা প্রতীপের আমল থেকে পাঞ্চালদের সঙ্গে বড়


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরনের কোনো যুদ্ধবিগ্রহ হয় নি। তার পরও দুই দেশের মধ্যে চাপা উত্তেজনা সব সময়েই লেগে ছিল। দ্রোণ সেই উত্তেজনাকে আপন আনুকূল্যে ব্যবহার করার জন্য হস্তিনাপুর এলেন।

দ্রোণের হস্তিনাপুর আসার আরেকটা কারণ ছিল। ব্রাহ্মণ্যবৃত্তি ত্যাগ করে ক্ষত্রিয়বৃত্তি গ্রহণ করার ব্যাপারে দ্রোণ দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু পাঞ্চালরাজ্য তাঁর এই বৃত্তি ত্যাগকে সুনজরে দেখে নি। তা ছাড়া রাজা দ্রুপদ তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ হওয়ার পর নিন্দা আরও তীব্রতর হবে—এটা দ্রোণ ভেবেছেন। নতুন বৃত্তি প্রসারে চেনা জায়গাটি দ্রোণের প্রতি আনুকূল্য দেখাবে না। দ্রোণ মনে করলেন—নিজের অস্ত্র-সামর্থ্য প্রকাশের পক্ষে হস্তিনাপুরই হবে অধিকতর সুবিধেজনক জায়গা।

নতুন স্থানে এলে একটা আশ্রয়ের প্রয়োজন। কোনো নিকটাত্মীয়ের বাড়িতে সেই আশ্রয় মিললে ভালোরকমভাবে গুছিয়ে নেওয়া যায়। দ্রোণের জন্য সেই আশ্রয় হস্তিনাপুরে অপেক্ষা করছিল।

স্ত্রী কৃপীর যমজ ভ্রাতা কৃপ হস্তিনাপুরেই থাকেন। যেহেতু রাজা শান্তনু দ্বারা কৃপ লালিত, সে জন্য কুরুরাজপ্রাসাদে তাঁর মর্যাদা সুবিদিত। ফলে আশ্রয়ের সুবিধাটুকু দ্রোণ কৃপের কাছ থেকে পেয়ে গেলেন।

নিস্তব্ধ আক্রোশে পাঞ্চালরাজ্যের প্রান্তবাহিনী গঙ্গা পেরিয়ে, শ্বাপদসংকুল বিশাল অরণ্য অতিক্রম করে দ্রোণ শ্যালক কৃপের বাড়িতে এসে পৌঁছেছিলেন। কৃপ ভগিনী, ভাগিনা এবং বোনজামাইকে সাদরে গ্রহণ করলেন।

আশ্রয় মিলল, খাদ্যাভাব ঘুচল, তবুও দ্রোণের মনের অস্থিরতা মিটল না। একদিন সেই অস্থিরতার কথা কৃপকে খুলে বললেন। জানালেন—ব্রাহ্মণ্যবৃত্তি আর নয়, চাই অস্ত্রবৃত্তির প্রসার।

কৃপ বললেন, 'আর্য, তাই যদি চান, চলুন আমার সঙ্গে। কুরুপ্রধানদের কারও সঙ্গে দেখা করি। আপনার বাসনা পূর্ণ হবে।'

'না কৃপ। কোনো কুরুপ্রধানের সঙ্গে দেখা করে নিজেকে আর ছোট করতে চাই না।'

'তাহলে চলুন পিতামহ ভীষ্মের কাছে যাই। তিনি আপনার নাম শুনেছেন। তাঁর কাছে কর্মপ্রার্থী হোন। তিনি আপনাকে ফিরাবেন না।'

করুণ কণ্ঠে দ্রোণ বললেন, 'একবার পরশুরামের কাছে গিয়েছিলাম, আরেক বার গেলাম দ্রুপদের কাছে। অভীষ্ট অর্জিত হয় নি আমার। বরং পাঞ্চাল দ্রুপদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছি।' বলতে বলতে গলা বুজে এল দ্রোণের। আবেগে তাঁর কণ্ঠধ্বনি জড়িয়ে গেল।

যে দারিদ্র্য দ্রোণকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল, সেই দারিদ্র্যের কারণ দেখিয়ে অর্থলাভের জন্য ভীষ্ম কেন, কারও কাছে যেতে রাজি নন দ্রোণ। ঠিক করেছেন—তিনি চলবেন এবার আপন পুরুষকারের নির্দেশে। তিনি পৌরুষ প্রদর্শন করবেন এবং তা দেখে কেউ যদি তাঁকে কাছে ডেকে নেন, তবেই তিনি তাঁর কাছে যাবেন। কৃপাপ্রার্থী হয়ে নয়। তাঁর অস্ত্রবিদ্যার করণ-কৌশল দেখে কেউ যদি মুগ্ধ হয়ে তাঁকে মর্যাদা দেন, তবেই সাড়া দেবেন তিনি। তার আগে নয়।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভগ্নিপতির কথা শুনে নীরব রইলেন আচার্য কৃপ। তারপর বললেন, 'আর্য, আপনি যা ভালো মনে করেন, করুন। আমি আপনার সঙ্গে আছি।'

কৃপের কথা শুনে পৌরুষের হাসি হাসলেন দ্রোণ।

এর পর থেকে দ্রোণ কৃপাচার্যের বাড়িতে আত্মপরিচয় গোপন করে সপরিবারে বসবাস করতে শুরু করলেন। তিনি অত্যন্ত সুকৌশলে কুরুরাজবাড়িতে প্রবেশের সুযোগ খুঁজছিলেন।

কৃপাচার্য আগে থেকে পাণ্ডব-কৌরবদের অস্ত্রশিক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। খুব দক্ষ ধনুর্বিদ্ ছিলেন না কৃপ, তবে প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য তিনি যথেষ্ট ছিলেন। মহামতি ভীষ্ম কৃপাচার্যের অস্ত্রক্ষমতা আর সীমাবদ্ধতা—দু-ই জানতেন। যতদিন কৃপাচার্যের বাড়া অস্ত্রগুরু মিলবে না, ততদিন কুরুবাড়ির ছেলেদের অস্ত্রশিক্ষাভার কৃপের ওপর ন্যস্ত করলেন পিতামহ ভীষ্ম।

একদিন কুরুবাড়ির ছেলেরা কৃপের বাড়িতে গৌরবর্ণ এক প্রায়-যুবককে দেখল। ছেলেটি বেশ সুশ্রী। তাদের বয়সি হয়েও তাদের চেয়ে ভালো অস্ত্রবিদ্যা জানে সে। কৃতবিদ্যা অন্যকে শেখাতে কুণ্ঠিত নয় সে। কৃপাচার্য শিক্ষাদান শেষ করে চলে গেলে প্রায়-যুবকটি আরব্ধপাঠ আরও ভালো করে বুঝিয়ে দেয় সবাইকে। এই যুবকটি হলো অশ্বত্থামা।

পাণ্ডবভ্রাতারাই তার কাছ থেকে পাঠ নিতে বেশি আগ্রহী। পাণ্ডব-কৌরব বালকরা পরিচয় জানতে চাইলেও পূর্বপরিকল্পনামতো আত্মপরিচয় দেয় না অশ্বত্থামা। পুত্রকে এই কাজে বাধা দিলেন না দ্রোণ। তিনি চাইলেন, কুরুবাড়ির অধিবাসীদের একাংশের সঙ্গে তাঁর পুত্রের পরিচয় হোক। এই পরিচয় হয়তো কোনো এক সময় আত্মপ্রকাশের সুযোগ করে দেবে।

সেই সুযোগ এসে গেল একদিন। হস্তিনা নগরের প্রান্তদেশেই কৃপাচার্যের বাড়ি। একদিন খেলতে খেলতে পাণ্ডব-কৌরবরা কৃপাচার্যের বাড়িসংলগ্ন মাঠে চলে এল। তারা বীটা খেলছিল। গোলাকার বীটাকে হাত অথবা পায়ের সাহায্যে ছোড়া যায় অথবা লাথি মারা যায়। ছেলেরা বীটা নিয়ে ছোটাছুটি শুরু করল। অনবধানে একসময় সেই বীটা একটি অন্ধকূপের মধ্যে গিয়ে পড়ল।

লাঠির খোঁচা দিয়ে, ঢিল ছুড়ে বালকরা বীটাটিকে কূপ থেকে বের করে আনার আপ্রাণ চেষ্টা চালাল। কিন্তু ব্যর্থ হলো। উৎকণ্ঠিত বালকরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। হঠাৎ তাদের চোখ পড়ল একজন প্রবীণ মানুষের ওপর। তিনি দ্রোণ।

মেদবর্জিত শরীর দ্রোণের। চুলে সামান্য পাক ধরেছে। গলায় উপবীত। সামনে হোমকুণ্ডলী। খেলার প্রধান উপকরণ বীটা কূপে পড়ে গেছে। এখন তাদের প্রচুর অবসর। অগ্নিহোত্র করতে বসা একজন ব্রাহ্মণের প্রতি স্বভাবত কুরুবাড়ির রাজকুমাররা কৌতূহলী হয়ে উঠল। তাঁর দিকে এগিয়ে গেল তারা। তাঁকে ঘিরে কুমাররা অগ্নিহোত্রের জোগাড়যন্ত্র দেখতে লাগল।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একসময় উৎসুক রাজকুমারদের দিকে চোখ তুললেন দ্রোণ। নরম গলায় বললেন, 'কী হয়েছে বাছারা! আমি একজন ব্রাহ্মণ। যাগযজ্ঞের সময় গোল করছ কেন ?'

স্থূলকায় ভীম বলে উঠল, 'আমরা বিপদে পড়েছি। আমাদের খেলার বীটাটি ওই কুয়ায় পড়ে গেছে।'

দ্রোণ এবার অর্ধনিমীলিত চোখে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কে বৎস ? এরা কারা ?' যেন দ্রোণ তাদের চেনেনই না। এরা যে রাজকুমার, সে বিষয়ে তিনি একেবারেই অজ্ঞ, এমন ভান করে কথাগুলো জিজ্ঞেস করলেন।

ভীম বলল, 'আমি ভীম। আমি একটু বেশি খাই বলে এরা আমাকে বৃকোদর বলে সম্বোধন করে। ও হ্যাঁ, এরা সবাই কুরুরাজবাড়ির কুমার।'

মৃদু হাসলেন দ্রোণ। যে সুযোগের জন্যই তিনি এতদিন অপেক্ষা করে ছিলেন, সেই সুযোগ এখন তাঁর হাতে এসে ধরা দিল। এর সদ্ব্যবহার করতে হবে।

'হ্যাঁ, তোমাদের কী সমস্যার কথা বলছিলে যেন ?' রাজকুমারদের মুখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন দ্রোণ।

দুর্যোধন বলে উঠল, 'আমাদের খেলার বীটাটা ওই অন্ধকূপে পড়ে গেছে। আপনি ওটি তুলে দিন।'

এ কে রে বাবা! কোনো বিনয় নয়, কোনো প্রার্থনা নয়। সরাসরি তুলে দিতে বলল। বেশ উদ্ধত ভঙ্গি তো ছেলেটার কণ্ঠে! কিন্তু এই মুহূর্তে রাগলে চলবে না। তাহলে হারতে হবে। হারাতে হবে কুরুবাড়ির সঙ্গে সংযুক্তির সুযোগটা।

'তোমার নাম কী ? তোমার পরিচয় ?' দ্রোণ জিজ্ঞেস করলেন।

'আমার নাম দুর্যোধন। কুরুরাজা ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠপুত্র আমি। আশা করি, আমার পরিচয় আপনার জানা হয়ে গেছে। এবার বীটাটি তুলে আনার ব্যবস্থা নিন।' আগের মতোই দুর্বিনীত কণ্ঠে কথাগুলো বলল দুর্যোধন।

দুর্যোধনের ভাবভঙ্গি দেখে ক্রোধ দ্রোণের মাথায় চাগিয়ে উঠতে লাগল। তিনি নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি হোমস্থানের দিকে নিবিড় চোখে তাকিয়ে অগ্ন্যুৎপাতি ক্রোধকে দমন করতে চাইছেন।

এ সময় একটা কোমল কণ্ঠ দ্রোণের কানে ভেসে এল, 'ক্ষমা করবেন আচার্য। দুর্যোধন একটু ওই রকমই। তার আচরণ মাঝেমধ্যে শালীনতাকে অতিক্রম করে ফেলে।' এরপর যুধিষ্ঠির আরও নিচু কণ্ঠে অনুনয়ের সুরে বলল, 'দেখুন না, আমাদের খেলার বীটাটা আমাদেরই অসাবধানতায় কূপে পড়ে গেছে। আপনি বয়স্ক। গায়ের জোর এবং বুদ্ধি আমাদের চেয়েও আপনার অনেক বেশি। আমাদের আনন্দের উপকরণটি যদি আপনি উদ্ধার করে দেন, তাহলে আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব আমরা।' সাথিদের ওপর দৃষ্টি ফেলে কথা শেষ করল যুধিষ্ঠির।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুর্যোধন ছাড়া সবাই সমস্বরে বলল, 'জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির যথার্থ বলেছেন। আমরা আপনার উপকারের কথা মনে রাখব।'

ও, তাহলে এ-ই যুধিষ্ঠির। শান্ত সৌম্য বিবেচক হিসেবে যে ছেলেটির কথা পাঞ্চাল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। হেসে ফেললেন দ্রোণ। বললেন, 'তোমাদের বীটা আমি উদ্ধার করে দেব। তার আগে তোমাদের কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে।'

'কী প্রশ্ন আচার্য ?' আগের মতো স্নিগ্ধ কণ্ঠে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞেস করল।

'তোমরা তো ক্ষত্রিয়ের জাত, কিন্তু তোমাদের সামর্থ্য দেখে আমি স্তম্ভিত হচ্ছি।' প্রশ্ন না করে বেশ উচ্চকণ্ঠে বললেন দ্রোণ।

ভীম বলল, 'আপনার কথার সামঞ্জস্য আমরা ধরতে পারছি না। একটু বুঝিয়ে বলবেন ?'

'এত বয়স হলো তোমাদের, কী অস্ত্রবিদ্যা অর্জন করেছ তোমরা ? প্রসিদ্ধ ভরতবংশে জন্ম তোমাদের। সামান্য কুয়ো থেকে একটা বীটা তুলে আনতে পারছ না তোমরা ? অস্ত্রকৌশলীদের জন্য এটি একটি সাধারণ ব্যাপারমাত্র।'

অচেনা লোকের ধিক্কার শুনে রাজকুমাররা মাথা নিচু করে থাকল। তিনি বলছেন, অস্ত্র প্রয়োগ করে কুয়ো থেকে বীটাটি তুলে আনা সম্ভব। তা কী করে সম্ভব ? কুয়োর গহিন তলদেশের অন্ধকারে বীটাটি হারিয়ে গেছে। মানুষ সেখানে না নেমে শুধু অস্ত্রের মাধ্যমে তা ওপরে তুলে আনা অতি সাধারণ ব্যাপার—বলছেন এই আচার্য। কী অদ্ভুত!

এই সময় আচার্য বললেন, 'তোমরা ভাবছ, তা কী করে সম্ভব!' যেন রাজপুত্রদের মনের কথা বুঝতে পেরেছেন তিনি। 'বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথা ? তবে এই দেখো—' বলে নিজের হাতের আংটিটি খুলে সেই কূপে ফেলে দিলেন। তারপর ধীরেসুস্থে তিনি আবার বললেন, 'বীটা এবং আংটি দুটোকেই আমি কূপ থেকে তুলে আনছি। তবে তার আগে একটি কথা...।' বলে থেমে গেলেন আচার্য।

যুধিষ্ঠির ত্বরিত জিজ্ঞেস করলেন, 'কী কথা আচার্য ?'

'যদি দুটোকে আমি তুলে আনতে পারি, তবে আমাকে উত্তমরূপে একদিন খাওয়াবে তো বাছারা ?'

অগ্রজ যুধিষ্ঠির বললেন, 'একদিন কেন, আপনি প্রতিদিন উত্তম ভোজন লাভ করবেন।'

যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে দ্রোণ হাসলেন। তারপর নলখাগড়ার বন থেকে কতকগুলি খাগের তীর বানিয়ে আনলেন। একটির পর একটি সেই খাগের তীর ছুড়ে বীটাটিকে ওপরে তুলে আনলেন। ঘটনা দেখে রাজপুত্রদের চোখ কপালে উঠল। বীটাটি কুয়োর বাইরে চলে এসেছে, কিন্তু আংটিটি কোথায় ?

'আংটিটা যে কুয়োতেই রয়ে গেছে।' দ্রোণকে জব্দ করার জন্য যেন দুর্যোধন বলল।

'এত বিচলিত হচ্ছ কেন ? আংটিকেও ওপরে তুলে আনব।' বালকদের চমকিত করার এই তো সুযোগ।

দ্রোণ ধনুক-বাণ হাতে তুলে নিলেন। শর নিক্ষেপ করলেন তিনি। আংটির গায়ে এমনভাবে তীর ছুড়লেন যার ফলে একের পর এক বাণ-পরম্পরায় বাণবিদ্ধ আংটিটি ওপরে


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠে এল। আংটিটি দুর্যোধনের হাতে দিয়ে পরখ করে দেখতে বললেন—এটি কিছুক্ষণ আগে নিক্ষিপ্ত আংটি কি না। দ্রোণের কাণ্ড দেখে বিস্ময়স্তব্ধ হয়ে রাজকুমাররা দাঁড়িয়ে রইল। যুধিষ্ঠির এবং দুর্যোধন একযোগে দ্রোণের পায়ের কাছে নত হলো। তাদের দেখাদেখি অন্যান্য রাজপুত্ররাও।

করজোড়ে যুধিষ্ঠির বলল, 'আচার্য, আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন। মানুষের এমন ক্ষমতা আগে কখনো দেখি নি।'

দ্রোণ নরম কণ্ঠে বললেন, 'উঠে দাঁড়াও তোমরা। তোমাদের আচরণে আমি মুগ্ধ।'

যুধিষ্ঠির বলল, 'কে আপনি মহাত্মন ? আপনার পরিচয় কী ?' একটু থেমে আবার বলল, 'যে কৌশলে আপনি বীটাটি তুলে আমাদের উপকার করলেন, তার প্রতিদানে আমরা আপনাকে কী দেব বলুন ?'

দ্রোণ বললেন, 'আমি তোমার প্রশ্নের সবটুকুর উত্তর দিচ্ছি না। আমার কৌশলে তোমরা যদি তৃপ্তি পেয়ে থাকো, তাহলে মহামতি ভীষ্মের কাছে গিয়ে আমি কী করেছি, তার বর্ণনাটুকু দাও। আমার পাওনা হয়ে যাবে। আর কিছু চাই না আমি তোমাদের কাছে। আর হ্যাঁ, মহামতিকে আমার অস্ত্রকুশলতার বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে আমার চেহারার বর্ণনাটাও দিয়ো।'

রাজকুমাররা তা-ই করল। দ্রোণের সঙ্গে ঘটে যাওয়া সব ঘটনা সবিস্তারে পিতামহ ভীষ্মকে জানাল তারা। তাদের কথায় থাকল কৃতজ্ঞতামিশ্রিত বিস্ময়।

ভীষ্ম সূক্ষ্মদর্শী, বিচক্ষণ। তিনি বুঝতে পারলেন এই আচার্য দ্রোণ ছাড়া আর কেউ নন। অস্ত্রবেত্তা দ্রোণ সম্পর্কে ভীষ্ম পূর্বে যৎকিঞ্চিৎ শুনেছেন।

ভীষ্ম দ্রোণকে ডেকে পাঠালেন। রাজকীয় সৎকারে সম্মানিত করলেন তাঁকে। যথোপযুক্ত আসনে উপবেশন করিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন আপনি পাঞ্চাল ছেড়ে হস্তিনাপুরে এলেন ?'

দ্রোণ জীবনের সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক বর্ণনা করলেন ভীষ্মের সামনে। পিতা ভরদ্বাজের আশ্রমে দ্রুপদের পাঠ নিতে আসা, ঋষি অগ্নিবেশ্যের অস্ত্রাশ্রমে পাঞ্চাল দ্রুপদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গাঢ় হওয়া, দ্রুপদের প্রতিশ্রুতি, দ্রোণের দারিদ্র্যময় অবস্থা, অশ্বত্থামার জন্ম, ধনীপুত্রদের দুগ্ধ বলে পিষ্টরস খাওয়ানো এবং উপহাস, সপুত্র-পরিবারে দ্রুপদের কাছে গমন, দ্রুপদ দ্বারা চরমভাবে লাঞ্ছিত হওয়া—সবকিছু একের পর এক বলে গেলেন দ্রোণ। সবশেষে বললেন, 'উপযুক্ত অস্ত্রশিষ্য পাব বলে আমি হস্তিনাপুরে এসেছি।'

স্মিত হেসে ভীষ্ম বললেন, 'আপনার মনোবাসনা পূর্ণ হবে। আজ থেকে আপনি এই প্রাসাদের রাজপুত্রদের অস্ত্রগুরু হিসেবে নিযুক্তি পেলেন। একজন যথার্থ অস্ত্রগুরুর বুদ্ধিমত্তা, উদারতা, অস্ত্রাভিজ্ঞতা এবং শক্তিমত্তা—এই চারটি গুণ থাকা প্রয়োজন। আমার মনে হচ্ছে, আপনার মধ্যে এই চতুর্বিদগুণ বর্তমান। আপনি রাজকুমারদের অস্ত্রশিক্ষার দায়িত্বটুকু গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ করুন আচার্য।'

দ্রোণ নির্বাকপ্রায়। এত সহজে তাঁর অভিলাষ পূর্ণ হতে চলেছে! কুরুবংশের ভবিষ্যৎ গুরু হতে চলেছেন তিনি ? নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না যেন দ্রোণ।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই সময় ভীষ্মের জলদগম্ভীর কণ্ঠ আবার শুনতে পেলেন দ্রোণ, 'আপনার ভোজন ও উত্তম আবাসনের সকল দায়িত্ব এই কুরুরাজবাড়ি নিল। আজ থেকে কুরুরাজ্যের সকল ভোগ্যবস্তু আপনার ভোগ্য হবে। বিশ্বাস করবেন—কুরুবাড়ির সকলে আপনার অনুগত হলো।'

দ্রোণ দেখলেন—যেভাবে তিনি বাঁচতে চেয়েছিলেন, যে সম্মানের অভিলাষ তাঁকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল এতদিন, তার অনেকটাই ভীষ্মের কথায় পূরণ হয়ে গেল।

ভীষ্মের এই ধরনের বক্তব্যের অন্য একটা গূঢ় কারণ ছিল। দ্রোণের ছিল অত্যাশ্চর্য অস্ত্রক্ষমতা। পাঞ্চালরাজ্যের সঙ্গে হস্তিনাপুরের চিরন্তন শত্রুতা। দ্রোণের অস্ত্রশিক্ষা যদি এই রাজ্যের রাজপুত্রদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ধনুর্ধর করে তোলে, তাহলে দ্রুপদকে ভালোরকমে শায়েস্তা করা যাবে। তাই দ্রোণকে রাজপুত্রদের শিক্ষাগুরু নিযুক্ত করলেন ভীষ্ম।

ভীষ্ম রাজপ্রাসাদের সকল রাজকুমারকে জড়ো করলেন। তাদের দেখিয়ে দ্রোণকে বললেন, 'এরা আপনার শিষ্য। আপনি এদের দায়িত্ব নিন।'

তারপর দ্রোণকে রাজবাড়ির বিধিমতো আচার্য পদে বরণ করে নিলেন ভীষ্ম। বললেন, 'আজ থেকে এই ভারতবর্ষে আপনি দ্রোণাচার্য নামে সম্বোধিত হবেন। সসাগরা পৃথিবী আপনাকে অস্ত্রগুরু হিসেবে সম্মান জানাবে।'

দ্রোণের উল্লসিত হয়ে ওঠার কথা। কিন্তু দ্রোণ তেমন উৎফুল্লতা প্রকাশ করলেন না। তাঁর মনে ভীষণ একটা দ্বিধা কাজ করছে তখন। তিনি এই বাড়ির আচার্য পদে বরিত হলেন। এখন শ্যালক কৃপাচার্যের কী হবে? সে তো এই বাড়ির পূর্বতন আচার্য। তিনি এই বাড়ির আচার্য হওয়ায় কৃপের বৃত্তি তো লোপ পেয়ে গেল। এ বড় অন্যায়।

দ্রোণ হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আমার কারণে কৃপের সর্বনাশ হয়ে গেল।'

'কেন?' মৃদু হেসে ভীষ্ম জিজ্ঞেস করলেন।

'কৃপাচার্যের প্রাপ্তি যে রহিত হয়ে যাবে।' দ্বিধান্বিত কণ্ঠ দ্রোণের।

ভীষ্ম বললেন, 'এই বাড়ির সঙ্গে কৃপের কী সম্পর্ক আপনি জানেন না আচার্য। তিনি ঘরের লোক। আপনি আচার্য হওয়ায় কৃপের কোনোরূপ ক্ষতি হবে না। কৃপ থাকবেন কৃপের জায়গায়। তাঁর ভরণপোষণের কোনো ব্যত্যয় ঘটবে না। তাঁর প্রতিষ্ঠা এতটুকু ক্ষুণ্ন হবে না।' একটু থেমে ভীষ্ম আবার বললেন, 'আমার পৌত্রদের শিক্ষার ভার আপনি গ্রহণ করুন আচার্য।'

দ্রোণাচার্য প্রশান্ত চোখে পিতামহ ভীষ্মের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্জুনস্তু ততঃ সর্বং প্রতিজজ্ঞে পরন্তপ।
অর্জুন বলল, আমি আপনার ইচ্ছা পূরণ করব আচার্য।

পাণ্ডব-কৌরব সকল কুমার নিয়ে দ্রোণাচার্য তাঁর শিক্ষাদান কার্যক্রম শুরু করলেন। দ্রোণাচার্যের ইচ্ছাতেই রাজপ্রাসাদের বাইরে তাঁর আবাসস্থল নির্ধারিত হলো। এই গৃহ সুসজ্জিত করে পানভোজনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হলো। আচার্যকে যাতে কোনো কিছু যাচনা করতে না হয়, সেজন্য তাঁর আবাসস্থলেই ধনধান্যের ভাণ্ডার মজুদ করা হলো।

অন্নময় অবস্থা দ্রোণাচার্য কামনা করেছেন বটে, কিন্তু এ রকম প্রাচুর্যময় জীবনের কথা স্বপ্নেও ভাবেন নি কোনোদিন। তাঁর সামনে বারবার ভেসে ওঠে একটি দুগ্ধবতী গাভীর জন্য সারা পাঞ্চালদেশ চষে বেড়ানোর দৃশ্যটি। তিনি কিছুতেই ওই দৃশ্যটি ভুলতে পারেন না। তাঁকে সর্বদা রক্তাক্ত করে ধনীপুত্রদের উপহাসধ্বনি আর দ্রুপদের অপমানের কথা মনে হলে তাঁর বিনিদ্র রাত কাটে।

যেখানে দ্রোণাচার্যের গৃহখানি, তার একটু দূরেই শিষ্যদের আবাসস্থল। আবাসস্থলের চারদিকে ঘন অরণ্য। অরণ্য শ্বাপদসংকুল। দীর্ঘ, বিশাল বিশাল বৃক্ষে পরিপূর্ণ সেই অরণ্য। বৃক্ষগুলো এমন ঘন নিবদ্ধ যে, সূর্যকিরণ পর্যন্ত সহজে প্রবেশ করতে পারে না অরণ্যভূমিতে। দ্রোণই ভীষ্মকে বলে এই আবাসগৃহগুলো তৈরি করিয়ে নিয়েছেন।

তিনি জানেন—ছেলেরা মাতৃপিতৃ-স্নেহছায়া থেকে বেরিয়ে না এলে, রাজপ্রাসাদের সুখৈশ্বর্য থেকে বিচ্ছিন্ন না করলে তাদের শিক্ষাজীবন সুসম্পন্ন হবে না। গুরুগৃহের অদূরে শিষ্যদের থাকার ব্যবস্থা এইজন্য যে, যাতে সার্বক্ষণিক তারা গুরুর তত্ত্বাবধানে থাকতে পারে। তাতে শিষ্যদের মঙ্গল। পরিবার-বিচ্ছিন্ন শিষ্যরা একাগ্রমনে অস্ত্র সাধনা করতে পারবে। তাই আচার্য দ্রোণ রাজকুমারদের অনেকটা নির্বাসনে নিয়ে গেলেন। সেই নির্জন অস্ত্রবিদ্যা পাঠাশ্রমে শিষ্যরা নববিদ্যাপাঠে আগ্রহী হয়ে উঠল। একাগ্র নিষ্ঠায় দ্রোণাচার্য রাজকুমারদের ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগলেন।

দীর্ঘদিন কেটে গেল। গুরু আর শিষ্যদের মধ্যে একটা আন্তরিক সম্পর্ক তৈরি হলো। অর্জনের পথেও শিষ্যরা বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেল।

ইদানীং দ্রুপদের লাঞ্ছনা আর গঞ্জনার কথা খুব বেশি করে মনে পড়ে দ্রোণাচার্যের। তাঁর মধ্যে প্রতিশোধস্পৃহা খাণ্ডবদাহের রূপ নেয়। একদিন তিনি পাণ্ডব-কৌরব সকল শিষ্যকে সামনে সমবেত করলেন। বললেন, 'আমার মনের গভীরে একটা গোপন ইচ্ছা আছে। সেই ইচ্ছাটা দিনরাত আমার মধ্যে ঘুরপাক খায়।'


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কী ইচ্ছা গুরুদেব ?' স্বভাবসুলভ নরম কণ্ঠে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞেস করে।

যুধিষ্ঠিরের কথা যেন আচার্য শুনতে পান নি। চোখ নিমীলিত করে তিনি বললেন, 'তোমাদের অস্ত্রশিক্ষা সম্পূর্ণত সম্পন্ন হয়ে গেলে, বলো তোমরা আমার সেই অভিলাষ পূরণ করবে ?'

প্রবল একটা আকুলতা আচার্যের কথায় ঝরে পড়ছে। কিন্তু একী! কেউ কথা বলছে না কেন ? গুরুর কথা শুনে কোথায় সবাই সমস্বরে সম্মতি জানাবে, তা না, প্রায় সবাই মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে কেন ? একমাত্র অর্জুন ছাড়া একশ' ভাই কৌরব, চার পাণ্ডব অধোবদনে দাঁড়িয়ে আছে। শিষ্যদের নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দ্রোণাচার্য ভড়কে গেলেন। কী ব্যাপার! সবাই চুপচাপ কেন ? তাহলে তাঁর শিক্ষা কি বৃথাই গেল ? শিষ্যদের মনের মধ্যে একটুখানি শ্রদ্ধার জায়গা কি তাহলে তিনি তৈরি করতে পারেন নি ? তাহলে তাঁর এতদিনের অভিলাষ, তাঁর মনে লালিত অভিপ্রায়—সবই কি ব্যর্থ হয়ে যাবে ?

একটা গভীর বিষণ্ণতাবোধ তাঁকে ঘিরে ধরতে লাগল। সামনে দাঁড়ানো শিষ্যরা কি তাঁর চোখে অস্পষ্ট হয়ে আসছে ? দু'হাতের তালু দিয়ে চোখ দুটো কচলাতে লাগলেন দ্রোণাচার্য। এই সময় একজনের কণ্ঠ শুনতে পেলেন তিনি। সে অর্জুন। অর্জুন বলছে, 'আমি আপনার ইচ্ছা পূরণ করব আচার্য।'

দ্রোণ নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। চোখ তুলে তাকালেন তিনি অর্জুনের দিকে। ঠিক শুনছেন তো তিনি ? তাবড় তাবড় শিষ্য তাঁর। যুধিষ্ঠির-ভীম-নকুল-সহদেব, দুর্যোধন-দুঃশাসন-বিবর্ণ-দুর্বিষহ-দুর্মুখরা শতভাই। অশ্বত্থামাও তো আছে। ও তাঁর পুত্র হলে কী হবে, শিষ্য তো! কেউ কথা বলল না, কেউ সম্মতি জানাল না। সম্মতি জানাল অর্জুন! বলল, 'আমি আপনার ইচ্ছা পূরণ করব আচার্য।'

দ্রোণের চোখমুখ থেকে বিস্ময় কেটে গেল। একটা প্রশান্ত স্নিগ্ধভাবে তাঁর মুখমণ্ডল আবৃত হলো। তিনি নতমস্তকী শিষ্যদের দিকে তাকালেন এবার। তাঁর কপাল কুঁচকানো, দু'চোখে প্রচণ্ড ঘৃণা আর করুণার মেশামেশি। তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবার। অর্জুনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'বৎস অর্জুন, এই যে তুমি আমার ইচ্ছা পূরণ করার কথা দিলে, কী আমার ইচ্ছা তা তো জানতে চাইলে না! তোমার সাধ্যাতীত কোনো বাসনাও তো আমার থাকতে পারে!'

'গুরুদেব দ্বিতীয় পিতা। শিষ্য আর পুত্র সমান। পিতার ইচ্ছা পূরণ করবার দায়িত্ব শিষ্য অথবা পুত্রের ওপর বর্তায়। আমার যা কিছু বর্তমানের অর্জন, সবই তো আপনার জন্যই। আর সাধ্যাতীতের কথা বলছেন আচার্য, আপনার বাসনা পরিপূরণের জন্য আমি প্রাণান্ত চেষ্টা করব। তার পরও যদি ব্যর্থ হই, তা তো আপনি দেখতে পাবেনই।' আস্থার কণ্ঠে অর্জুন বলল।

'যথার্থ বলেছ বৎস।' স্মিত হেসে দ্রোণাচার্য বললেন।

এবার অর্জুন বিনীত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার সেই অপূরিত বাসনাটা কী গুরুদেব ?'


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠোঁট টিপে হাসলেন দ্রোণাচার্য। প্রশান্ত চোখে বললেন, 'সেই অভিলাষের কথা এখন বলব না তোমায়। সময় এলে জানতে পারবে।'

তারপর কণ্ঠকে একটু উঁচুতে নিয়ে গিয়ে শ্লেষমিশ্রিত গলায় বললেন, 'তোমরা এখন যাও বাছারা। তোমাদের খেলার সময় হয়ে এল।'

সবাই চলে যেতে উদ্যত হলে নিচু কণ্ঠে আচার্য বললেন, 'অর্জুন আর অশ্বত্থামা, তোমরা অপেক্ষা কোরো।'

অর্জুনের শ্রদ্ধাবোধ আর মানসিক দৃঢ়তা দ্রোণাচার্যকে মুগ্ধ করেছে। বীরত্ব এবং শৌর্য যে এই ছেলেটির মধ্যে বর্তমান, তা তিনি যথার্থ বুঝতে পারলেন। তাই অর্জুনের প্রতিজ্ঞাবাক্য শুনে আচার্যসুলভ গাম্ভীর্য ধরে রাখতে পারলেন না তিনি। জড়িয়ে ধরলেন অর্জুনকে। সস্নেহে শিষ্যটির মস্তকাঘ্রাণ করলেন। আনন্দাশ্রু বিসর্জন করতে করতে অশ্বত্থামার ডান হাতখানি অর্জুনের হাতে দিয়ে বললেন, 'পুত্র, আজ থেকে এই অর্জুনকে তোমার প্রিয় সখা বলে জানবে।'

অর্জুন বিমোহিত। আচার্য দ্রোণ তাঁর পুত্রের হাত তার হাতে সমর্পণ করলেন! কিংকর্তব্যবিমূঢ় অর্জুন। প্রথমে অশ্বত্থামাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। তারপর সে সংবিতে এল। ধর্মানুসারে তো গুরুপুত্র গুরুবৎ পূজ্য। সঙ্গে সঙ্গে অশ্বত্থামার চরণস্পর্শ করল অর্জুন। বলল, 'আজ থেকে গুরুদেবের মতো আপনারও অধীন হলাম আমি। আপনিও আমার গুরু বটে।'

ওই দিন থেকে অর্জুনের প্রতি দ্রোণাচার্যের পক্ষপাতিত্ব শুরু হলো। দ্রোণাচার্যের অস্ত্র-পাঠশালায় ছাত্র তো আর কম নয়। কৌরব-পাণ্ডবরা আছে। আর আছে বহির্দেশের রাজকুমাররা। শূরসেন-মথুরা অঞ্চলের বৃষ্ণি-অন্ধক রাজবংশের কুমাররা দ্রোণাচার্যের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিখতে এসেছে। আরও এসেছে খ্যাত-স্বল্পখ্যাত দেশের রাজপুত্ররা। ছাত্রদলের মধ্যে আরও আছে কর্ণ। পাণ্ডব, কৌরব, কর্ণ এবং নানা দেশ থেকে আগত শিক্ষার্থীদের মধ্যে সবচাইতে এগিয়ে গেল অর্জুন।

অর্জুনের জন্য গুরুর আনুকূল্য যেমন ছিল, তার চেয়েও বেশি ছিল স্বনিষ্ঠা। শিক্ষা, বাহুবল, উদ্যোগ আর ভালোবাসার গুণে অর্জুন দ্রোণাচার্যের কাছে প্রশংসিত হলো। তিনি দেখলেন—একজন ছাত্রের যে অনুসন্ধিৎসা, বলবতী জিজ্ঞাসা, শিক্ষার বিষয়ের প্রতি অনুরাগ থাকার কথা, সবই অর্জুনের মধ্যে আছে। সবাইকে সমান তালে অস্ত্রশিক্ষা দিলেও তীর চালানোর শীঘ্রতা এবং শিল্পীজনোচিত সৌষ্ঠব অর্জুনের মধ্যেই বেশি বর্তমান। তাই তিনি মনে মনে অর্জুনকে শ্রেষ্ঠ ছাত্রের আসনে বসালেন।

অশ্বত্থামাও কিন্তু কম দক্ষ নয়। পিতা বলেও কথা। পুত্রের প্রতি আচার্যের অর্জুনাধিক ভালোবাসা। তাই তিনি অশ্বত্থামাকে আলাদা করে একটু বেশি তালিম দিতে মনঃস্থ করলেন। কিন্তু কী করে দেবেন ? অর্জুন তো সার্বক্ষণিক পাঠশালার চৌহদ্দিতে থাকে। একটা বুদ্ধি বের করলেন আচার্য। সকালবেলায় ছাত্ররা জলঘাটে যায়। প্রত্যেকের হাতে একটা কমণ্ডলু দিয়ে আচার্য বললেন, আসবার সময় এটি ভরে জল নিয়ে এসো। আর



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অশ্বত্থামার হাতে দিলেন একটা কলসি। কমণ্ডলুতে জল ভরতে যত সময় লাগে, কলসিতে ভরতে তত লাগে না। অশ্বত্থামা জল নিয়ে আগে ফেরে। এই ফাঁকে বাড়তি বিদ্যা তাকে দান করেন দ্রোণাচার্য।

দু'দিনেই অর্জুন অশ্বত্থামার কলসি-রহস্য উদ্ঘাটন করে ফেলল। গুরুকে কিছু বলল না অর্জুন, কোনো অনুযোগও করল না। শুধু অস্ত্রের সাহায্যে দ্রুত কমণ্ডলুতে জল ভরে অশ্বত্থামার সঙ্গে ফিরতে লাগল। আচার্যের কী আর করা! যেটুকু বাড়তি কৌশল অশ্বত্থামাকে শেখাতেন, অর্জুনকেও তাই শেখাতে লাগলেন। অস্ত্রবিদ্যায় অশ্বত্থামা আর অর্জুনের মধ্যে কোনো তফাত থাকল না।

দীর্ঘদিন অস্ত্রশিক্ষা চলল। বালকরা প্রায়-যুবক হয়ে উঠল। সকলে যৌবন-ঝলসিত তরুণ। তাদের কাঁধনামা কেশভার, কর্ণে দুল, কণ্ঠে কণ্ঠমালা। পিঠে তীক্ষ্ণ তীরভর্তি তূণ। আর কাঁধে ঝুলানো ধনুক। প্রত্যেকের ভেতরে যৌবনদীপ্ত পৌরুষ টগবগ করছে। একদা যে পাঠশালা বালকদের ছোট ছোট পায়ের স্পর্শে স্পন্দিত হতো, আজ সেই পাঠশালার অন্তরঙ্গন-বহিরঙ্গন যুবকদের দৃঢ় পদভারে কম্পিত হচ্ছে।

ধনুর্বিদ শিষ্যদের পাঠ্যক্রম সমাপনের দ্বারপ্রান্তে। কিন্তু একটি বিদ্যা এখনো তারা অর্জন করতে পারে নি। তা হলো শব্দভেদাস্ত্র বিদ্যা। লক্ষ্যবস্তুকে চোখে না দেখে শুধু শব্দ শুনে লক্ষ্যভেদ করা। অসীম ধৈর্য, নিদারুণ কষ্টসহিষ্ণুতা প্রয়োজন এই বিদ্যা অর্জনে। তাই আরাম-আয়েশপ্রবণ ছাত্ররা এই বিদ্যা অর্জন না করে বাড়ি ফেরে। দ্রোণাচার্যও জানেন, তাঁর শিষ্যদের মধ্যে শুধু একজনই অধিকার রাখে শব্দভেদাস্ত্রের। সে অর্জুন। অর্জুন ধ্যানী, মেধাবী এবং সতত চেষ্টাশীল। কিন্তু সহজে তো এই দুষ্প্রাপ্য অস্ত্র অর্জুনের হাতে সঁপে দেওয়া যায় না। অর্জুনকে পরীক্ষা করা দরকার।

এক রাতে সব শিষ্য আহারে বসেছে। উতল হাওয়ায় প্রদীপ নিবে গেল। অন্যরা আহারে বিরত থাকল। অর্জুন ভোজনকার্য চালিয়ে গেল। সে দেখল—নিরেট অন্ধকারেও খাবার খেতে তার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। অন্নাধারে হস্ত প্রসারণ থেকে শুরু করে মুষ্টিবদ্ধ অন্ন মুখে প্রবেশ করানো পর্যন্ত কোনো কাজই তো অন্ধকারের কারণে আটকে থাকছে না! তাহলে অভ্যাসই সবকিছু। এই অভ্যাসই তাকে শব্দভেদে সাহায্য করবে।

সেই অন্ধকার রাতে সকল সহপাঠী ঘুমিয়ে পড়লে অর্জুন তীর-ধনুক নিয়ে আবাসস্থলের বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর রাত্রিভেদী শব্দ শুনে অলক্ষ্য বস্তুর ওপর বাণ নিক্ষেপ শুরু করল।

বাতাসে বাণক্ষেপণের শন শন শব্দ। এই শব্দ দ্রোণাচার্যের কানে পৌঁছাল। আচার্য সেই রাত্রেই শয্যা ছেড়ে নির্জন বনপ্রান্তে এসে পৌঁছালেন। দেখলেন—অর্জুনের জ্যা থেকে শন শন শব্দে তীক্ষ্ণ তীরগুলো তড়িদ্‌বেগে বেরিয়ে যাচ্ছে। দ্রোণাচার্য নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। পরম মমতায় অর্জুনকে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, 'বৎস, তুমি আমার যথার্থ শিষ্য।'


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্জুন আচার্যের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করল। করজোড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'পিতাকে হারিয়েছি শৈশবে। তাঁর স্নেহ পাই নি। তাঁর চেহারাও আজ আমার স্পষ্ট মনে পড়ে না। প্রথম দিন দেখেই আপনাকে পিতার জায়গায় স্থান দিয়েছি। আপনি আমাকে যেভাবে ভালোবাসেন, সেভাবে ভালো বোধহয় শুধু পিতারাই বাসতে জানেন।'

অর্জুনের কথা শুনে দ্রোণাচার্যের হৃদয় বিগলিত হয়ে গেল। অর্জুনকে কাছে টেনে গাঢ় কণ্ঠে বললেন, 'কেউ যাতে এই পৃথিবীতে তোমার মতো ধনুর্ধর হয়ে না ওঠে, আজ থেকে তোমার শিক্ষার জন্য আমি সেই চেষ্টাই করব।'

তারপর তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই আমার প্রতিজ্ঞা। তোমার অস্ত্রশিক্ষার কাছে আমার পুত্র অশ্বত্থামার শিক্ষা তুচ্ছ বলে বিবেচিত হবে আমার কাছে।'

নিস্তব্ধ প্রান্তরের বাতাসে এই শব্দনিচয় প্রতিধ্বনি তুলল। একটা একটা শব্দ আলাদা আলাদা গাম্ভীর্য নিয়ে অর্জুনের কানে বাজতে লাগল—এই আমার প্রতিজ্ঞা। পৃথিবীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ধনুর্ধর করে তুলব আমি তোমাকে।

কর্ণ কৌরব-পাণ্ডবদের সঙ্গেই দ্রোণাচার্যের অস্ত্র পাঠশালায় ভর্তি হয়েছিল। কর্ণ সূত অধিরথের পালিতপুত্র। জনসমাজে সূতপুত্র হিসেবে কর্ণের পরিচয়। দ্রোণাচার্যও তা জানতেন। সূতজাতীয় হওয়া সত্ত্বেও আচার্যের অস্ত্রাশ্রমে ভর্তি হতে কর্ণকে বেগ পেতে হয় নি। কারণ কর্ণের পালকপিতা অধিরথ কুরুপ্রাসাদে সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। কুরুবাড়ির রাজপুত্রদের সতীর্থ হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল কর্ণ আরও একটি কারণে। তা হলো, দুর্যোধনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল কর্ণ। দুর্যোধনের মধ্যে ছিল জ্ঞাতিশত্রুতার বিষ। তার শোণিত-শিরায় ব্যাপ্ত ছিল পাণ্ডববিদ্বেষ। নিরিড় সাহচর্যের কারণে দুর্যোধনের বিদ্বেষপূর্ণ মানসিকতা কর্ণ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।

পাণ্ডব-কৌরবরা যখন কৃপাচার্যের শিষ্য ছিল, তখন থেকেই অর্জুনকে অবজ্ঞা করা শুরু করেছিল কর্ণ। অস্ত্রশিক্ষা নিয়ে কারণে-অকারণে অর্জুনকে খোঁচা দিত সে। নানাভাবে তাকে অপমান করে আনন্দ পেত কর্ণ। আর কর্ণ এসব করত দুর্যোধনের প্রশ্রয়ে। দ্রোণাচার্যের শিষ্য হওয়ার পরও কর্ণ পূর্ব প্রবণতা ত্যাগ করে নি। কিন্তু আচার্যের অস্ত্রাশ্রমে কর্ণ অর্জুনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছিল না। তবে কর্ণ তেমন খারাপ ছাত্র ছিল না। অর্জুনের সমকক্ষ অস্ত্রবিদ্ হওয়ার জন্য কর্ণ উঠে পড়ে লাগল।

যুধিষ্ঠির-ভীম-অর্জুনের মা কুন্তী। কর্ণ এই কুন্তীরই কুমারী অবস্থার সন্তান। বলা যেতে পারে, অবৈধ সন্তান। সেই সূত্রে যুধিষ্ঠির-ভীম-অর্জুনও কানীন সন্তান। কিন্তু পরপুরুষের মাধ্যমে সন্তান ধারণে কুন্তীকে সজ্ঞানে অনুমতি দিয়েছিলেন স্বামী পাণ্ডু। ফলে এই সন্তানরা বৈধতার স্বীকৃতি পেয়েছিল সমাজে, রাজপ্রাসাদে। কিন্তু কর্ণের জন্মের সময় কুন্তী ছিলেন কুমারী। সন্তানধারণের ব্যাপারে কারও অনুমতি নিতে পারেন নি কুন্তী। অনেকটা খেয়ালের বশে কর্ণকে পেটে ধরা। কিন্তু অবৈধ সন্তান বলে কর্ণ জন্মমুহূর্তেই পরিত্যক্ত হয়েছিল। স্বীকৃতি আর মাতৃস্নেহ—দুটো থেকেই বঞ্চিত হয়েছিল শিশু কর্ণ।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুন্তী জন্মেছিলেন মথুরা-শূরসেন অঞ্চলে। ওই রাজ্যের রাজা আর্যক শূর। এই রাজাই কুন্তীর জন্মদাতা পিতা। কিন্তু রাজা শূর কন্যা কুন্তীকে দত্তক দিয়ে দেন আপন পিসতুতো ভাই কুন্তিভোজের কাছে। কুন্তিভোজের প্রাসাদেই কুন্তীর বড় হয়ে ওঠা।

একদিন কুন্তিভোজের বাড়িতে এলেন ঋষি দুর্বাসা। কুন্তিভোজ কন্যা কুন্তীকে দুর্বাসার সেবা করার দায়িত্ব দিলেন। কুন্তীর সদাচার ও সেবাপরায়ণতা দেখে ঋষি দুর্বাসা তুষ্ট হলেন। দেবসম্ভোগের বর পেলেন কুন্তী দুর্বাসার কাছ থেকে।

মুনি চলে গেলেন। কুন্তীর ভেতর একধরনের ছটফটানি। দুর্বাসা যে বর দিলেন, তার তো পরীক্ষা করা দরকার। কুন্তীর মধ্যে মানসিক বিভ্রম তৈরি হলো। ঘোর লাগা মানসিক অবস্থায় তিনি সূর্যদেবকে স্মরণ করলেন। স্মরণমাত্র সূর্যদেব কুন্তীর সামনে উপস্থিত হলেন। বললেন, 'দেহদান কোরো।'

বিব্রত কুন্তীর কণ্ঠনালি শুকিয়ে গেল। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'আমি কুমারী। দেহ দেব কী করে ?'

'তুমি যে মন্ত্রোচ্চারণ করে আমাকে স্মরণ করেছ, তার নাম দেহসম্ভোগ মন্ত্র। এর একটি মাত্র পরিণতি দেহদান করা। কোনো গত্যন্তর নেই তোমার। আমার শয্যাসঙ্গিনী হতেই হবে তোমাকে।'

নিরুপায় কণ্ঠে কুন্তী বললেন, 'আমার কৌমার্য ?'

'কৌমার্য তোমার ঠিক থাকবে। তোমার অনুকূলে আমার আশীর্বাদ থাকবে।' সূর্যদেবতা বললেন।

উভয়ের সম্মিলনে একটি পুত্র জন্মাল। কৌশলে আপন বস্ত্রাঞ্চলে গর্ভবতী অবস্থাকে রেখেঢেকে রেখেছিলেন কুন্তী। পুত্রটি ঠিক বাবার মতোই হলো। দেহের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য কবচ-কুণ্ডল নিয়ে জন্মাল সন্তানটি। কিন্তু এ যে কলঙ্ক! এই কলঙ্কচিহ্ন ত্যাগ করতে হবে। পিতা কুন্তিভোজ অথবা রাজপ্রাসাদের কেউ জানতে পারলে মৃত্যুর অধিক বেদনার সৃষ্টি হবে। তাহলে কী করা ? ধাত্রী বুদ্ধি জোগাল—পুত্রটিকে নদীজলে ভাসিয়ে দিন রাজকুমারী। আপনি কলঙ্কচিহ্নমুক্ত হবেন। আর এই নবজাতকের ভাগ্য যদি ভালো হয়, কারও হাতে পড়বে। বেঁচেও যেতে পারে।

ধাত্রীর পরামর্শ কুন্তীর মনে ধরল। একটা বড়োসড়ো স্বর্ণপেটিকার মধ্যে নবজাতকটিকে শুইয়ে দিয়ে অশ্বনদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হলো। নদীপারে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে জোড় হাতে কুন্তী পুত্রকে আশীর্বাদ করলেন—তুই যেখানেই যাস, বেঁচে থাকিস বাছা। তোর বাবা সূর্য কিরণচক্ষুতে সর্বত্র দেখতে পান। তিনি আকাশ থেকে তোকে সর্বদা পাহারা দেবেন।

অশ্বনদীর জলের ঢেউ আর স্রোত সেই সোনার পেটিকাটিকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল। পেটিকা চলে এল অশ্বনদী ছেড়ে চর্মন্বতী নদীতে। চর্মন্বতী শিশুসহ পেটিকাটিকে পৌঁছে দিল যমুনায়। যমুনা থেকে গঙ্গায়। গঙ্গার ধারেই চম্পানগরী। এই নগরীটি অঙ্গরাজ্যের রাজধানী। অঙ্গরাজ্য হস্তিনাপুরের অন্তর্গত। এই অঙ্গরাজ্যে বাস করেন সূত অধিরথ ও তাঁর


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ত্রী রাধা। অধিরথ হস্তিনাপুরের রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বন্ধু। এককালে রাজবাড়ির রথ চালাতেন। তাই তিনি সূত। এখন বয়স হয়ে যাওয়ায় সেই পেশা ত্যাগ করেছেন। কিন্তু সকলের কাছে তিনি সূত অধিরথ নামে পরিচিত।

অধিরথ-রাধা দম্পতি নিঃসন্তান। ধর্মকর্ম করে দিন কাটান। সেদিন রাধা এসেছেন গঙ্গায় স্নান করতে। রাধা গঙ্গায় নেমেছেন, অধিরথ পারে দাঁড়িয়ে পরিচিতদের সঙ্গে কথালাপে মগ্ন। হঠাৎ রাধার চিৎকার শুনতে পেলেন অধিরথ, 'ওগো, দেখে যান, দেখে যান। ওই যে অদূরে জলের ওপর একটা পেটিকা দেখা যাচ্ছে না ?'

অধিরথ ভালো করে চেয়ে দেখলেন, তাই তো, পেটিকার মতো কী যেন একটা ভেসে যাচ্ছে গঙ্গাস্রোতে। বললেন, 'পেটিকাই তো। বেশ বড়োসড়ো মনে হচ্ছে। কী হতে পারে বলো তো ?'

'যাই হোক, ওই পেটিকা কূলে ভেড়ানোর ব্যবস্থা করুন। ভেতরে কী আছে তা দেখার বড় কৌতূহল হচ্ছে আমার।'

স্ত্রীকে খুব ভালোবাসেন অধিরথ। তিনি স্ত্রীর কোলে একটা সন্তান উপহার দিতে পারেন নি সারা জীবনে। একজন নারীর পরিপূর্ণতা যে মাতৃত্বে, সেই মাতৃত্ব রাধার অনাস্বাদিত থেকে গেছে। অধিরথ ভেবেছেন—এই ব্যর্থতার জন্য তো তিনি স্বয়ং দায়ী। এই অপরাধবোধ থেকে রাধাকে সর্বদা সন্তুষ্ট রাখতে চাইতেন তিনি। যা কামনা করতেন, যে-কোনো মূল্যে তা পূরণ করতেন। তাই রাধার কৌতূহল পূরণের জন্য লোকজন জড়ো করলেন অধিরথ। তাদের সাহায্যে স্বর্ণ পেটিকাটি তীরে তুললেন।

পেটিকা খুলতেই সবাই ঘুমন্ত এক শিশুকে দেখতে পেলেন। তার গায়ের রং প্রভাতের সূর্যরশ্মির মতো। রাধা সেই পুত্রকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে নিতেই দুখি দু'জন মানুষের সন্তানবাৎসল্য উথলে উঠল। রাধার অতৃপ্ত জননীহৃদয় আনন্দে বিগলিত হয়ে গেল। নবলব্ধ পুত্রকে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন তাঁরা।

গায়ে সোনার কবচ-কুণ্ডল দেখে তার নামকরণ করা হলো বসুষেণ। সূত অধিরথের বাড়িতে লালিতপালিত হতে হতে বসুষেণের পরিচয় হয়ে গেল—সূতপুত্র হিসেবে।

বড় গ্লানি জমতে লাগল অধিরথের মনে। তিনি নিজে না হয় সূত, দৈবপ্রেরিত এই বালকটি তো তাঁর ঔরসে জন্মায় নি। তারপরও সামাজিকগণ তার কপালে হীন অভিধা সেঁটে দিল। তাই একটু বয়স হতেই ছেলেটিকে হস্তিনাপুরের রাজবাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। পুত্রের সার্বিক বিদ্যালাভের আশায় বসুষেণকে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে পাঠিয়েছিলেন অধিরথ। হস্তিনাপুর এসে বসুষেণের নাম হয়ে গেল কর্ণ।

ধৃতরাষ্ট্র আপন পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রদের সঙ্গে কর্ণকে কৃপাচার্যের অস্ত্র-পাঠশালায় পাঠালেন। তারপর আচার্য দ্রোণের গুরুকুলে। আশ্রমের ভালো ছাত্র ছিল ভীম, দুর্যোধন, কর্ণ, অশ্বত্থামারা। কিন্তু শ্রেষ্ঠতম ছিল অর্জুন। অর্জুনের ভীষণ ভালো হওয়াটাই কর্ণের ঈর্ষার প্রধান কারণ। ধনুর্বিদ্যায় অর্জুনের প্রয়োগ-নৈপুণ্য লক্ষ করে কর্ণ ধীরে ধীরে হতাশা বোধ করতে শুরু করল। এই হতাশা থেকে তৈরি হলো ক্রোধ। এই ক্রোধ অর্জুনের প্রতি। কর্ণ



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুঝল—তার পক্ষে অর্জুনের অস্ত্রপ্রয়োগ-কৌশলকে ডিঙানো সম্ভব নয়। সে সিদ্ধান্ত নিল—শক্তি নয়, এমনকি কৌশলও নয়, মারণাস্ত্র দিয়ে অর্জুনকে সরিয়ে দেবে এই পৃথিবী থেকে।

এই মারণাস্ত্র আছে আচার্য দ্রোণের কাছে। যে করেই হোক, তাঁর কাছ থেকে এই অস্ত্র আদায় করে নিতে হবে। গুরুপরম্পরায় আচার্য এই অস্ত্রের অধিকারী হয়েছেন। কর্ণ নিজেও তো দ্রোণের শিষ্য। সুতরাং এই অস্ত্র পাওয়ার অধিকার তার আছে। একবার এই মারণাস্ত্রের প্রহার-সংহরণের প্রক্রিয়া গুরুর কাছ থেকে জেনে নিতে পারলে সহজেই অর্জুনকে শায়েস্তা করা যাবে। দুর্যোধনের কাছ থেকে যে পাণ্ডববিরোধিতা তার মধ্যে সংক্রমিত হয়েছিল, তার সঙ্গে যুক্ত হলো প্রচণ্ড ঈর্ষা। ফলে কর্ণ বেপরোয়া হয়ে উঠল।

এক অপরাহ্ণে কর্ণ দ্রোণাচার্যের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আশপাশে কেউ নেই। নেই অশ্বত্থামাও। গ্রীষ্মের অপরাহ্ণ। চারদিক শুনশান। পাখিরা ধীরেসুস্থে তাদের কুলায় ফিরতে শুরু করেছে। সূর্যের গায়ে কালো মেঘের ছায়া। সমীরণ ধীরগতিতে প্রবহমান।

জোড়াসনে বসে দ্রোণাচার্য কী যেন একটা গ্রন্থ খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ছিলেন। কর্ণের উপস্থিতি তিনি টের পান নি। কর্ণ একটু দূরে জোড় হাতে দাঁড়িয়ে থাকল। একটা মূষিক ঘরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে হঠাৎ দৌড়ে গেল। আচার্যের বিকর্ষণ সৃষ্টি হলো। গ্রন্থ থেকে মুখ তুললেন তিনি। দেখলেন, সামনে কর্ণ দাঁড়িয়ে। আচার্য ভালোরকমেই অবাক হলেন। বিস্মিত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কর্ণ! তুমি এখানে! এই সময়ে!'

উত্তর না দিয়ে কর্ণ সাষ্টাঙ্গে গুরুদেবকে প্রণাম করল। প্রণাম শেষে করজোড়ে উঠে দাঁড়াল।

'কী কর্ণ ? কিছু বলছ না যে ?' কিছুটা নরম কণ্ঠে বললেন আচার্য।

'আমি অস্ত্রদীক্ষা নিতে এসেছি আপনার কাছে।'

হো হো করে হেসে উঠলেন দ্রোণাচার্য। 'কী আশ্চর্য! তুমি কি আমার শিষ্য নও ? তুমি কি আমার কাছে অস্ত্রশিক্ষা নিচ্ছ না ?'

'আমি সাধারণ অস্ত্রের কথা বলছি না গুরুদেব।'

আচার্য বললেন, 'কোন অস্ত্রের কথা বলছ তুমি ?'

কর্ণ গুরুর প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দিল না। প্রশ্নকে পাশ কাটিয়ে কর্ণ বলল, 'এই ভারতবর্ষে কেন, সমস্ত ভূমণ্ডলে আপনার সমকক্ষ অস্ত্রগুরু নেই। পৃথিবীর যে-কোনো ধনুর্ধর আপনার সম্মুখে মুহূর্তমাত্র দাঁড়াতে পারবে না। এই ধরণীর যে-কোনো অস্ত্রগুরু আপনার নাম শুনলে কপালে ডান হাত ঠেকান।'

কী চায় কর্ণ ? এ রকম চাটুকারিতা করছে কেন ? তিনি যা নন, তা বলে তাঁকে সর্বোত্তমের আসনে অভিষিক্ত করতে চাইছে কেন ? নিশ্চয়ই কোনো দুরভিসন্ধি আছে কর্ণের। নইলে এই নির্জন অপরাহ্ণে সে আমার কাছে এল কেন ? যে কর্ণ সর্বদা সরাসরি কথা বলতে অভ্যস্ত, সে কর্ণ এত তোষামুদে গলায় কথা বলছে কেন ? তার অভিপ্রায় যে সৎ নয়, তা বুঝতে দ্রোণাচার্যকে বেগ পেতে হচ্ছে না। কিন্তু অভিপ্রায়টা কী তা বুঝে উঠতে পারছেন না আচার্য।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্রোণ বললেন, 'তোমার অভিপ্রায় কী, শোনাও।'

কর্ণ আবার বাঁকা পথ বেছে নিল। বলল, 'গুরুদেব, সূর্যকিরণ সব প্রাণীর ওপর সমানভাবে পতিত হয়। কারও ওপর কম আবার কারও ওপর বেশি নয়। তেমনি গুরুর কৃপাও সকল শিষ্যের ওপর বর্ষিত হয়। সকল শিষ্যের প্রতি আপনার সমদৃষ্টি।'

'তুমি কী বলতে চাও স্পষ্ট করে বলো কর্ণ।'

'আপনার সমদর্শিতার পরও যেন কেউ বলতে না পারে কর্ণ আচার্যের শিষ্য হওয়া সত্ত্বেও সঠিক বিদ্যা অর্জন করে নি।'

এবার স্থির চোখে গমগমে গলায় দ্রোণাচার্য বলে উঠলেন, 'ভূমিকা রাখো। কী বলতে চাও তুমি ?'

'গুরুদেব, আমাকে ব্রহ্মাস্ত্র বিদ্যা দান করুন। এই ব্রহ্মাস্ত্র ছুড়বার এবং সংবরণ করবার করণকৌশল আমাকে শিখিয়ে দিন।'

'ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে তুমি কী করবে ?'

দ্বিধাহীন কণ্ঠে এবার কর্ণ বলল, 'অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে চাই। পরাজিত করতে চাই তাকে।'

'পরাজিত করতে চাও ? অর্জুনকে ? কেন ?' স্তম্ভিত গলায় আস্তে আস্তে উচ্চারণ করলেন দ্রোণাচার্য।

'গুরুকুলে অর্জুন কেন শ্রেষ্ঠতম হবে ? তার চেয়ে আমি কম কিসে ? দেখেছি—আপনি তাকে সর্বদা আনুকূল্য দিচ্ছেন। অথচ এই আনুকূল্য পাওয়ার কথা দুর্যোধনের। ও মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র। রাজপুত্রই তো গুরু-আনুকূল্যের সর্বাধিক অধিকার রাখে। কিন্তু আপনার মমতা দুর্যোধনের জন্য নেই বললেই চলে। আপনার সকল স্নেহাতিশয্য অর্জুনকে ঘিরে। এমনকি আপনার পুত্র অশ্বত্থামাও আপনার স্নেহ-মমতা থেকে বঞ্চিত। কেন ? এটা কি আপনার পক্ষপাতিত্ব নয়।'

থামল কর্ণ। সে যে অনেক অপ্রীতিকর কথা এর মধ্যে বলে ফেলেছে, বুঝতে পারল। বিনীত কণ্ঠে বলল, 'অপরাধ ক্ষমা করবেন গুরুদেব। তারুণ্যসুলভ বাচালতায় অনেক কিছু বলে ফেলেছি।'

দ্রোণ বুঝলেন কর্ণ নাছোড়। তা ছাড়া সে যে-কথাগুলো বলল, মিথ্যে তো নয়। তাঁর আনুকূল্য অর্জুনের জন্য সর্বাধিক—এও অসত্য নয়। কর্ণকে কী করে বোঝাবেন—অর্জুন তাঁর কাছে পুত্রাধিক। অর্জুনের প্রয়াস, প্রচেষ্টা, ধীরতা আর বিনয় তাঁকে পক্ষপাতী করে তুলেছে। কোন গুরু মেধাবী এবং বিনয়ী শিষ্যের প্রতি পক্ষপাতী না হবেন ? এই কারণে তিনি অতি গোপনে অর্জুনকে ব্রহ্মাস্ত্র দিয়েছেন। শিখিয়েছেন এর প্রয়োগ ও সংবরণের করণকৌশল। এও বলেছেন, এই অস্ত্র দুর্বলের প্রতি প্রয়োগের জন্য নয়, ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে প্রয়োগের জন্যও নয়।

অসূয়াপ্রবণ, ক্রোধান্ধ কর্ণকে এই মারণাস্ত্র দেবেন ? সে তো প্রতিহিংসাপ্রবণ এবং দুর্যোধনের প্রতি পক্ষপাতী। এ রকম অসদিচ্ছাপ্রবণ কর্ণের হাতে কিছুতেই ব্রহ্মাস্ত্র তুলে


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবেন না দ্রোণাচার্য—মনে মনে ঠিক করলেন। কিন্তু সরাসরি কর্ণকে প্রত্যাখ্যান করবেন কীভাবে ? আচার্য চাতুর্যের আশ্রয় নিলেন। কর্ণের সঙ্গে কথা বলবার আগে নিজের ভেতরে তাকালেন দ্রোণ। সেখানে কর্ণের জন্য কোনো সমবেদনা খুঁজে পেলেন না। বরং দূরদৃষ্টিহীন, ক্রোধোন্মত্ত একজন তরুণকে দেখতে পেলেন। কর্ণের সমদর্শিতার নীতিকথায় বিগলিত হলেন না আচার্য। কর্ণের পাশাপাশি বিনীত আর মেধাবান অর্জুনকে দেখতে পেলেন তিনি। যে কর্ণ এখনো অস্ত্রপ্রয়োগ দক্ষতায় অর্জুনের সমকক্ষ হতে পারে নি, তার হাতে ব্রহ্মাস্ত্র তুলে দেবেন না তিনি। আর তুলে দিলেই কি কর্ণ অর্জুনের সমকক্ষ হয়ে উঠবে ? তা তো নয়। পক্ষপাতী, অভিসন্ধিপরায়ণ শিষ্যের শিক্ষা কখনো সুসম্পন্ন হয় না। কর্ণেরও হয় নি, হবেও না। তাই আচার্য সিদ্ধান্ত নিলেন—অপরিশীলিতবুদ্ধি কর্ণের হাতে এই মারাত্মক অস্ত্রের প্রযুক্তি কিছুতেই তুলে দেবেন না।

অত্যন্ত মৃদু গলায় দ্রোণাচার্য বললেন, 'এই অস্ত্র তুমি পাবে না বৎস।'

'কেন গুরুদেব ?'

'ব্রহ্মাস্ত্র পাওয়ার অধিকার তোমার নেই।'

'অর্জুনের যদি পাওয়ার অধিকার থাকে, আমার নেই কেন ?'

এবার আরও নরম গলায় আচার্য বললেন, 'ব্রহ্মাস্ত্রের সন্ধি জানবার অধিকার আছে শুধু ব্রাহ্মণের। আর...।'

'অর্জুন তো ক্ষত্রিয়।'

'তুমি তো আমাকে কথা শেষ করতে দিলে না।'

'বলুন আচার্য।' বিনীত গলায় বলল কর্ণ।

'ব্রাহ্মণরা ব্রহ্মাস্ত্র লাভের অধিকারী হলেও এরা কখনো ক্রোধমগ্ন হয়ে এই অস্ত্রের প্রয়োগ করেন না। তা ছাড়া ক্ষত্রিয়ও এই অস্ত্র করলতগত করতে পারবে, তবে সেই ক্ষত্রিয়কে হতে হবে সদাচারী সচ্চরিত্র। অর্জুন সদাচারী। তাই সে ব্রহ্মাস্ত্র পাওয়ার অধিকার রাখে।' ধীরে ধীরে বললেন দ্রোণাচার্য।

কর্ণ নিজের ক্রোধকে সংবরণ করার জন্য মাটির দিকে তাকিয়ে থাকল।

আচার্য আবার কথা বলে উঠলেন, 'ও হ্যাঁ, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীও এই মারণাস্ত্র লাভ করতে পারেন।'

'ক্ষত্রিয় ছাড়া আর যাঁদের কথা বললেন, তাঁরা তো ক্রোধ-বিবর্জিত মানুষ। এই অস্ত্র প্রয়োগ করার কোনো প্রয়োজন পড়বে না তাঁদের। তাহলে এই অস্ত্রের অধিকারী হয়ে তাঁদের লাভ কী ?' যুক্তিজাল বিস্তার করল কর্ণ।

দ্রোণাচার্য শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'এই অস্ত্র প্রয়োগ করার জন্য বহুল হিতকর অথচ এক নিষ্কাম ঔদাসীন্য লাগে। সেটা ব্রাহ্মণ আর সন্ন্যাসীর মধ্যে আছে। আর আছে ক্ষত্রিয় হয়েও অর্জুনের মধ্যে।'

'আমার মধ্যে নেই ?'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুমি ক্রোধোন্মত্ত। দুর্যোধন দ্বারা প্রভাবিত। অর্জুনের প্রতি অসূয়াপ্রবণ। বলেছ— অর্জুনকে পরাজিত করবার জন্য ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করবে তুমি। এই অস্ত্র বহুজনের হিতের জন্য। তাই আমি তোমার হাতে এই মারাত্মক অস্ত্র তুলে দেব না।'

কর্ণ ভক্তিমিশ্রিত গদগদ কণ্ঠে বলল, 'ভুল হয়ে গেছে আমার। ব্যক্তি অর্জুনের বিরুদ্ধে আমি এই অস্ত্র প্রয়োগ করব না কখনো।'

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারছি না কর্ণ। আর শুধু অবিশ্বস্ততার জন্য নয়, বর্ণের নীচতার জন্যও তুমি এই অস্ত্রের অধিকারী হতে পারো না।'

চমকে গুরুদেব দ্রোণের দিকে তাকাল কর্ণ। দ্রুত বলল, 'আপনার কথা বুঝতে পারছি না গুরুদেব।'

দ্রোণাচার্য এবার সরাসরি কর্ণের মুখের দিকে তাকালেন। কর্ণের চোখে চোখ রেখে বললেন, 'তুমি ব্রাহ্মণ নও, সন্ন্যাসীও নয়। এমনকি তুমি ক্ষত্রিয়ও নও। তুমি সূতপুত্র। রথচালক অধিরথের পুত্র তুমি। সূতপুত্রের এই মারণাস্ত্র পাওয়ার অধিকার নেই।'

তীব্র কণ্ঠে চিৎকার দিয়ে উঠল কর্ণ, 'আমার মা রাধা। রাধা ব্রাহ্মণকন্যা। সবাই আমাকে রাধেয় বলে। মায়ের দিক থেকে হলেও আমি ব্রহ্মাস্ত্র পেতে পারি।'

'সমাজে পিতার পরিচয়ে সন্তানরা পরিচিত হয়, মাতার পরিচয়ে নয়।' দ্রোণ বললেন।

কর্ণ বুঝে গেল আচার্য কিছুতেই তাকে ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগ-সংবরণ কৌশল শেখাবেন না। প্রথমে অসংযমী ও অবিনীতের দোহাই দিয়ে, পরে অসূয়ার কথা বলে এবং সর্বোপরি হীনজাতের প্রসঙ্গ তুলে আচার্য তাকে সেই মাস্ত্রের শিক্ষা দেবেন না। দেবেন না বলেই ব্রাহ্মণ, ব্রতচারী, ক্ষত্রিয় আর সন্ন্যাসীর নাম করলেন গুরুদেব।

কর্ণ বহুক্ষণ দ্রোণাচার্যের সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল। তার বুক চিড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। তারপর হাঁটু গেড়ে গুরুদেবকে প্রণিপাত করল।

তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এল কর্ণ।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য নাম।
দ্রোণের চরণে আসি করিল প্রণাম॥

উষাকালে যাত্রা শুরু করেছে একলব্য।

ঊর্ধ্বাঙ্গের কাপড়টি ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে সে। বাতাসে শীতের ছোঁয়া। উত্তুরে বাতাস হিমালয় থেকে শৈত্য নিয়ে গোটা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দিচ্ছে। সমতলে শীত জাঁকিয়ে না নামলেও পাহাড়ি-অঞ্চলে তার অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে। তবে শীতের প্রকোপ তেমন নয়। শুধু প্রত্যুষে এর অস্তিত্ব ভালোভাবে টের পাওয়া যায়।

একলব্য বসনভূষণত্যাগী তরুণ। সে একাগ্রচিত্ত। সে গন্তব্যগমনে স্থিরমনস্ক। ফলে অনেকটা বাহ্যজ্ঞানশূন্য সে। তাই শৈত্য বা গরমের প্রকটতা তাকে তেমন করে কাহিল করতে পারছে না। সাধারণ একটা বসনে গা ঢেকে সে এগিয়ে যাচ্ছে তার গন্তব্যের দিকে, হস্তিনাপুরলগ্ন দ্রোণাচার্যের অস্ত্রাশ্রমের দিকে। ঋষি জৈমিনীর আশ্রমের কাউকে কিছু না বলেই বেরিয়ে পড়েছে একলব্য। সে যখন রওনা দিয়েছে, আশ্রমের কেউ জাগে নি তখনো।

মহর্ষি জৈমিনীর কাছ থেকে গতরাতেই বিদায় নিয়ে রেখেছিল একলব্য। বলেছিল, 'মহাত্মন, খুব ভোরে যাত্রা শুরু করব আমি। সূর্যদেব তেজোময় হয়ে উঠার আগে অনেকটা পথ অতিক্রম করতে চাই। আপনার কাছে যাত্রার আগাম অনুমতি প্রার্থনা করছি। যাওয়ার সময় আপনাকে আর বিরক্ত করব না আমি।' বলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেছিল একলব্য।

মহর্ষি জৈমিনী গত ক'দিনে একলব্যকে দেখে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। উনিশ-বিশ বছরের এক নিষাদপুত্রের মধ্যে কী গভীর সুবিবেচনা! কোনোরূপ পক্ষপাতিত্ব নেই তার মধ্যে। নিজ গোত্রের মানুষদের সে যেভাবে বশীভূত করেছে, তা সত্যি প্রশংসার। সেখানেই থেমে যায় নি একলব্য। নিষাদদের দিয়ে তাঁর তপাশ্রম পুনর্নির্মাণ করিয়ে নিয়েছে। রাজপুত্র সে। কিন্তু কোনো অহংকার নেই তার। মহর্ষি তো অনেক ক্ষত্রিয় রাজপুত্র দেখেছেন। তাদের ঐশ্বর্যপ্রীতি, তাদের অহংবোধ বারবার বিরক্ত করেছে তাঁকে। একলব্যও নিষাদ রাজপুত্র। অথচ সে যেন বিনয়ের অবতার, যেন নিরহংকারের জ্বলন্ত উদাহরণ।

একলব্যের যাত্রার অনুমতি প্রার্থনার উত্তরে ঋষি জৈমিনী বলেছিলেন, 'তোমার যাত্রা শুভ হোক বৎস। তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হোক।'

একলব্য হাঁটছিল আর দেখছিল। অরণ্যসন্তান সে। বয়সও তার বিশের কাছাকাছি। বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে রাজপ্রাসাদের চেয়ে অরণ্যভূমি তার ভালো লাগত। ঘুরে ঘুরে বৃক্ষ-


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লতা-গুল্ম দেখত। গাছেদের বেড়ে ওঠা, তাদের ফল-ফুল-বীজ—এসবকে গভীর অভিনিবেশে লক্ষ করত একলব্য। পাখি-প্রজাপতির উড়াউড়ি, তাদের ফলে-ফুলে ঘুরে বেড়ানো তীক্ষ্ণ চোখে দেখে যেত সে। আর দেখত পিঁপড়েদের। কত রকমের যে পিঁপড়ে। কেউ দল বেঁধে, কেউ একা একা পথ ফুরাত পিঁপড়েরা। তাদের আকার আর গায়ের রঙও ভিন্ন ভিন্ন। কেউ ছোট, কেউ মাঝারি, কেউবা ঢাউস। কোনোটা লালমুখো, কিছু আবার কুচকুচে কালো।

আজ অরণ্যের মধ্যদিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ তার কালো পিঁপড়েদের কথা খুব করে মনে পড়ল। আরে, পিঁপড়েরা যেমন কালো-ধলো, মানুষরাও তো তেমনি! আর্যরা কী ফর্সা! দীর্ঘ নাসা তাদের, কাঁধ ঝুলানো লালচে চুল! নীল চোখো আর্যরা এক একজন দিব্যপুরুষ যেন। দীর্ঘদেহী সবাই। আর নিষাদরা! আর্যদের বিপরীত তাদের গায়ের রং, দৈহিক গঠনও।

আচ্ছা, আমাদের নাম নিষাদ হলো কেন ? জিজ্ঞেস করেছিল একদিন পিতামহ অনোমদর্শীকে। অনোমদর্শী বলেছিলেন—'তাহলে একটা গল্প শোন। এ গল্প আমার বানানো নয়। আর্যদের পুরাণেই এই কাহিনি আছে। গল্প শোনার আগের গল্পটি শুনে রাখো একলব্য। যে আর্যরা আজ আমাদের ঘৃণা করছে, অস্বীকার করছে আমাদের জাতিত্ব, মুছে দিতে চাইছে নিষাদগোষ্ঠীর অস্তিত্ব এই পৃথিবী থেকে, সেই আর্যদের প্রাচীন সংহিতাগ্রন্থে মর্যাদার সঙ্গে আমাদের উল্লেখ আছে। ওই যে তৈত্তিরীয় সংহিতা, কাঠক সংহিতা, মৈত্রায়ণী সংহিতা অথবা বাজসনেয়ী সংহিতা—এগুলোর সবটাতে নিষাদগোষ্ঠীর নাম বারবার সম্মানের সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। আর রামায়ণ; যে রামায়ণের কথা বারবার তোমাকে বলি, সেই রামায়ণেও তুমি নিষাদদের কথা পাবে।'

'দাদু, গল্প। কী একটা গল্প শুনাবেন বলেছিলেন।' একলব্য পিতামহকে মনে করিয়ে দেয়।

'আমাদের নাম কেন নিষাদ হলো, সেই কাহিনি শোনাতে চেয়েছি তোমাকে।' খেই ধরিয়ে দেওয়া নাতির উদ্দেশে বললেন অনোমদর্শী।

'কেন নিষাদ হলো আমাদের নাম ? অন্যকিছু হলো না কেন ?' গল্পানুরাগী কণ্ঠ একলব্যের।

'এটা নিয়েও আর্যদের মানে বামুনদের গল্প বানানোর শেষ নেই।' তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকলেন অনোমদর্শী। যেন নাতিকে কাহিনিটা কীভাবে শোনাবেন সেটা গুছিয়ে নিলেন মনের ভেতর অথবা এই কাহিনিতে ব্যাধদের প্রতি যে গভীর তুচ্ছতা আছে, তার জন্য তাঁর মধ্যে যে মর্মযাতনা, তা সংহত করে নিলেন নিজের মধ্যে।

চিন্তা করতে দাদু যে সময়টুকু নিলেন, তার জন্য উতলা হলো না একলব্য। একাগ্রমনে দাদুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

অনোমদর্শী বললেন, 'নিষীদ শব্দ থেকে নিষাদ কথাটি এসেছে। নিষীদ মানে বসে থাকো।'


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবার অবাক গলায় একলব্য জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের সঙ্গে বসে থাকার সম্পর্ক কী ? আমরা তো বরং ছোটাছুটিই করি। এই যেমন জীবন নির্বাহের জন্য বনের পশুপাখি নিধন করে নিষাদরা। পশুপাখিরা তো ব্যাধদের হাতে আর এমনি এমনি ধরা দেয় না। ধরতে বা মারতে ওদের পেছনে তো কত দৌড়াদৌড়ি করতে হয় নিষাদদের। তাহলে নিষাদরা বসে থাকল কোথায় ?'

নাতির এই সহজ-সরল কথা শুনে উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন অনোমদর্শী। দাদুর উচ্চহাস্য শুনে একলব্য একটু বিব্রত হলো। সে ভেবে পাচ্ছে না তার কথার মধ্যে এমন কী রম্যতা আছে যে, দাদু উচ্চহাস্যে গড়িয়ে পড়লেন।

এই সময় অনোমদর্শী বলে উঠলেন, 'আরে দাদু, এই বসে থাকা মানে সেই বসে থাকা নয়। এই বসে থাকার অন্য একটা মানে আছে।'

'কী মানে ?' আবার সহজ-সরল প্রশ্ন একলব্যের।

'পৃথিবীর প্রথম রাজা ছিলেন বেণ। বেণের পিতার নাম অঙ্গ। অঙ্গ বিয়ে করেন মৃত্যুর অধিপতি যমের কন্যা সুনীথাকে। এই সুনীথার গর্ভেই জন্মায় বেণ। বেণ যখন উপযুক্ত হলেন, ঋষিরা তাঁকে রাজা হিসেবে অভিষিক্ত করলেন। কিন্তু বেণ সুশাসক ছিলেন না। অনেক ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় তিনি প্রচণ্ড অত্যাচারী হয়ে উঠলেন।' ধীরে ধীরে বললেন অনোমদর্শী।

একলব্য বলে উঠল, 'কেন, কেন দাদু ? পৃথিবীর প্রথম রাজা তিনি! পুরো ব্যাপারটা কত সম্মানের! তাঁর তো সুশাসক হওয়ারই কথা!'

'ওই যে কথায় বলে—ক্ষমতা মানুষকে মহৎ যেমন করে আবার নীচও করে। ক্ষমতা বেণকে দ্বিতীয়টাই করেছিল। যত বেশি ক্ষমতাবান হলেন বেণ, তত বেশি নীচতা আর হীনতায় ভরে গেল তাঁর মন। রাজা হওয়ার পর তিনি আদেশ দিলেন—তাঁর রাজ্যে কোনো দেবদেবীর পুজো করা চলবে না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ঈশ্বর বলে কেউ নেই। ঈশ্বর যদি মানতেই হয়, তাহলে আমাকেই ভগবান বলে মানবে। পুজো দেবে আমার উদ্দেশে। রাজা মানে ঈশ্বর। তাই তোমরা পুজো-অর্চনা যা কিছু কোরো, আমার মূর্তির সামনেই করবে। অন্য কোনো দেবদেবীর সামনে নয়।'

'তার পর দাদু ?'

'তার পর রাজ্যের সবাই ক্ষেপে গেল। একজোট হয়ে আক্রমণ করল রাজাকে। রাজা নিহত হলেন।' অনোমদর্শী বললেন।

খুব চিন্তিত মুখে একলব্য জিজ্ঞেস করল, 'রাজা বেণের কোনো সন্তান ছিলেন না ?'

'সেখানেই তো গল্পের মূল রহস্য। নিহত হওয়ার আগে আগে বেণ দু'জন পুত্রসন্তানের জনক হলেন। একজন খর্বমুখ এবং হ্রস্বকায়। অন্যজন অপূর্ব সুন্দর। দীর্ঘদেহী এই পুত্রের চেহারা বড়ই মনোহর। দ্বিতীয় জনের নাম পৃথ্বী, মানে পৃথিবী। প্রথমজনের নাম কী জানো ?'

একলব্য ডানে বাঁয়ে মাথা নেড়ে বলল, 'না।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'প্রথম পুত্রের নাম নিষীদ। মানে বসে থাকো। বসেই থাকতে বলা হলো প্রথম পুত্রকে। বলা হলো—অধার্মিক বেণের পাপের অংশ তুমি। এই রাজ্যে তোমার কিছুই করার নেই। তোমার এক স্থানে বসে থাকা কর্তব্য। নড়াচড়া কোরো না তুমি।'

'আর দ্বিতীয় সন্তান ?'

'পৃথ্বীর চেহারা তো অতি মনোহর। গায়ের রঙও স্বর্গীয়। সুতরাং পৃথ্বী কখনো বেণের পাপাংশজাত নয়—বললেন ঋষিরা। তাঁরা পৃথ্বীর পক্ষে আরও মজার যুক্তি দিলেন। বললেন, নিষীদের জন্মের পর বেণের পাপ ক্ষয় হয়ে গেছে। সুতরাং বেণের পাপবিহীন শরীর থেকে জাতপুত্র পৃথ্বী নিষ্পাপ। তাই তাঁকে এই পৃথিবীর রাজা বানানো হোক। এবং তাই করলেন ঋষিরা। ঋষিরা যাঁকে সমর্থন করলেন, প্রজারাও তাঁকে মেনে নিলেন।' বললেন অনোমদর্শী।

'আর নিষীদের কী অবস্থা হলো ?' গভীর আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল একলব্য।

অনোমদর্শী বললেন—আর কী হবে! বসিয়েই রাখা হলো তাঁকে। তাঁকে সম্মান দেওয়া হলো না। বড়ভাই হওয়া সত্ত্বেও রাজত্ব দেওয়া হলো না। তাঁকে বলা হলো—পৃথ্বীর রাজধানীতে তুমি থাকতে পারবে না। আমি কোথায় যাব—অসহায় চোখে জিজ্ঞেস করলেন নিষীদ। ঋষিরা করুণায় বিগলিত হয়ে বললেন—আহা! তোমাকে তো আমরা আর ফেলে দিতে পারি না। হাজার হলেও এই ভারতবর্ষের প্রথম রাজা বেণের জ্যেষ্ঠপুত্র আর আমাদের বর্তমান নৃপতি পৃথ্বীর ভাই তো তুমি। তুমি খর্বাকৃতি। মুখটা তোমার মানুষের মতো নয়, কেমন জানি বুনো বুনো। আর তোমার গায়ের রং তো তুমি দেখতেই। তা তুমিই বলো এই রকম বিদ্‌ঘুটে চেহারা নিয়ে তোমার রাজপ্রাসাদে এমনকি রাজধানীতেও থাকা উচিত কি না ?

নিষীদকে উত্তরের সুযোগ না দিয়ে ঋষিরা ত্বরিত বলে উঠলেন—থাকা উচিত নয়। এই তো বলবে তুমি। কী আশ্চর্য, দেখো তো তোমার ভাবনার সঙ্গে আমাদের ভাবনাটা কী অদ্ভুতভাবে মিলে গেল! তারপর ঋষিপ্রধান টিকলিতে তাঁর ডান হাতের তালুটা আলতো করে বুলিয়ে বললেন—সবচাইতে মঙ্গল হয় এই প্রাসাদ ছেড়ে, এই রাজধানী ছেড়ে তুমি অন্যত্র চলে গেলে। কোথায় যাব আমি ? কোন অজানা জায়গায় যাব আমি পিতৃরাজ্য ছেড়ে—বিষণ্ন চোখে জিজ্ঞেস করেছিলেন নিষীদ। ঋষিপ্রধান বলেছিলেন—আরে, তুমি এত বিষণ্ন হচ্ছ কেন ? তোমার মঙ্গলামঙ্গলের কথা কি আমরা ভাবি না! অবশ্যই ভাবি। ভাবি বলেই তোমার গন্তব্য ঠিক করে রেখেছি আমরা।

গন্তব্য! অসহায় নিষীদ বলেছিলেন। হ্যাঁ, গন্তব্য। এখন থেকে তুমি থাকবে ওইখানে। দিগন্তের দিকে তর্জনী উঁচিয়ে বলেছিলেন ঋষিপ্রধান। ওই যে দেখছ বিন্ধ্যপর্বতের শৈলভূমি। ওখানেই থাকবে তুমি। ওটা তো রাজধানীর বাইরে অরণ্যময় শ্বাপদসংকুল জায়গা, ওখানে জীবন কাটাব কী করে আমি! আমরা নিরুপায়। তোমার মতো হীন চেহারার একজন মানুষ এই রাজধানীতে থাকতে পারবে না। এই রাজ্যের প্রতি আমাদের একটা ইতিকর্তব্য আছে। সেই দায়িত্ববোধ থেকেই বলছি—তোমাকে এই রাজ্যে থাকতে দিতে পারি না আমরা। তোমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিষীদ বললেন, আপনার প্রথমে বললেন রাজধানীতে থাকতে পারব না, এখন বলছেন দেশেই থাকতে পারব না। আরে বেটা, মুখে মুখে এত তর্ক করছ কেন ? প্রাণে তো মারছি না তোমাকে। তোমার বাবাকে যেমন করে নিধন করেছি। তেমন করে তো তোমাকে হত্যা করছি না আমরা। বাঁচিয়ে তো রাখছি। এজন্য তোমার তো আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। বলো, উচিত কি-না ? ঋষিদের মারমুখী চেহারা দেখে নিষীদ বলেছিলেন—উচিত। তাহলে কালই তুমি দেশত্যাগ করবে। চলে যাবে বিন্ধ্যপর্বতের শৈলভূমিতে। আর হ্যাঁ, ওখানেই মানাবে ভালো তোমাকে।

শেষে অনোমদর্শী জিজ্ঞেস করলেন, 'কে এই নিষীদ জানো একলব্য ?'

একলব্য এতক্ষণ ঘোরের মধ্যে ছিল। দাদুর মুখে নিজের নাম শুনে সংবিতে ফিরল একলব্য। মুখে বলল, 'জানি না। এই নিষীদের ভিন্ন কোনো পরিচয় আছে নাকি দাদু ?'

কোনো ভূমিকা না করে অনোমদর্শী বললেন, 'এই নিষীদ আমাদের পূর্বপুরুষ। তাঁর নিষীদ নাম থেকে নিষাদগোষ্ঠীর সৃষ্টি। আমাদের প্রণম্য তিনি।' বলে কপালে হাত ঠেকিয়েছিলেন দাদু।

হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল একলব্য। তার কথা শুনে দাদু যেমন করে সেদিন হেসে উঠেছিলেন। হস্তিনাপুরের দিকে হাঁটতে হাঁটতেই হেসে উঠল একলব্য। এই নিষীদই তাহলে তাদের পূর্বপুরুষ। খর্বাকৃতি, অসুন্দর চেহারার মানুষটির মাধ্যমেই তাহলে নিষাদগোষ্ঠীর সূচনা হয়েছে এই পৃথিবীতে। হাঁটতে হাঁটতে ভাবছে একলব্য—সেই ফর্সা চেহারার পৃথ্বী বা আর্যরা, ঋষিরা এটা কি কখনো ভেবেছেন নিষাদ নামের জনগোষ্ঠী মানবসভ্যতার সমবয়সী ? যতই হেলা-অবহেলা দেখান না কেন আর্যরা, এটা তো আজ সর্বজনস্বীকৃত সত্য যে, নিষাদদের অস্তিত্ব অস্বীকার করার কোনোই উপায় নেই। আর্যদের মতো তারাও ভারতবর্ষের নানা অংশে রাজত্ব করছে। ওদের মতো তাদেরও শিক্ষা-সংস্কৃতি আছে। ভাববার জন্য উন্নত মস্তিষ্ক আছে, ভালোবাসবার জন্য হৃদয় আছে, যুদ্ধ করার জন্য দৈহিক বল আছে। কঠিন সমরে অস্ত্রধারণের দক্ষতা আছে তাদের। হ্যাঁ, হয়তো ওদের মতো অস্ত্রকৌশল এখনো তাদের জানা হয়ে ওঠে নি। সেই ঘাটতি পূরণের জন্যই তো সে দ্রোণাচার্যের কাছে যাচ্ছে। তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা পেলে নিষাদগোষ্ঠীর অনেক খামতি মিটিয়ে দিতে পারবে সে। আর্যদের মতো নিষাদদেরও নাম খ্যাতকীর্তি ধনুর্ধরের নামের তালিকায় লিপিবদ্ধ হবে।

'এই দেখো দেখো। কী অদ্ভুতুড়ে চেহারা না ? একেবারে রাজপথের মধ্যিখান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। বর্বর বলেই মনে হচ্ছে।' অপরিচিত কণ্ঠ শুনে একলব্যের ভাবনার তার ছিঁড়ে গেল।

কখন এবড়েখেবড়ো পাহাড়ি পথ শেষ হয়ে গেছে, কখন অরণ্য ছেড়ে বৃক্ষহীন সমতলভূমিতে চলে এসেছে, খেয়াল করে নি একলব্য। নিষীদের কথা ভাবতে ভাবতে, দাদুর গল্পকথা চিন্তা করতে করতে, সর্বোপরি কৌশলী অস্ত্রবিদ হওয়ার স্বপ্ন দেখতে দেখতে এতটা বন্ধুর পথ অতিক্রম করে এসেছে সে। তার পায়ের তলার মাটি কখন সমতল হয়ে


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেছে, মাথার ওপর থেকে বৃক্ষের নিবিড় আচ্ছাদন কখন শেষ হয়ে গেছে, নারীকণ্ঠটি তার কানে না পৌঁছালে বুঝতেই পারত না একলব্য।

কণ্ঠটি তাকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনল। প্রথমেই সে রাজপথের মধ্যখান থেকে কিনারায় সরে এল। রাজপথের মাঝখান দিয়ে যে হাঁটতে নেই—সেটা একলব্য সঠিকভাবেই জানে। ও যে রাজার ছেলে। নিষাদ রাজ্যের রাজধানীতেও রাজপথ আছে। শুধু রাজধানীতে কেন, রাজধানীলগ্ন স্থানগুলোতে ঝকঝকে সমতল রাজপথ আছে। ভাবনার ঘোরে আবৃত ছিল বলে রাজপথের মাঝখানে হাঁটার ভুলটা করে ফেলেছে সে। রাজপথ দিয়ে রাজা-রাজন্য-রাজপরিবারবর্গ যাতায়াত করবেন, সাধারণ মানুষ চলাচল করবে কিনারা ঘেঁষে—এই তো নিয়ম। রাজপুত্র হিসেবে একলব্যের এই প্রথা না জানার কথা নয়। নারীটির অভিযোগ শুনে দ্রুত নিজের চলার পথকে সংশোধন করে নিল।

তারপর বক্তার দিকে তাকাল একলব্য। দেখল, দুজন নারী গা ঘেঁষাঘেঁষি করে হেঁটে যাচ্ছে। মধ্যবয়সি তারা। বসনভূষণ দেখে অনুমান করা কঠিন নয় যে, ওরা নিম্নবিত্তের মানুষ। দু'জনের মাথাতেই ঝাঁকা। সেই ঝাঁকাতে ভারী কিছু। ঝাঁকার ভারে কুঁজো হয়ে হাঁটছে তারা।

হ্যাঁ, তার চেহারা, পোশাক কিছুটা অদ্ভুতুড়ে তো বটেই। তার চেহারা কালো। মধ্যমাকৃতি তার। শারীরিক গঠন ক্ষত্রিয়দের মতো তো নয়ই। তা ছাড়া কত দিন আগে পথ হাঁটা শুরু করেছে সে! কত দিন হলো ? তা তো ঠিকঠাক মনে নেই এখন। দশ দিন, বিশ দিন, এমনকি ত্রিশ দিনও হতে পারে। হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে দিনের হিসেব, রাতের গণনা ভুলে গেছে একলব্য। এই দীর্ঘদিনের পথচলাতে কত রকমের ধুলোবালি তার চেহারায় পড়েছে। কখনো স্নান করেছে, কোনো কোনো দিন জলাভাবে স্নানই করতে পারে নি। তার চেহারায় যে ঔজ্জ্বল্য ছিল, তা এখন আর নেই। ধূলিমলিন চেহারা এখন তার। তার সারা মুখমণ্ডলে বিষণ্নতাও যে নেই, এমন তো নয়। অনাহার, অর্ধাহার আর দীর্ঘদিন পাহাড়ি বন্ধুর পথচলার ক্লান্তি তার শরীর ঘিরে।

মাঝেমধ্যে অবসাদ তাকে কাহিল করে নি, বললে ভুল হবে। গুরুদর্শন তার সুখকর হবে কি না—এই ভাবনায় একলব্য মাঝে মাঝে আকুল হয়েছে। এই আকুলতা তাকে অবসাদগ্রস্ত করেছে। কিন্তু একলব্য যে অন্য ধাতুতে গড়া। কোনো বিষণ্নতা বা অবসাদ তাকে গ্রাস করতে পারে নি। মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে সে সব কিছুকে। কিন্তু মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলে কী হবে, দেহ থেকে তো ফেলে দিতে পারে নি। বিষণ্নতা আর অবসাদ তার চোখেমুখে গভীর ছাপ ফেলতে সক্ষম হয়েছে। তাই তার চেহারা এই মুহূর্তে অদ্ভুতুড়ে হওয়া স্বাভাবিক। হয়েছেও তা-ই। তাই নারীটির কথায় রাগ করার কোনো কারণ নেই।

কিন্তু ওরা বর্বর বলল কেন তাকে ? বর্বর কথার মানে তো অসভ্য জাতি। অমার্জিত, অশিষ্ট, পশুত্বব্যঞ্জনাও তো বোঝায় শব্দটি দিয়ে। তাকে দেখে কি অমার্জিত মনে হচ্ছে ? পশুর মতো লাগছে তাকে ? তার চেহারায়, তার দেহসংগঠনে, তার চলনভঙ্গিতে অসভ্যতার


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কী চিহ্ন আছে ? তার মুখমণ্ডল শ্মশ্রুমণ্ডিত। বিশ বছরের যুবকের মুখে পাতলা দাড়িগোঁফ। থাকতেই পারে। আর্যসমাজে শ্মশ্রু তো স্বীকৃত। মুনিঋষিরা দাড়িগোঁফ রাখেন। এমনকি অনেক রাজা-রাজপুত্রও দাড়িগোঁফ রাখেন। এটা ঋষিত্বের এবং উচ্চ বংশমর্যাদার চিহ্ন। কই তাঁদের তো কেউ বর্বর বলে না! তাহলে তাকে কেন বর্বর বলল নারীটি ? গায়ের রঙই কি দায়ী এজন্য ? বুঝে উঠতে পারছে না একলব্য।

নারী দুজন তার একটু আগে আগে চলছে। একলব্যের ভেতরের অগ্নিসম ক্রোধ ঘূর্ণিত হতে হতে মস্তিষ্কের দিকে ধাবমান হলো। আক্রোশে সে ফেটে পড়তে চাইল। কিন্তু তার ভেতরের আরেকজন একলব্য বলে উঠল—শান্ত হও একলব্য। ক্রোধকে দমন কোরো। ক্রোধ তোমাকে আদর্শচ্যুত করবে। গন্তব্য থেকে ছিটকে পড়বে তুমি। তোমার অমৃতপ্রাপ্তি হবে না। গুরুদর্শন থেকে বঞ্চিত হবে তুমি। এই নারীরা আর্য শ্রেণিভুক্ত। তুমি অনার্য। ওরা নারী, তুমি পুরুষ। তুমি যদি রাগান্বিত হয়ে ওদের মন্তব্যের কৈফিয়ত চাও, তাহলে একটা গণ্ডগোল লাগবে। তুমি যে আর্যগোষ্ঠীভুক্ত নও, তা তো ওরা বুঝে গেছে। তুমি যদি কৈফিয়ত চাও, স্বভাবগুণে ওরা তোমার সঙ্গে কোন্দল বাধাবে। পেরে উঠবে না তুমি তাদের সঙ্গে। উষ্ণ কথোপকথন শুনে পথের মানুষ জড়ো হবে। নারীদের পক্ষ নেবে ওরা। নারীদের অপমান করার অজুহাত দেখিয়ে প্রহরীদের খবর দেবে। প্রহরীরা বন্দি করে রাজবিচারের মুখোমুখি করবে তোমায়। দণ্ডিত হবে তুমি। কারাগারে নিক্ষেপিত হবে তুমি একলব্য। তোমার দ্রোণাচার্য দর্শন, তোমার অস্ত্রশিক্ষা—সবকিছুরই জলাঞ্জলি হবে। সুতরাং সাবধান একলব্য। মাথা ঠান্ডা রাখো। হাঁটতে থাকো গন্তব্যের উদ্দেশে।

একলব্যের মন শান্ত হয়ে এল। ক্রোধ তাকে ত্যাগ করল। প্রাপ্তির আগাম প্রশান্তিতে তার দেহমন ভরে গেল। নারীদের দিকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল একলব্য। জিজ্ঞেস করল, 'হস্তিনাপুর আর কতদূর ?'

পূর্বে মন্তব্যকারী নারীটি বলল, 'হস্তিনাপুর দিয়ে কী হবে ? ওখানে রাজা থাকেন, রাজন্য থাকেন। আর থাকে আর্যরা। তুমি হস্তিনাপুর গিয়ে কী করবে ?'

'আহা সুশীলা, তুমি এত বাঁকা কথা বলছ কেন ছেলেটির সঙ্গে ? প্রথমেও ওকে দেখে তুমি বাজে মন্তব্য করেছ। এখন ছেলেটা হস্তিনাপুরের সন্ধান চাইছে, তুমি তাকে অপমান করছ। এটা ঠিক নয় সুশীলা।' দ্বিতীয় নারীটি বলল।

সুশীলা গালে ডান হাত ছুঁইয়ে বলল, 'অ ভগবান! আমি আবার কী অপমান করলাম ওকে ? চেনা নেই, জানা নেই, সহসাই ওর পক্ষ নিয়ে কথা বলছ দিদি ?'

দিদি বলল, 'পক্ষবিপক্ষের কথা নয়, মান-অপমানের কথা বলছি। যাক গে, তা বাছা, তুমি কি কুরুরাজ্যের নও ?'

'না মাসি। আমি নিষাদরাজ্য থেকে এসেছি।' শান্ত কণ্ঠে একলব্য বলল।

'তা-ই বলো। আমার অনুমান ঠিক। আমি ভেবেছি, বাইরের কোনো দেশের তুমি। কুরুপ্রজা হলে তো হস্তিনাপুরের পথঘাট চিনতে তুমি।' দিদি মমতাভরা গলায় বলল। একটা ঢোঁক গিলে দিদি আবার বলল, 'তা কী জন্য যাচ্ছ তুমি রাজধানীতে ?'


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তা বলা যাবে না মাসি। আপনি শুধু আমাকে পথের সন্ধান দিন।'

'ও আচ্ছা বাছা।' বলে থমকে দাঁড়াল দিদি। তার দেখাদেখি সুশীলাও। তারপর বাম হাতের তর্জনী উঁচিয়ে বলল, 'এই যে রাজপথটা সোজা চলে গেছে, গঙ্গাপারে গিয়ে তা থেমেছে। গঙ্গা পার হলেই আবার রাজপথ। তবে সে পথ এ পথের মতো মলিন নয়। অনেক বড়, অনেক সুন্দর হস্তিনাপুরের রাজপথ। তুমি বোধহয় বুঝে গেছ, গঙ্গা পেরোলেই হস্তিনাপুর। মানে আমাদের রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাজধানী।'

হঠাৎ নিজের অজান্তে একলব্যের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'আর গুরু দ্রোণের আশ্রম ?'

'কী বললে বাছা ? বুঝতে পারলাম না।' দিদি বলল।

একলব্য দ্রুত বুঝে গেল—সে ভুল জনকে প্রশ্ন করে ফেলেছে। এরা খেটে খাওয়া সাধারণ নারী। এরা কীভাবে জানবেন দ্রোণাচার্যের আশ্রমের সন্ধান ? রাজার নাম জানা স্বাভাবিক। পিতামহ ভীষ্মের নামও জানতে পারেন। কিন্তু বহিরাগত একজন অস্ত্রগুরুর নাম তো ওঁদের জানার কথা নয়। তাই তাড়াতাড়ি একলব্য বলে উঠল, 'ঠিক আছে মাসি। আর কিছু জানতে চাই না।' বলে হাত জোড় করে দুই নারীকে প্রণাম জানাল একলব্য। তারপর দ্রুত পায়ে হাঁটা শুরু করল। তাকে যে অনেক দূর যেতে হবে। সূর্য ডোবার আগে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হতে হবে তাকে।

সূর্যাস্তের সামান্য আগে একলব্য গঙ্গানদীর পশ্চিম তীরে পৌঁছাল। নদীর পূর্বপার থেকেই রাজধানীর শুরু। পশ্চিম তীরে বনভূমি। শ্রমজীবী মানুষের বসবাস এ তীরে। এখানে-ওখানে ফসলি ক্ষেত। খেটে খাওয়া মানুষরা নানা কৃষিজদ্রব্য নিয়ে রাজধানীতে চলে যায়। বেচাকেনা শেষ করে শ্রমজীবী কৃষিজীবী এই মানুষরা পশ্চিম তীরে ফিরে আসে।

পশ্চিম তীর থেকে শেষ খেয়াটি ছেড়ে যাচ্ছে তখন। মাঝি হাঁক দিচ্ছে, 'শেষ খেয়া চলে যাচ্ছে ওপারে। এরপর আর খেয়া নেই। যেতে না পারলে এপারেই রাত কাটাতে হবে বাপুরা। যারা যাবেন চলে আসুন চটজলদি। নৌকা ছেড়ে দিলাম বলে।'

মানুষরা নৌকায় উঠে বসতে লাগল। নৌকার খোল ভরে উঠতে লাগল নারী-পুরুষে। ঠেলেঠুলে পনেরো-বিশজন ধরে নৌকায়। কিছুক্ষণ পর সুশীলা আর তার দিদিও নৌকায় উঠে বসল। একলব্যও তো ওপারে যাবে। পার বেয়ে ধীরে ধীরে নৌকার কাছে নেমে এল সে। যেই নৌকায় উঠতে যাবে, অমনি হাঁক দিল মাঝি, 'ওই ব্যাটা, পারানি আছে তো কোঁচড়ে!'

ভীষণ চমকে মাঝির দিকে তাকাল একলব্য। পারানি ? পারানি তো নেই তার কাছে! মূল্যবান যা কিছু তার কাছে ছিল সবই তো সৈন্যসামন্তদের বিলিয়ে দিয়ে এসেছে। এখন দু'প্রস্থ কাপড়, একটি শরভর্তি তূণ, একটা ধনুক, আরেকটা টাঙ্গিই তার সম্বল। কোনো কড়ি তো তার কাছে নেই।

মাঝির প্রশ্নের উত্তরে একলব্য ডানে-বাঁয়ে মাথা নেড়ে নিচু স্বরে বলল, 'পারানি তো নেই আমার কাছে।'


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'দূরে যাও, দূরে যাও। নৌকায় উঠো না তাহলে।' শ্লেষ মেশানো কণ্ঠে মাঝি বলল।

'ওপারে যাওয়া যে আমার খুবই দরকার।'

'তোমার দরকার তাতে আমার কী ? আমি কি দানছত্র খুলে বসেছি এই ঘাটে ?'

'পথে যে কড়ি লাগবে জানতাম না। আমাকে ওপারে যেতেই হবে দাদা।'

'দাদা! আরে, দাদা ডাকছ কাকে ? দেখে তো মনে হচ্ছে অরণ্যচারী। শবর, ব্যাধ বা ডোম। আমি আর্য। তোমার সঙ্গে আমার আবার দাদার সম্পর্ক তৈরি হলো কবে ? যাও যাও, দূরে যাও।'

'তাহলে কীভাবে আমি ওপারে পৌঁছাব ?'

'কেন ? সাঁতরে পার হবে! ও—, তুমি আবার সাঁতরে পার হবে কীভাবে ? থাকো তো পাহাড়ে-পর্বতে। সেখানে নদী-জলাশয় কোথায় ?'

'আমাদের দেশে নদী আছে, সরোবরও আছে।'

'এই দেখো, মুখে মুখে আবার তর্ক করছে। হাতে নাই আধা কড়ি, মুখে বড় বড় কথা।'

এই সময় সুশীলা কথা বলে উঠল, 'মাঝির পো, তুমি ছেলেটাকে ওভাবে অপমান করছ কেন ? সবাই তো কড়ি দেব, একজন না দিলে কী এমন ক্ষতি হবে তোমার ?' পূর্বতন অপরাধবোধের তাগিদে কথাগুলো বলল সুশীলা।

সুশীলারা নিত্য পারাপার করে এই ঘাট দিয়ে। মাঝির চেনা-জানা তারা। সুশীলার কথা শুনে একটু থমকে গেল মাঝি। নরম সুরে বলল, 'এই দিয়েই তো আমার সংসার চলে সুশীলাদি। ঘরে গণ্ডা গণ্ডা ছেলেপুলে।' দীর্ঘ একটা শ্বাস বেরিয়ে এল মাঝির বুক চিড়ে।

'আচ্ছা আচ্ছা, তোমাকে এত হা-পিত্যেশ করতে হবে না। ওর পারানিটা আমিই দেব। ওকে নৌকায় তুলে নাও তো দাদা।' বলে একলব্যের দিকে একবার তাকাল সুশীলা।

মাঝি একলব্যকে নৌকায় তুলে নিল। নৌকা চলতে শুরু করল। আবছা আঁধারে নদীবুক অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। মাথা নিচু করে নৌকার পেছন গলুইয়ের দিকে চুপটি করে বসে আছে একলব্য। ভাবছে—যে নারীটি প্রথমে তাকে এমনভাবে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করলেন, তিনিই বিপদে সাহায্যের হাত বাড়ালেন তার দিকে। কী অদ্ভুত না ? এককালের শত্রু, চিরকালের শত্রু নয়। যে নারীটি এককালে তার সঙ্গে শত্রুর মতো আচরণ করেছেন, সেই নারীটিই মিত্র হয়ে বিপদে তার পাশে এসে দাঁড়ালেন। কৃতজ্ঞতায় তার চোখ ভিজে আসতে চাইল। গায়ে জড়ানো কাপড় দিয়ে দু'চোখের কোণা মুছে নিল একলব্য। তারপর সুশীলার দিকে তাকাল। কিন্তু তার দৃষ্টি সুশীলা পর্যন্ত পৌঁছাল না। গঙ্গাবক্ষের সমস্ত কিছু তখন অন্ধকারে ঢেকে গেছে। শুধু শোনা যাচ্ছে দাঁড়ের ছলাৎছল শব্দ।

পূর্বপারে রাতটা কাটিয়ে দিল একলব্য। নৌকা কূলে ভিড়লে সবাই যে যার মতো করে চলে গেল। সুশীলারা বসেছিলেন আগার দিকে, একলব্য পেছনের দিকে। কূলে নেমে একলব্য অনেক খুঁজল সুশীলাদের। কিন্তু পেল না। আগেই ভাড়া মিটিয়ে নৌকা থেকে নেমে গেছে


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা। হয়তো তাদের গন্তব্য অনেক দূরে অথবা তার মুখোমুখি হয়ে তাকে লজ্জায় ফেলতে চায় নি বলে সুশীলারা দ্রুত স্থান ত্যাগ করেছে।

সবাই চলে গেলে চারদিক শুনশান হয়ে গেল, মাঝিও খুঁটিতে নৌকাটি বেঁধে চলে গেল বাড়িতে। শুধু পড়ে থাকল বিস্তৃত শানবাঁধানো ঘাট। এই নির্জন জায়গাটি আগামীকাল প্রত্যুষে হয়তো আবার জনকোলাহলময় হয়ে উঠবে।

পথ অচেনা, স্থান অজানা, গন্তব্য অচিহ্নিত। কোথায় যাবে এখন একলব্য ? ঠিক করল—শানবাঁধানো ঘাটেই শয্যা পাতবে সে। উর্ধ্বাঙ্গের কাপড়টি বিছিয়ে শুয়ে পড়ল একলব্য। সে ক্ষুধার্ত। কিন্তু সারা দিনের ক্লান্তিতে শরীরটা ভেঙে যাচ্ছে তার। তাই শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল সে।

বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রবীণ-প্রবীণা আর মুনিঋষিদের মন্ত্রধ্বনিতে ঘুম ভেঙে গেল একলব্যের। চোখ মেলে দেখল—পৃথিবীর বুক থেকে সবেমাত্র আঁধার কাটতে শুরু করেছে। দূর-অরণ্য থেকে পাখিরা উড়াল দিয়েছে। আকাশ বেয়ে এদিক-ওদিক উড়ে যাচ্ছে তারা।

শোয়া থেকে উঠে বসল একলব্য। ক্ষুধা নিয়ে ঘুমিয়েছিল। কিন্তু কী আশ্চর্য, এখন তার কোনো ক্ষুধাই লাগছে না। গভীর ঘুমের কারণে তার দেহ এই মুহূর্তে ক্ষুধাবিযুক্ত হয়ে গেছে বলে, না কাঙ্ক্ষিত স্থানে আসতে পারার আনন্দে তার মনপ্রাণ ভরে আছে বলে ? বুঝতে পারছে না একলব্য।

এবার বিশাল বিস্তৃত গঙ্গাঘাটের দিকে দৃষ্টি ফেরাল সে। দেখল—শত শত পুণ্যার্থী গঙ্গাজলে নেমেছে। কেউ স্নানের উদ্যোগ নিচ্ছে, কেউ স্নান সেরে বুকজলে দাঁড়িয়ে পূর্বমুখী হয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করছে। কেউবা স্নান আর মন্ত্রপাঠ শেষ করে ভিজে কাপড়ে সিঁড়ি ভেঙে পারের দিকে উঠে আসছে। কোনো কোলাহল নেই; নেই কোনো হইচই। শুধু গম্ভীর একটা মন্ত্রধ্বনি মৃদুলয়ে ধ্বনিত হচ্ছে। ফলে গঙ্গাঘাটকে ঘিরে অপূর্ব এক স্নিগ্ধ বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। ধীরলয়ে সঞ্চরমান মানুষগুলোকে মানুষ বলে মনে হচ্ছে না একলব্যের। তারা যেন স্বর্গীয় কেউ।

একটা অপার্থিব সৌরভে একলব্যের মনটা ভরে উঠল। এতদিনের পথচলার কষ্ট, অনাহার-অর্ধাহারের যন্ত্রণা, ঐশ্বর্যবিচ্ছিন্ন হয়ে কৃচ্ছ্র সাধনের ক্লান্তি নিমিষেই উধাও হয়ে গেল তার দেহমন থেকে। একটা ঘোরের মধ্যে সেও নেমে গেল গঙ্গাজলে। তার হঠাৎ মনে পড়ল—গত তিন-চার দিন সে স্নান করে নি। ঐকান্তিক নিষ্ঠায় সে হস্তিনাপুরের দিকে শুধু হেঁটেছে।

ঝাঁপিয়ে স্নান করল সে। ডুব দিয়ে, দূরে কাছে সাঁতার কেটে, জলে তুমুল দাপিয়ে কাটাল অনেকক্ষণ। গঙ্গাজল স্পর্শে তার দেহ শীতল হলো, মন শান্ত হলো। আর্যদের মতো তার ধর্মে সেরকম কোনো মন্ত্র নেই জলপূজার বা সূর্য প্রণামের। তাই ঈশ্বরের প্রতি নিবিড় একটা প্রণাম জানিয়ে জল থেকে উঠে এল একলব্য। ভিজা বসনেই থাকল সে। তীর-ধনুকে সজ্জিত হলো পূর্বের মতো। ততক্ষণে পুবাকাশে সূর্য উঠে গেছে অনেকদূর।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবার ক্ষুধা চাগিয়ে উঠল একলব্যের। ধীর পায়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল সে। একটু দূরে মলিন বসনের দরিদ্র মানুষরা কলাপাতায় কী যেন খাচ্ছে সারিবদ্ধভাবে বসে। ধনী লোকেরা দরিদ্র মানুষদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করছে। একলব্য কোনো দ্বিধা না করে সারির একপ্রান্তে বসে পড়ল। উদর পূর্তি করে খেল সে।

তারপর রওনা দিল দ্রোণাচার্যের অস্ত্রাশ্রমের দিকে। যাত্রা শুরুর আগে এক বয়োবৃদ্ধের কাছ থেকে জেনে নিয়েছে আচার্যের আশ্রমে যাওয়ার অন্ধিসন্ধি।

ধৃতরাষ্ট্রের রাজপ্রাসাদ থেকে ক্রোশ সাতেক দূরে আচার্য দ্রোণের অস্ত্র পাঠশালা। শিষ্যদের একাগ্রতা দরকার, দরকার কষ্টসহিষ্ণুতা। প্রাসাদসংলগ্ন থাকলে ছাত্রদের একাগ্রতা নষ্ট হবে। একনিষ্ঠ না হলে অস্ত্রবিদ্যা অর্জন যথার্থ হবে না। তাই দ্রোণাচার্যের আশ্রম লোকালয়বিচ্ছিন্ন, প্রাসাদের তদারকিবিযুক্ত। শুধু তা-ই নয়, ধনাঢ্যের ঐশ্বর্য যাতে ছাত্রদের কাছ ঘেঁষতে না পারে সেদিকেও কড়া নজর রেখেছেন গুরুদেব। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মতো কঠোরতা এখানে। বিলাসিতা নেই, মাত্রাতিরিক্ত আহার করার সুযোগ নেই, দুগ্ধফেননিভ শয্যায় ঘুমানোর কোনো ব্যবস্থা নেই। একটা বড় ধরনের কক্ষে সবাই সারিবদ্ধভাবে সাধারণ মানের শয্যায় ঘুমায়। অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ ও রাত্রির নির্ধারিত প্রহরে ঘুমাতে যেতে হয় তাদের।

আশ্রমের উত্তর দিক ঘেঁষে অরণ্যের শুরু। এই অরণ্য ধীরে ধীরে গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে। স্থানক্রমে বিশাল বৃক্ষের সংখ্যা বেড়েছে। লতাগুল্মের আধিক্যে ভেতরের দিকের অরণ্য দুরধিগম্য হয়ে উঠেছে। হিংস্র শ্বাপদের সংখ্যাও কম নয় এই বনভূমিতে। এই ভূমি যে কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে, তা কেউ জানে না। কেউ জানে না বললে ভুল হবে। আচার্য দ্রোণ জানেন। কারণ দ্রুপদরাজ্য থেকে সাভিমানে তিনি যখন হস্তিনাপুরে আসেন, এই ভীষণাকার অরণ্য অতিক্রম করেই আসেন। ওই একবারই তিনি এই বনভূমি অতিক্রম করেছেন, দ্বিতীয়বার নয়। শিষ্যদের অস্ত্রজ্ঞান পরীক্ষার জন্য মাঝেমধ্যে তিনি ওই অরণ্যে প্রবেশ করেন বটে। তবে তা এক দুই বা ক্রোশ তিনেক পর্যন্ত। তার অধিক নয়। এই অরণ্যভূমির গভীরতর অংশ এমনভাবে নানা বৃক্ষ-লতায় ঢাকা যে, সূর্যের আলোও সেই অরণ্যাভ্যন্তরে যথাযথভাবে প্রবেশ করতে পারে না।

সেই সকালে গুরু দ্রোণ প্রশিক্ষণকক্ষে শিষ্যদের অর্ধবৃত্তাকারে বসিয়েছেন। তাদের সামনে যোগাসনে বসেছেন তিনি। মাথার মাঝখানে চূড়া করে চুল বাঁধা। শ্মশ্রু বক্ষ পর্যন্ত লম্বিত। গৈরিক রঙের বসন পরিধান করেছেন তিনি। ঊর্ধ্বাঙ্গ বসনবিহীন। কাঁধ বেয়ে শুভ্র পৈতে কোমর পর্যন্ত নেমে এসেছে। গৌরবর্ণ শরীর তাঁর। সেই গৌরাঙ্গে শুভ্র পৈতেটি অপূর্ব এক গাম্ভীর্য তৈরি করেছে।

আজকের শিক্ষা ব্যবহারিক নয়, মনস্তাত্ত্বিক। কোন শিষ্যের মানসিক শক্তি কী রকম, তা মাপতে বসেছেন গুরুদেব। সমরকালে যুদ্ধক্ষেত্রের এক একটা সংকটের কথা বলছেন আর ওই সময় কে কীভাবে মোকাবেলা করবে, জানতে চাইছেন। শুধু তা-ই নয়, মানুষে


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষে বা রাজায় রাজায় যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কারণও ব্যাখ্যা করছেন আচার্য। যুদ্ধের কথা এলে অস্ত্রের প্রসঙ্গ আসে। তিনি তো ধনুর্ধর। তীর-ধনুকের গঠনকৌশল, এদের প্রকারভেদ এসব কিছুর একটা পটভূমি তৈরি করছেন।

দ্রোণাচার্য কৌরব-পাণ্ডব এবং ভিনদেশের শিষ্যদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'ঋগ্বেদ সমরসাহিত্যে সমৃদ্ধ। এই বেদেই ইন্দ্রকে বজ্রধারী যুদ্ধদেবতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।'

'গুরুদেব কী কারণে মানুষ যুদ্ধে লিপ্ত হয় ?' মৃদু কণ্ঠে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞেস করে।

আচার্য বললেন, 'যথার্থ প্রশ্ন করেছ তুমি যুধিষ্ঠির। যুদ্ধ বিষয়ে জানার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের কারণ জানাও যথার্থ ছাত্রের বৈশিষ্ট্য। তোমার প্রশ্নের উত্তর যদি সংক্ষেপে দিই, তাহলে বলতে হবে আত্মসংরক্ষণ আর আত্মসমৃদ্ধির প্রয়োজনেই মানুষ যুদ্ধবিগ্রহে জড়িয়ে পড়ে। তোমাদের চেহারা দেখে আমার কথার মাহাত্ম্য যে বুঝতে পারো নি, অনুমান করছি। দাঁড়াও বুঝিয়ে বলছি।' সমবেত শিষ্যদের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে কথা শেষ করলেন দ্রোণাচার্য।

এই সময় ভীম বলে উঠল, 'যথার্থ বলেছেন গুরুদেব। আপনার কথা ঠিকঠাক বুঝতে পারি নি।'

'বুঝবে কী করে, খাদ্যদ্রব্যের কথা নেই যে গুরুদেবের কথায়!' পাশ থেকে দ্রুত বলে উঠল দুর্যোধন।

দুর্যোধনের কথা শুনে সবাই হেসে উঠল। আচার্যও না হেসে পারলেন না। তবে সে হাসি গুরুদেবসুলভ। শিষ্যদেরকে নিয়মের কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখেন তিনি। তবে মাঝে মাঝে হাস্যরসকে প্রশ্রয় দেন। হাস্য মানুষের ভেতরটাকে স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল করে তোলে। দুর্যোধনের কথায় আর শিষ্যদের হাস্যে তাই কিছু মনে করলেন না আচার্য।

গাম্ভীর্য বজায় রেখে তিনি বললেন, 'যুদ্ধের মূল কারণ লুব্ধতা—সম্পদের অপরিমিত কামনা আর অন্যের ওপর প্রভুত্ব করার অযৌক্তিক বাসনা।' তারপর তিনি কী যেন একটা ভাবলেন। তারপর বললেন, 'তোমরা এখন বড় হয়েছ। তোমাদের কাছে একটা বিষয় গোপন করা ঠিক হবে না। যুদ্ধের আরেকটা প্রধান কারণ আছে।'

শূরসেন দেশের রাজকুমার বলল, 'আচার্য, আরেকটা প্রধান কারণ কী ?'

"কোনো সুন্দরী নারীকে অধিকার করার লালসার জন্যও দুই বা বহু রাজ্যের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বাধে। 'রামায়ণে'র সীতাকাহিনি তোমাদের অজানা নয়।" বললেন আচার্য।

এরপর তিনি আরও বললেন, 'একজন যথার্থ যোদ্ধাকে আয়ুধ-বিজ্ঞান, আয়ুধ উৎপাদনের প্রযুক্তিবিদ্যা, প্রহরণ প্রয়োগ ও প্রত্যাহারের কুশলতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জন করতে হয়। একজন যোদ্ধা তখনই জয়ী হয়, যখন সে নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করে যে, সে যে-যুদ্ধটি করছে তা কোনো বৃহত্তম স্বার্থের জন্য, কোনো মহত্তর আদর্শের জন্য।' শেষের কথাটি বলতে গিয়ে তাঁর কণ্ঠ গাঢ় হয়ে এল। তিনি ইচ্ছে করেই নিজের কণ্ঠে গভীর আবেগ ঢেলে দিলেন।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৌরব-পাণ্ডব শিষ্যদের অস্ত্রকৌশলী করে গড়ে তোলার পশ্চাতে তো তাঁর গূঢ় একটা উদ্দেশ্য আছে। তা হলো—রাজা দ্রুপদকে পরাজিত করা এবং তা প্রশিক্ষিত এই ছাত্রদের দিয়েই করানো। তার জন্য দরকার শিষ্যদের আবেগায়িত করে তোলা। বিচক্ষণ দ্রোণাচার্য জানেন—শিক্ষক আবেগায়িত হলে শিষ্যরাও সহজে আবেগাপ্লুত হয়।

অর্জুন বলে উঠল, 'গুরুদেব, আপনার আদর্শ আমাদের পাথেয়, আপনার নির্দেশনা আমাদের চলার পথের মূলপাঠ।'

স্মিত হাসলেন দ্রোণ। অর্জুনের মুখে এই কথাটিই আশা করেছিলেন তিনি। কারণ তাঁর দীর্ঘদিনের সংগুপ্ত বেদনা যদি কেউ উপশম করতে পারে, তবে তা পারবে এই অর্জুন। অর্জুনই দ্রুপদকে পরাস্ত করে তাঁর পদতলে ফেলতে পারবে।

'এবার তোমাদের যুদ্ধাস্ত্র বিষয়ে ধারণা দিতে চাই। আগেও বহুবার এ বিষয়ে তোমাদের সঙ্গে কথা বলেছি আমি। তবে তা ছিল ভূমিকামাত্র। শিক্ষা গ্রহণের প্রাথমিক অবস্থা সেই সময়। তাই কঠিন কথা তোমাদের মনে রাখা দুরূহ হতো। এখন তোমরা অনেকটা পরিপক্ব। এখন আমার কথা বুঝতে তোমাদের বেগ পেতে হবে না।' দম নেওয়ার জন্য একটু থামলেন আচার্য। একাগ্র মনে আবার বলতে শুরু করলেন। সমবেত শিষ্যদের শিরদাঁড়া সোজা, চক্ষু গুরু-নিবদ্ধ, কর্ণ গুরুবচনমুখী।

আচার্য বললেন, 'চার ধরনের আয়ুধ আছে—মুক্ত, অমুক্ত, মুক্ত-অমুক্ত এবং যন্ত্রমুক্ত। যে হাতিয়ার ছুড়ে মারা যায়, তা মুক্ত আয়ুধ, হাতে ধরে রেখে যে হাতিয়ার ব্যবহার করতে হয়, তা অমুক্ত আয়ুধ। আবার মুক্ত-অমুক্ত যুদ্ধাস্ত্র হলো যা ছুড়ে মেরে বা হাতে ধরে ব্যবহার করা যায়। যেসব অস্ত্র প্রক্ষেপ করার জন্য যন্ত্রের সাহায্যের প্রয়োজন, তা যন্ত্রমুক্ত আয়ুধ। বর্তমানে যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত আয়ুধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—তীর-ধনুক, চক্র, জাঠি, জাঠা, গদা, শূল, ত্রিশূল, বর্শা, কুঠার, খড়্গ, অসি, হল্ ইত্যাদি।'

ভীম বলল, 'গদা সম্পর্কে বলুন আচার্য।'

'ভীম আমার প্রিয় শিষ্য। তার যুদ্ধাস্ত্র গদা। গদা সম্পর্কে তো প্রথমেই বলা উচিত ছিল আমার।' আচার্য বললেন।

এই সময় দ্বিতীয় সারি থেকে কঠোর কণ্ঠে দুঃশাসন বলল, 'গদা শুধু বৃকোদরের ব্যবহার্য অস্ত্র হবে কেন গুরুদেব ? আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা মহাবীর দুর্যোধনও কি গদাযুদ্ধে দক্ষ নয় ? শুধু ভীমই কি আপনার প্রিয় ছাত্র ? দাদা দুর্যোধন অর্থাৎ আমরা শত ভ্রাতারা কি আপনার প্রিয়পাত্র নই ?'

দুঃশাসনের কথা শুনে দ্রোণাচার্যের চোখের কোণায় ক্রোধ ঝিলিক দিয়ে উঠল। তবে তা ক্ষণকালের জন্য। আচার্য সংযমী পুরুষ এবং বিচক্ষণ। ক্রোধকে দ্রুত সংযত করলেন তিনি। বললেন, "গুরুর কাছে কোনো ছাত্রই অপ্রিয় নয়। তবে কেউ কেউ একটু বেশি প্রিয়। যাক, গদা সম্পর্কে বলছিলাম। গদা দু'ধরনের। শুধু লোহা দিয়ে তৈরি গদাকে জাঠা বলে। 'রামায়ণে' এই হাতিয়ারটিকে বলা হয়েছে জাঠাস্ত্র। আর কাঠ ও লোহা দিয়েও গদা তৈরি


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়। এদের আকার ভিন্ন ভিন্ন, তাদের ওজনও ভিন্ন ভিন্ন। আমাদের এই অস্ত্রাশ্রমে ভীম আর দুর্যোধনই সবচাইতে বড় আর ভারী গদা ব্যবহার করে।"

দুর্যোধনের নাম উল্লেখ করায় কৌরব-ভ্রাতারা আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। আচার্য ডান হাত উঁচিয়ে তাদের থামতে বললেন। 'আকৃতি ও প্রকৃতি অনুসারে গদার আলাদা আলাদা নাম—শেল, মুষল, মুদগর এসব।'

তারপর তিনি অনেকক্ষণ সেই কক্ষের কড়িকাঠের দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকলেন। যেন শিষ্যদের উদ্দেশে গভীর কোনো কথা বলবেন, এ জন্য নিজের মধ্যে বক্তব্যকে সাজিয়ে নিচ্ছেন। তারপর গুরুগম্ভীর গলায় বলতে শুরু করলেন, 'এই ভারতবর্ষে আমার যেটুকু সুনাম, তা ধনুর্ধর হিসেবে। আমার এই অস্ত্রাশ্রমের প্রধান পাঠ্য বিষয় তীর-ধনুক। এখন এই তীর-ধনুক বিষয়ে তোমাদের দু'চারটি কথা বলব।'

দ্রোণাচার্যের কথা শুনে অর্জুন আর অশ্বত্থামা নড়েচড়ে বসল। তারা উৎকর্ণ।

আচার্য বললেন, 'আকার অনুসারে ধনুক দু'রকম—ছোট আর বড়। তোমরা দেখবে যুদ্ধক্ষেত্রে অধিকাংশ সৈন্য ছোট ধনুক ব্যবহার করে। তবে কেউ কেউ বড় ধনুক ব্যবহার করতে স্বচ্ছন্দ বোধ করে। যেমন অর্জুন, যেমন কর্ণ। কর্ণ এখানে নেই, তারপরও বলি কর্ণও বড় ধনুক সহজেই ব্যবহার করতে পারে, যেমন পারে অর্জুনও। যোদ্ধারা সাধারণত শার্ঙ্গ ধনুক ব্যবহার করে। ছোট বলে হাতি বা ঘোড়া বা মহিষের পিঠে চড়ে এই অস্ত্র ব্যবহার করা সহজতর। বিভিন্ন প্রাণীর শৃঙ্গ দিয়ে তৈরি বলে এর নাম শার্ঙ্গ। চন্দন, বেতস, শাল, শিমুল, ধবল, অর্জুন এবং বাঁশগাছের কাণ্ড দিয়ে সাধারণত ধনুক তৈরি হয়। তবে মনে রেখো, সবচেয়ে ভালো ধনুক তৈরি হয় হেমন্ত ঋতুতে সংগৃহীত পাকা বাঁশ দিয়ে। ধনুকাভ্যাস করতে গিয়ে তোমরা তো লক্ষ করেছ—ধনুকের বিভিন্ন অংশে লোহা, পিতল ও সোনার বড়ো ছোটো পাত মুড়ে দেওয়া হয়। এই ধাতব অংশগুলো ধনুকের শক্তি ও কার্যকারিতা বাড়ায়।'

'এবার তীর সম্পর্কে কিছু বলুন পিতা।' অশ্বত্থামা বলল।

'বহু রকমের তীর আছে। তবে তীরের ফলা তৈরি হয় লোহা দিয়ে। তীরদণ্ড তৈরি হয় বাঁশ ও লোহা দিয়ে। ফলার আকৃতির ওপর তীরের নাম নির্ভর করে। যেমন সূচিমুখ, সিংহদণ্ড, বজ্রদণ্ড, অশ্বমুখ, অর্ধচন্দ্র ইত্যাদি।' বলতে বলতে হঠাৎ আচার্যের চোখ পড়ল পাঠদান কক্ষের দ্বারপ্রান্তে। তীব্র কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন, 'কে, কে ওখানে ?'

অস্পষ্ট মানুষটি একটু নড়েচড়ে দাঁড়াল। কোনো কথা বলল না।

আচার্য বিরক্ত কণ্ঠে উচ্চস্বরে আবার বললেন, 'কে দাঁড়িয়ে আছ ওখানে ? উত্তর দিচ্ছ না কেন ?'

এবার মানুষটি এক পা দু'পা করে করে দ্রোণাচার্যের দিকে এগিয়ে এল। তার জোড়হস্ত। আচার্য ভালো করে তাকালেন আগন্তুকের দিকে। দেখলেন—নিকষ কালো শরীরের এক যুবা। মেদহীন দেহ। মলিন বসন। সর্বাঙ্গ ধূলিধূসরিত।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন আচার্য। দেখলেন—তার উজ্জ্বল দুটো চোখ। মুখটা শ্রমে মলিন। তীব্র একটা ভয়ের চিহ্ন গোটা মুখাবয়বজুড়ে। দ্রোণাচার্যের নিকটে এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করল যুবাটি। করজোড়ে উঠে দাঁড়াল।

যুবকটিকে ভালো করে পরখ করার পর আচার্যের কণ্ঠ নরম হয়ে এল। কিন্তু তার পরিচয় জানার আগ্রহ কমল না। আচার্য বললেন, 'কে তুমি যুবক ? দেখে মনে হচ্ছে তুমি হস্তিনাপুরের নও। আর্যও নও তুমি।'

বিনীত কণ্ঠে যুবকটি এবার উত্তর দিল, 'আপনি যথার্থ বলেছেন গুরুদেব। আমি আর্য নই।' আচার্যের প্রশ্নের শেষাংশ থেকে উত্তর দেওয়া শুরু করল যুবকটি। বলল, 'আমি কুরুরাজ্যের অধিবাসী নই। আমার বাড়ি নিষাদরাজ্যে।' তারপর আরও মৃদুগলায় বলল, 'রাজা হিরণ্যধনু আমার পিতা। একলব্য আমার নাম।'

আচার্য পলকহীন চোখে একলব্যের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। ভেবে পাচ্ছেন না কেন একলব্য এখানে এসেছে! সে কি তাঁর কাছে এসেছে ? যদি তাঁর কাছে এসে থাকে, তাহলে আসার উদ্দেশ্য কী ? সঙ্গে তো তীর-ধনুকও দেখা যাচ্ছে। কাউকে আক্রমণ করতে আসে নি তো ? অথবা...।

ভাবনাকে অসম্পূর্ণ রেখে দ্রোণাচার্য জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে কেন এসেছ তুমি ?'

একলব্য পুনরায় মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে আচার্যকে প্রণাম করল। অত্যন্ত বিনীত কণ্ঠে বলল, 'আপনার কাছে ধনুর্বিদ্যা শিখতে এসেছি আমি। গুরুদেব, আমাকে আপনার শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করুন।'

AMARBOI.COM


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্রোণ বলিলেন তুই হোস্ নীচ জাতি।
তোরে শিক্ষা করাইলে হইবে অখ্যাতি৷

'ধনুর্বিদ্যা শিখতে এসেছ তুমি! আমার কাছে!' বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন দ্রোণাচার্য।

'হ্যাঁ গুরুদেব।' একলব্য আগের মতো জোড়হস্ত ।

'আমি কে যে তুমি আমার কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিখতে এসেছ ?' আচার্যের কথায় হেঁয়ালি।

একলব্য বিনয়ে বিগলিত হয়ে বলল, 'আপনি ভুবনবিখ্যাত। এই ভারতবর্ষে আপনার সুনাম কে না শুনেছেন! আপনি মহর্ষি পরশুরামের কাছে অস্ত্রশিক্ষা গ্রহণ করেছেন। ধনুর্বিদ্যায় আপনি পৃথিবীতে বর্তমানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।'

চোখ বড় বড় করে আচার্য বললেন, 'বাব্বা, আমার সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেই দেখি তুমি এসেছ!'

গুরুদেবের কথা শুনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল একলব্য। সমবেত শিষ্যরা নিবিড় চোখে তাঁকে আগাগোড়া পরখ করতে লাগল। তাদের কারও চোখেমুখে কৌতূহল, কারওবা উপহাসের ছটা।

এই সময় দ্রোণাচার্য বললেন, 'কিন্তু বাবা, আমি যে রাজপুত্র ছাড়া অন্য কাউকে অস্ত্রশিক্ষা দিই না।'

কোমল চোখে একলব্য বলল, 'ক্ষমা করবেন গুরুদেব। আমি একটুক্ষণ আগে বলেছি, নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র আমি।'

'ও—, বলেছ নাকি ? খেয়াল করি নি। আচ্ছা, তুমি প্রথম থেকেই আমাকে গুরুদেব গুরুদেব বলে সম্বোধন করছ, কেন ? তুমি তো আমার শিষ্য নও।'

'আমি আপনার শিষ্য না হলেও আপনি আমার গুরু।' বলতে বলতে একলব্যের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

উদ্ভাসিত চোখে সে আবার বলল, 'আমি যখন নিষাদ রাজপ্রাসাদের শিক্ষকের কাছে অস্ত্রবিষয়ে পাঠ নিতে শুরু করলাম, সেই শিক্ষকের মুখ থেকেই আপনার কথা প্রথমে শুনেছি। সেই থেকে মনে মনে আপনাকে গুরুদেব বলে মানতে শুরু করেছি।'

দ্রোণাচার্য হালকা চালে যুবকটির সঙ্গে কথোপকথন শুরু করেছিলেন। ভেবেছিলেন— একসময় হতাশ হয়ে পেছন ফিরবে সে। এরকম অনেকে আসে। আচার্যের কঠিন কঠিন



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে একসময় বিদায় নেয়। কিন্তু একলব্যের সঙ্গে কথা বলে মনে হচ্ছে, সে অন্য ধাতুতে গড়া।

'ও, তুমি প্রাথমিক শিক্ষাও গ্রহণ করেছ নাকি ?' প্রশ্ন করলেন আচার্য।

'হ্যাঁ, করেছি। কিছুক্ষণ আগে আয়ুধ বিষয়ে আপনার বক্তব্য শুনে আমার মনে হচ্ছে, আমার শিক্ষার মধ্যে অনেক ঘাটতি রয়ে গেছে।'

'তুমি আমার কথাগুলো শুনেছ নাকি ?'

'বেশ কিছুক্ষণ আগে আমি দরজার কাছে এসে পৌঁছেছি। তখন গুরুগম্ভীর কণ্ঠে নানা অস্ত্রের আকার-প্রকার সম্পর্কে বলছিলেন। আমি একটা ঘোরের মধ্যে পড়ে গেলাম। তা ছাড়া, আপনার অনুমতি ছাড়া কক্ষে প্রবেশ করা অন্যায় হবে। সেই থেকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছি। আমার বিশ্বাস ছিল—একটা না একটা সময়ে আপনার কৃপাদৃষ্টি আমার ওপর পড়বে।' একটা তৃপ্তির হাসি সারা মুখে ছড়িয়ে শেষে বলল, 'পড়েছেও।'

একলব্যের অভিব্যক্তি সাবলীল। প্রতিটি শব্দ আলাদা করে স্পষ্টত সে উচ্চারণ করে গেল। কোনো ভনিতা নেই। তার বিশ্বাসের প্রতিটি কণা পর পর সাজিয়ে বলে গেল একলব্য।

কিন্তু দ্রোণাচার্য একলব্যের উপস্থাপনায় যতই মুগ্ধ হোন, তাকে শিষ্যত্ব দিতে পারেন না। কুরুরাজার কাছে তাঁর যে হাত-পা বাঁধা। দৃঢ় গলায় আচার্য বললেন, 'আমার কৃপাদৃষ্টি তোমার ওপর বর্ষিত হবে না।'

অপার বিস্ময় নিয়ে একলব্য গুরুদেবের দিকে তাকিয়ে থাকল। আচার্যের কথার মর্মোদ্ধার করতে চেষ্টিত হলো।

দ্রোণাচার্য জিজ্ঞেস করলেন, 'একলব্য, তুমি বোধহয় আমার কথা বুঝতে পারো নি।'

একলব্য বলল, 'আপনার এই পাঠশালায় নানা রাজ্যের রাজপুত্ররা পাঠ গ্রহণ করেন। আমি কেন আপনার কৃপা পাব না, বুঝে উঠতে পারছি না গুরুদেব।'

একলব্যের এই প্রশ্নের উত্তর দ্রোণাচার্যের জানা। একজন শিক্ষকের দৃষ্টি সূর্যরশ্মির মতো। সকলের ওপর সমভাবে পতিত হয়। আচার্যও তার ব্যতিক্রম নন। কত শত শিষ্য তাঁর এই অস্ত্রপাঠশালায় শিক্ষা গ্রহণ করছে আবার শিক্ষা গ্রহণ সমাপন করে নিজালয়ে চলেও যাচ্ছে। একলব্যেরও অধিকার আছে তাঁর শিক্ষাশ্রমে ভর্তি হওয়ার। কিন্তু দ্রোণাচার্য নিরুপায়।

তিনি একলব্যকে কিছুতেই শিষ্য হিসেবে বরণ করতে পারেন না। একলব্য যে নিষাদ, ও যে অনার্য! একজন অনার্য আর্যাধিকারের অস্ত্রবিদ্যা অধিগ্রহণ করবে কীভাবে ? তা ছাড়া তাঁর পাঠশালার সবাই সুসংস্কৃত আর্যপরিবারের সন্তান। মার্জিত, শীলিত একদল আর্যসন্তানের সঙ্গে একজন কালোদেহের অনার্য সন্তান পাঠ নিতে পারে না। হঠাৎ করে কেন জানি দ্রোণাচার্যের মধ্যে জাতিবিদ্বেষ টগবগিয়ে উঠল।

দ্রোণাচার্য ভাবলেন—এই একলব্য একেবারেই পৃথক এক জনগোষ্ঠীর মানুষ। তার আচার-ব্যবহার, তার শুচিবোধ-সদাচার—সবটাই আর্যজনজাতি থেকে আলাদা।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকে কৌরব-পাণ্ডবদের সঙ্গে বসিয়ে শিক্ষাদান করা মোটেই যুক্তিগ্রাহ্য নয়। তিনি হস্তিনাপুরের রাজবাড়িতে অস্ত্রশিক্ষার গুরু হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। যতই তাঁর স্বাধীনতা থাকুক, একজন নিষাদপুত্রকে রাজকুমারদের সঙ্গে একত্রে শিক্ষাদানের স্বাধীনতা তাঁর নেই। তিনি যে রাজবাড়ির অর্থপুষ্ট শিক্ষক। ভাবতে ভাবতে তাঁর মধ্যে ব্রাহ্মণ্য অহংকার জেগে উঠল।

দ্রোণাচার্য ভাবলেন—আর্য সমাজ যে চতুর্বর্ণীয় বিভাজনের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে, তা অবশ্যই মানবজাতির জন্য কল্যাণকর। এই বিভাজন সমাজকাঠামোকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছে। এই শৃঙ্খল রাজ্যশাসন, প্রজাশোষণ ও ধর্মমার্গের পক্ষে বিশেষভাবে অনুকূল।

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র শ্রেণিপ্রথা সমাজে বিরাজমান না থাকলে আর্য সমাজব্যবস্থা কবেই ভেঙে পড়ত। ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়রা স্বাধীন। ব্রাহ্মণ্যমস্তিষ্ক আর ক্ষত্রিয়-বাহুবলের সম্মিলনে এমন একটা কেন্দ্রশক্তি তৈরি হয়েছে, যা অতিপ্রতিদ্বন্দ্বী, অপ্রতিরোধ্য। ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ের সমন্বয়কে অব্যাহত রাখতে হলে এসব ছোটোজাতের শূদ্রদের মাথা তুলতে দেওয়া যাবে না।

ব্যাধ-ডোম-নিষাদদের মস্তিষ্ক বড় উর্বর। এই উর্বর মস্তিষ্কে যদি অস্ত্রবিদ্যা আর রণকৌশল ঢুকে যায় তাহলে পৃথিবীকে ওরা একদিন পদানত করে ছাড়বে। একজন ব্রাহ্মণ হয়ে কী করে তিনি ছোটোজাতের এই নিষাদপুত্রকে প্রশ্রয় দিতে পারেন ? তাঁর কি একলব্যকে ছাত্র হিসেবে গ্রহণ করা উচিত ? কখনো নয়। এসবই আপন মনে ভাবছিলেন দ্রোণ।

এ ছাড়া দ্রোণাচার্যের মনে আরেকটি কথা বারবার উঁকি দিচ্ছিল। কৌরব আর পাণ্ডবসন্তানরা বিশেষ এক বাতাবরণে বড় হয়ে উঠছে। তারা সুসংস্কৃত। তারা আর্য। তাদের গায়ের রং গৌর। রুচি উন্নত। একটা বিশেষ পরিমণ্ডলে অস্ত্রশিক্ষা গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে তারা। এই কালাকোলা, মলিন বসন পরিহিত আর্যসমাজে বেমানান চেহারার একলব্যকে ওদের সঙ্গে পাঠাভ্যাসে বসিয়ে দিলে, ওরা ভীষণ অস্বস্তিতে পড়বে।

এই অস্বস্তির কথা একটা সময়ে তারা পিতামহ ভীষ্মকে বলবে। ভীষ্ম যদি ক্ষেপে গিয়ে তাঁকে চাকরিচ্যুত করেন, তাহলে তাঁর কী গতি হবে ? এই সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্য, কৃপীর মুখের হাসি আর অশ্বত্থামার বিপুলানন্দ—সবই ভেসে যাবে। আবার পথে এসে দাঁড়াতে হবে তাঁকে। তখন দ্রুপদের ওপর প্রতিশোধের কী হবে ? তিনি যে প্রতিজ্ঞা করে এসেছিলেন—দ্রুপদকে সিংহাসন থেকে টেনেহিঁচড়ে নামাবেন। তাঁর চাকরি গেলে এসব কিছুই তো আর হবে না। দরকার নেই একলব্যকে শিষ্যত্ব দেওয়া। যে করেই হোক, তাকে এখান থেকে বিতাড়িত করতে হবে।

ক্ষুব্ধ গলায় আচার্য একলব্যকে উদ্দেশ করে বলে উঠলেন, 'হীনবংশে তোমার জন্ম। নীচ জাতি তুমি। অপাঙ্‌ক্তেয় কোনো জনগোষ্ঠীর সন্তানকে আমি অস্ত্রশিক্ষা দিই না।'

বহুবাসনার চির-আকাঙ্ক্ষিত গুরু দ্রোণাচার্যের মুখে এ রকম জাতিবিদ্বেষমূলক বর্ণবাদী কথা শুনে নিষাদপুত্র একলব্য একেবারেই স্তম্ভিত হয়ে গেল। তার দেহের সকল শিরা-


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপশিরা কিছু সময়ের জন্য অসাড় হয়ে গেল। তার সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে উঠল। কপালে, গণ্ডদেশে, নাকে ফোঁটা ফোঁটা স্বেদবিন্দু। তার চক্ষুদ্বয় পলকহীন।

কিছুক্ষণ পর তার সংবিৎ ফিরল। আচার্যের দিকে তাকাল একলব্য। দেখল—গুরুদেবের চক্ষু তার ওপর নিবদ্ধ। নিষ্পলক। চাহনিতে করুণা বা ভালোবাসার অথবা স্নেহের কোনো চিহ্ন খুঁজে পেল না একলব্য। কী রকম যেন ক্রোধান্বিত চেহারা। ঠিক ক্রোধযুক্ত নয়। যেন আচার্যের চাহনিতে ঘৃণার ছোঁয়া। বর্ষাকালে কালো মাটির ওপর দিয়ে একটা কেঁচোকে এগিয়ে যেতে দেখলে মানুষ যেমন করে ঘৃণা আর অবহেলায় নাকচোখ কুঁচকে কেঁচোটির দিকে তাকায়, দ্রোণাচার্যও সেই দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন একলব্যের দিকে।

এখন একলব্য কী বলবে গুরুকে উদ্দেশ করে ? যে গুরুর চরণ আবাল্য ধ্যান করে এসেছে, যে গুরুর সান্নিধ্য তার বহু-আকাঙ্ক্ষিত, যে গুরুর শিক্ষা তাকে উজ্জ্বল আলোর জগতে নিয়ে যাবে বলে তার একান্ত বিশ্বাস, সেই গুরু এ কী বললেন ? সে বোধ হয় ভালো করে শোনে নি। যা শুনেছে, আচার্য সেরকম করে বলেন নি। তার শুনতে অবশ্যই ভুল হয়েছে। নিজের অজান্তেই কানের পাশে হাত চলে এল একলব্যের। ভালো করে কান রগড়ে সে আবার উৎকর্ণ হলো।

এই সময় দ্রোণাচার্য পুনরায় বলে উঠলেন, 'তুমি বোধ হয় আমার কথার মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারো নি। আমি উঁচু জাতের অস্ত্রগুরু। হীন শূদ্রবংশে জন্ম তোমার। ব্রাহ্মণ আমি। ব্রাহ্মণ হয়ে নীচ জাতির নিষাদকে অস্ত্রশিক্ষা দিতে পারি না আমি। তুমি ফিরে যাও।' বলে সম্মুখে সমবেত শিষ্যদের দিকে মুখ ফেরালেন আচার্য।

একলব্য আর একটি কথাও বলল না। পূর্বের মতো মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে গুরুদেবকে প্রণাম করল। তারপর ধীর পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়াল একলব্য। গভীর মগ্নতায় কী যেন ভাবল। তারপর পেছন ফিরল। গুরুর নিকটে গেল। জোড়হাতে বলল, 'একটা নিবেদন ছিল গুরুদেব।'

একলব্যের দিকে না তাকিয়ে দ্রোণাচার্য বললেন, 'বলো।'

'আমার বাসনার মৃত্যুর কথা বলব না। বলব আমার প্রাথমিক অস্ত্রশিক্ষার কথা। অস্ত্রবিদ্যার কিছুটা সাধন আমি করেছি। যাওয়ার আগে তার কিছুটা কৌশল আপনাকে দেখাতে পারলে তৃপ্তি পাব। আপনি অনুমতি দিন গুরুদেব।'

একলব্যের দিকে ধীরে ধীরে মাথা ঘোরালেন আচার্য। তার চোখেমুখে রাগ না অনুরাগ বোঝা যাচ্ছে না এখন। 'কী প্রদর্শন করবে তুমি ?' জিজ্ঞেস করলেন দ্রোণাচার্য।

'যা শিখেছি।' সংক্ষেপে বিনীত কণ্ঠে বলল একলব্য।

'তথাস্তু।' বলে সমবেত ছাত্রদেরকে অস্ত্রকৌশল প্রদর্শনী মাঠে যাওয়ার ইঙ্গিত করলেন। আসন ছেড়ে নিজেও উঠলেন। একলব্য তাঁকে অনুসরণ করল।

একলব্য অতি নিপুণতায় তীর নিক্ষেপ করতে লাগল। অন্যান্য শিষ্যের পক্ষে দূরবর্তী যে লক্ষ্যবস্তু ভেদ করা অসম্ভব, অতি সহজেই একলব্য সেই বস্তু ভেদ করল। তার শরচালনার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিপুণতা আর ক্ষিপ্রতা দেখে সবাই উচ্চস্বরে বাহবা দিতে লাগল। কৌরব ভ্রাতারা সবচাইতে বেশি উচ্ছ্বসিত হলো। একজন ছাড়া অন্য পাণ্ডবরা পরিমিত আনন্দ প্রকাশ করল। একজন শুধু কোনো উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল না। সে অর্জুন।

বিষবৎ একটা ঈর্ষা অর্জুনের মধ্যে ফেনায়িত হয়ে উঠল। হীনম্মন্যতাজাত ক্রোধ তাকে আবৃত করতে উদ্যত হলো। কিন্তু বুদ্ধিমান সে। মুখে কিছু বলল না। নির্লিপ্ত উদাসীন চোখে একলব্যের শরনিক্ষেপণ দক্ষতা অবলোকন করে গেল শুধু।

একলব্যের তীরচালনা দক্ষতা দেখে আরেকজন বিশেষভাবে মুগ্ধ হলেন। তিনি অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য। কী অবলীলায়, কী অপূর্ব দক্ষতায় লক্ষ্যবস্তুতে শরনিক্ষেপ করে গেল একলব্য! তাঁর অস্ত্র পাঠশালার দু'জন ছাত্র, অশ্বত্থামা আর অর্জুনই শুধু সক্ষম এই রকম তীর নিক্ষেপণে।

কঠোর সংযমে নিজের আবেগকে গলাটিপে হত্যা করলেন দ্রোণাচার্য। ভাবলেন—এই পৃথিবীতে একলব্যের মতো কত প্রতিভার যে অহরহ মৃত্যু হচ্ছে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। একজন একলব্যের জন্য আকুলিত হয়ে লাভ কী ?

অস্ত্রকৌশল প্রদর্শনী শেষ করল একলব্য। প্রবল আগ্রহে গুরুদেবের দিকে তাকাল। উদ্দেশ্য—যদি গুরুদেব সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। কিন্তু গুরুদেবের অভিব্যক্তি নির্মোহ। সংক্ষেপে বললেন, 'ঠিক আছে। তুমি আসো এখন।' অন্যদিকে মুখ ঘোরালেন দ্রোণাচার্য।

এক অদ্ভুত ভঙ্গি করে হাসল একলব্য। তীর-ধনুক যথাস্থানে রাখল। তারপর চোখ যেদিকে গেল, সেই দিকে এগিয়ে গেল সে।

একলব্য এগিয়ে গেল অরণ্যের দিকে। দ্রোণাচার্যের আশ্রমের উত্তর দিকে যে গহিন অরণ্য সেদিকে অগ্রসর হলো একলব্য। একদিন উত্তর দিক থেকে গঙ্গা পেরিয়ে, এই গহিন বনভূমি অতিক্রম করে পুত্র অশ্বত্থামার হাত ধরে সস্ত্রীক কুরু রাজধানী হস্তিনাপুরে এসেছিলেন দ্রোণাচার্য। সেদিন বুকভরা বেদনা নিয়েই এসেছিলেন তিনি। হৃদয় ছিল অপমানে চুরচুর। কিন্তু হস্তিনাপুর, পিতামহ ভীষ্ম তাঁকে সপরিবারে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তাঁকে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করে একটা সচ্ছল স্বস্তির জীবন দান করেছেন। অর্জুনদের পেয়ে তাঁর ভেতরের অপমানের জ্বালা আপাতত প্রশমিত হয়েছে। তাঁর ভবিষ্যৎ লক্ষ্য স্থির করে রেখেছেন দ্রোণাচার্য।

আজ সেই কামনা পূরণের হস্তিনাপুর থেকে একলব্যকে চলে যেতে হচ্ছে শূন্য হাতে। প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় যে অরণ্য অতিক্রম করে একদা আচার্য এই হস্তিনাপুরে এসেছিলেন, অপ্রাপ্তির বুকভরা কষ্ট নিয়ে সেই অরণ্যের দিকেই পা বাড়াল একলব্য। কষ্ট ভুলবার জন্য মানুষ জনসান্নিধ্য খোঁজে, কিন্তু একলব্য খুঁজে নিল জনবিচ্ছিন্ন শ্বাপদময় গহিন অরণ্য। একলব্যের কাছে এই জনকোলাহল, এই ঐশ্বর্য, এই বাসনা, এমনকি মাতা-পিতা-পিতামহের মতো নিকটাত্মীয়-সান্নিধ্যও অসহ্য মনে হলো। প্রকৃতির কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য নিজের মধ্যে প্রবল একটা আকুলতা অনুভব করল সে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একলব্য ধীরে ধীরে গভীর থেকে গভীরতর অরণ্যের ভেতরে ঢুকে গেল।

দ্রোণাচার্য একবারের জন্যও ভাবলেন না, তিনি এই নিষাদজাত যুবাটির সঙ্গে কী অমানবিক আচরণ করেছেন! ব্রাহ্মণ্য অহংকারে উদ্দীপিত হয়ে, কুলগর্বে গর্বিত হয়ে তিনি একলব্যের প্রতি যে হীন আচরণ করলেন, এজন্য তাঁর মধ্যে কোনো অনুশোচনা হলো না। শিষ্যত্বকামী, তীর চালনায় দক্ষ একলব্য লোকালয়ের দিকে না গিয়ে কেন অরণ্যানির দিকে গেল, সে বিষয়ে ভাববার বিন্দুমাত্র আগ্রহ দ্রোণাচার্যের ভেতরে জাগল না। তিনি নিত্যদিনের মতো শিষ্যদের নিয়ে অস্ত্র পাঠদানে মশগুল হয়ে পড়লেন।

একলব্যের আগমন এবং নির্গমন যেন অতি সাধারণ একটা ঘটনা। একটি বুদ্বুদ জেগে ওঠা আর বিলীন হয়ে যাওয়ার মতো যেন একলব্যের আবির্ভাব এবং তিরোধানের ঘটনাটি।

বিতাড়নের বেদনা সহ্য করতে না পেরে একলব্য কি প্রাণ বিসর্জন দেবে, না আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে পৃথিবীকে দেখিয়ে দেবে–বর্ণগর্বী গুরু দ্বারা অবহেলিত হলেও একলব্যরা বিলীন হয়ে যায় না।

AMARBOI.COM


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্জুনেনৈবমুক্তস্তু দ্রোণ হৃষ্টতনূরুহঃ।
অর্জুন যখন উত্তর দিল, তখন দ্রোণাচার্যের শরীর আনন্দে রোমাঞ্চিত হলো।

দিন সপ্তাহ মাস করে করে বছর অতিক্রান্ত হলো।

একটি বছরের পর আরেকটি বছর গেল। এইভাবে এক-দুই-তিন করে করে অনেকটা বছর অতীতের দিকে সরে গেল। দ্রোণাচার্যের প্রশিক্ষণ শেষ হলো। বহির্দেশাগত ছাত্ররা অস্ত্রবিদ্যা গ্রহণান্তে নিজ নিজ দেশে ফিরে গেল। কৌরব আর পাণ্ডবরা অস্ত্রচালনায় যথেষ্ট পারঙ্গম হলো। ওরা একেবারে শূন্য থেকে শুরু করে নি। কৃপাচার্য তাদের প্রাথমিক ভিত্তি পূর্বেই নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। ফলে দ্রোণাচার্যকে তেমন বেগ পেতে হয় নি। প্রাথমিক জ্ঞান নিয়ে এসেছিল বলে সহজেই কৌরব-পাণ্ডবরা উন্নত অস্ত্রবিদ্যা আয়ত্ত করতে পেরেছিল। দ্রোণাচার্যের কাছেই তারা অস্ত্রনীতি ও এর চূড়ান্ত প্রয়োগকুশলতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেল। অর্জুন আর অশ্বত্থামার মতো বীরেরা ধনুর্বিদ্যায় দক্ষ হয়ে উঠল। ভীম আর দুর্যোধনের আগ্রহ গদার প্রতি। আচার্যের প্রশিক্ষণে এই দুজন গদাযুদ্ধে দুর্ধর্ষ হয়ে উঠল।

এইভাবে কুরুপ্রাসাদের রাজকুমারদের কেউ অসি যুদ্ধে, কেউবা রথযুদ্ধে, কেউ হস্তিযুদ্ধে, কেউবা গুপ্ত অস্ত্র ব্যবহারে নিপুণতা অর্জন করল। আচার্য দেখলেন—কৌরব-পাণ্ডব শিষ্যদের সবাই নিজ নিজ ক্ষেত্রে সুশিক্ষিত হয়ে উঠেছে। অস্ত্রবিদ্যায় দক্ষ হয়ে ওঠার পর দ্রোণাচার্য সিদ্ধান্ত নিলেন, রাজপরিবারের লোকদের সামনে রাজকুমাররা তাদের অর্জিত অস্ত্রবিদ্যার নমুনা প্রদর্শন করবে। কিন্তু তারও আগে কুমারদের একটা প্রাথমিক পরীক্ষা হওয়া প্রয়োজন। লোকসমক্ষে দেখানোর পূর্বে তাঁর তো জানা কর্তব্য যে, ছাত্ররা এতদিন তাঁর অধীনে কী শিখল।

রাজকুমারদের উদ্দেশে আচার্য বললেন, 'আগামী পরশু তোমাদের অর্জিত অস্ত্রজ্ঞানের পরীক্ষা নেওয়া হবে। প্রস্তুত থেকো সবাই।'

এরপর রাজকুমারদের চোখ এড়িয়ে তিনি বাজারে গেলেন। একে তাকে জিজ্ঞেস করে একজন মৃৎশিল্পীকে খুঁজে বের করলেন। শিল্পীকে বললেন, 'কালকে বিকেলের মধ্যে আমার একটা পক্ষী দরকার। তুমি মাটি দিয়ে মনোহর একটা পক্ষী তৈরি করবে এবং লোকচক্ষু বাঁচিয়ে আমার আশ্রমে পৌঁছে দেবে।'

যথাসময়ে শিল্পী মৃন্ময়পাখিটি দ্রোণাচার্যের কাছে পৌঁছে দিল। অরণ্যমধ্যের একটা উচ্চচূড় বৃক্ষের শাখায় অতিগোপনে পাখিটি স্থাপন করে রাখলেন আচার্য।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরদিন সকালে সশিষ্য ওই বৃক্ষতলে উপস্থিত হলেন দ্রোণ। ছাত্ররা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াল। একে একে সবার মুখের ওপর দৃষ্টি ফেললেন গুরুদেব। বললেন, 'আজ তোমাদের লক্ষ্যভেদের পরীক্ষা। লক্ষ্যভেদের জন্য তীর-ধনুক নিয়ে প্রস্তুত হও তোমরা।'

প্রথমেই তিনি তাকালেন যুধিষ্ঠিরের দিকে। এই শিষ্যটিকে বিশেষ স্নেহের নজরে দেখেন তিনি। শান্ত, সৌম্য, ধীরস্থির যুধিষ্ঠির। মানববোধের প্রতি তার গভীর টান। কঠিন সংকটেও মিথ্যে বলে না। সত্যের প্রতি তার একান্ত অনুরাগ। তাকেই প্রথমে নিকটে ডাকলেন আচার্য। সমরক্ষেত্রে যোদ্ধারা শুধু অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করে না, অস্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হয় তাদের স্থৈর্য। যার মানসিক দৃঢ়তা যত প্রবল, সে-ই যুদ্ধক্ষেত্রে সবিশেষ পারঙ্গমতা দেখাতে পারে। তাই যুধিষ্ঠিরের অস্ত্রদক্ষতার পূর্বে নিষ্ঠার একাগ্রতার পরীক্ষা নেওয়া প্রয়োজন।

শরক্ষেপণের আদেশ দেওয়ার আগে দ্রোণাচার্য জিজ্ঞেস করলেন, 'বৎস যুধিষ্ঠির, বৃক্ষশাখায় তুমি পাখিটি দেখতে পাচ্ছ তো ?'

যুধিষ্ঠির সহজকণ্ঠে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ আচার্য, দেখতে পাচ্ছি।'

আচার্য বললেন, 'তুমি কি ওই গাছটাকে, তাকে জড়ানো লতাগুল্মগুলোকে, বৃক্ষে শোভিত ফলগুলোকেও দেখতে পাচ্ছ ?'

'হ্যাঁ, গুরুদেব, দেখতে পাচ্ছি।'

'আর কী কী দেখতে পাচ্ছ তুমি ?' জিজ্ঞেস করলেন আচার্য।

'আমি সবকিছু দেখতে পাচ্ছি, সবাইকে দেখতে পাচ্ছি।'

'সবাই মানে!'

'এই আপনি। ভীম, অর্জুন, সহদেব, নকুল। দুর্যোধন এবং তার নিরানব্বইজন ভ্রাতা সবাইকে দেখতে পাচ্ছি।'

'আর অশ্বত্থামাকে দেখতে পাচ্ছ না ?'

লজ্জার হাসি হাসল যুধিষ্ঠির। বলল, 'আমার ভুল হয়ে গেছে গুরুদেব। গুরুভ্রাতা অশ্বত্থামাকে স্পষ্টত দেখতে পাচ্ছি।' নিকটে দণ্ডায়মান অশ্বত্থামার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে কথা শেষ করল যুধিষ্ঠির।

ব্যাখ্যাতীত একধরনের হাসি আচার্যের চোখেমুখে ঝিলিক দিয়ে মিলিয়ে গেল। কী যেন বলতে চাইলেন তিনি, বললেন না। যুধিষ্ঠির যে তাঁর প্রিয় শিষ্য!

জনসমক্ষে তাকে ছোট করতে চান না গুরুদেব। লক্ষ্যভেদে প্রয়োজন স্থির মানসিকতা। প্রয়োজন একাগ্রতা। যার একাগ্রতা নেই, সে কখনো লক্ষ্যভেদ করতে পারবে না। লক্ষ্যভেদ করতে এসে যুধিষ্ঠির মৃৎপক্ষীটি ছাড়াও চারপাশের সবাইকে, সবকিছুকে দেখতে পাচ্ছে। অর্থাৎ সে অনন্যমনা নয়। লক্ষ্যভেদে যুধিষ্ঠিরের ব্যর্থতা অনিবার্য।

দ্রোণাচার্য যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে আর শরক্ষেপণ করালেন না। বললেন, 'তুমি যাও যুধিষ্ঠির। তোমার লক্ষ্যভেদের প্রয়োজন নেই। সারিতে গিয়ে দাঁড়াও।'

যুধিষ্ঠির নীরবে অন্যান্যদের নিকটে গিয়ে দাঁড়াল।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুধু লক্ষ্য মাথায় রেখে অধ্যবসায় করে গেলে লক্ষ্য করতলগত হবেই। লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে চাই একাগ্রতা। সেই একাগ্রতা যুধিষ্ঠিরের মধ্যে নেই। যেমন নেই অর্জুন ছাড়া অন্যান্য ভাইদের মধ্যেও, এমনকি অশ্বত্থামার মধ্যেও।

কৌরব-পাণ্ডব সকল ভাই যুধিষ্ঠিরকে সর্বাধিক জ্ঞানবান মনে করত। এই গুণী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাটিকে সবাই মনে মনে আদর্শ মানত। তাই যখন গুরুদেব একে একে ভীম-নকুল-সহদেব এবং শত ভ্রাতাকে ডাকলেন, যুধিষ্ঠিরের দেখাদেখি সবাই একই কথা বলল। অশ্বত্থামাও তা-ই বলল। দ্রোণাচার্য কারও উত্তরে সন্তুষ্ট হলেন না। প্রত্যেককে বললেন, 'তোমার দ্বারা লক্ষ্যভেদ করা সম্ভব হবে না।'

এরপর সমবেত শিষ্যদের উদ্দেশে বললেন, 'অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে, অন্যের দেখাদেখি কাজ করলে চলে না। অভীষ্ট সাধনে প্রয়োজন স্বতন্ত্র স্বাধীন চিন্তা। তোমাদের কারও স্বাধীন চিন্তা নেই।'

তারপর আচার্য চোখ ফেরালেন অর্জুনের দিকে। বললেন, 'আমার সকল প্রচেষ্টা সকল প্রশিক্ষণ ব্যর্থ বলে মনে হচ্ছে। অর্জুন তুমি বলো এই বৃক্ষশাখায় কী দেখতে পাচ্ছ ?'

অর্জুন দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিল, 'শুধু পাখিটির মাথাটিই দেখতে পাচ্ছি আমি। ওই মাথাটিই তো কেটে নামাতে হবে আমায় ?'

আচার্য অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। অপলক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'পাখির মাথা ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছ না তুমি ?'

'না, গুরুদেব।'

'তোমার আশপাশে এত মানুষজন! অরণ্যের এত বৃক্ষলতা! বিশাল এই গাছটির এত শাখা-প্রশাখা, পত্রপল্লব! পাখিটি ছাড়া আর কিছুই দেখছ না তুমি ?'

'গোটা পাখি নয় আচার্য, শুধু পাখিটির মাথাটিই দেখতে পাচ্ছি।'

তৃপ্তির হাসি হাসলেন দ্রোণাচার্য। ভাবলেন, এইজন্যই তো অর্জুন। যেখানে অপরাপর শিষ্যরা আশপাশের সবকিছু দেখছে, সেখানে পাখিটির মস্তক ছাড়া অন্যকিছু অর্জুনের নজরে পড়ছে না। লক্ষ্যনিষ্ঠ ছাত্রের এই তো প্রধান বৈশিষ্ট্য। আপন স্বাতন্ত্র্যে অর্জুন উত্তর দিয়েছে। এই স্বাতন্ত্র্য মহাবীরের বিশেষত্ব।

নিরলস পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং একাগ্র ভাবনার ফলে অর্জুনের মধ্যে এই স্বাতন্ত্র্য তৈরি হয়েছে। ভাবতে ভাবতে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন আচার্য। অর্জুনের অসাধারণ উত্তর শুনে অদ্ভুত এক আনন্দে তাঁর সমস্ত দেহ, স্নায়ুতন্ত্র ভেসে যেতে লাগল। পরম মমতাভরা কণ্ঠে অর্জুনকে কাছে ডাকলেন তিনি। গাঢ়কণ্ঠে বললেন, 'পাখিটির মস্তক বিচ্ছিন্ন করে বৃক্ষশাখা থেকে নামিয়ে আনো বৎস।'

অর্জুন একাগ্রমনে কৃত্রিম পাখিটির ঘাড় লক্ষ্য করে তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করল। পক্ষীটির দেহবিচ্ছিন্ন শির দ্রোণাচার্যের পদতলে লুটিয়ে পড়ল।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আচার্য ভীষণ রোমাঞ্চিত হলেন। তাঁর দ্বিতীয়বার অদ্ভুতানন্দের অন্যতর একটা কারণ আছে। তিনি লক্ষ্যপূরণের দিকে এগোচ্ছেন। পাঞ্চাল দ্রুপদের কাছে অপমান-প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন একদা। এই লক্ষ্যের ওপর দৃষ্টি রেখেই পাণ্ডব-কৌরবদের অস্ত্রশিক্ষা দান করেছেন তিনি। এই প্রশিক্ষিত শিষ্যদের দিয়ে দ্রুপদকে পরাজিত করে তিনি রাজ্য লাভ করবেন। তিনি স্বয়ং যুদ্ধে অংশ নেবেন না। ছাত্ররাই যুদ্ধ করবে দ্রুপদের বিরুদ্ধে। এই যুদ্ধে যে জয়ের মালা তাঁর গলায় পরিয়ে দেওয়ার সক্ষমতা রাখে, সে এই অর্জুন। জয়ের আগাম আনন্দে দ্রোণাচার্যের মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। অর্জুনকে বুকের কাছে টেনে উচ্চস্বরে আচার্য বললেন, 'বৎস, এই জগতে তোমার মতো ধনুর্ধর দ্বিতীয় কেউ হবে না।'

কৌরব-পাণ্ডবদের ব্যক্তিগত শিক্ষা এবং পরীক্ষা শেষ হলো। দ্রোণাচার্য তাঁর অস্ত্রাশ্রম পরিত্যাগ করলেন। সশিষ্য উপস্থিত হলেন রাজপ্রাসাদে। রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে জরুরি সভা আহ্বান করার জন্য অনুরোধ করলেন। ধৃতরাষ্ট্রের আহ্বানে সভায় উপস্থিত হলেন পিতামহ ভীষ্ম, বিদুর, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস, কৃপাচার্য প্রমুখরা।

সবাইকে সাদর সম্ভাষণ করে দ্রোণাচার্য বললেন, 'একদা আমার হাতে এই প্রাসাদের রাজকুমারদের অস্ত্রবিদ্যা শেখানোর দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল।'

কৃতজ্ঞচিত্তে ভীষ্মের দিকে একপলক তাকালেন আচার্য। এই ভীষ্মই তাঁকে গুরু হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। 'আপনাদের রাজপুত্ররা তাদের শিক্ষা সম্পন্ন করেছে। কী শিখেছে তারা আমার কাছে ? জানার জন্য সবার ইচ্ছা জাগতে পারে। অনুমতি পেলে, ওরা আপনাদের সামনে অস্ত্র প্রয়োগ কৌশল প্রদর্শন করবে।'

দ্রোণের কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র সবিশেষ আনন্দিত হলেন। একসময় এই বাড়ির ছেলেরা খেলাধুলা আর হইহল্লায় ভীষণ মেতে উঠেছিল। তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছিল। কৃপাচার্যের বিধিনিষেধকে তেমন করে আমল দিচ্ছিল না তারা। দ্রোণাচার্যই তাদের নিয়ম আর শাসনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছেন। আর এখন বলছেন, ওদের অস্ত্রচালনাশিক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। তাহলে একেবারে উচ্ছন্নে যায় নি রাজকুমাররা ?

ধৃতরাষ্ট্র সোল্লাসে বলে উঠলেন, 'আচার্য, আপনি তো অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছেন। ধন্য আপনি। অস্ত্রকুশলতা প্রদর্শনের জন্য যা কিছু করা দরকার, আপনি করুন। সকল প্রকার স্বাধীনতা আপনাকে দেওয়া হলো।'

তারপর জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র আন্দাজে সভাসদদের দিকে মুখ ঘোরালেন। তাঁদের সমর্থন আদায়ের জন্য বললেন, 'আপনাদের অভিমত কী ?'

'সাধু, সাধু। যথার্থ বলেছেন মহারাজ।' বলে উঠলেন সবাই।

এরপর দ্রোণাচার্যকে লক্ষ্য করে আবেগায়িত কণ্ঠে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, 'আপনি যে স্থানে, যে সময়ে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করতে চান, করুন। আমি অন্ধ। রাজকুমারদের অস্ত্রকুশলতা দেখতে বড় ইচ্ছে করছে আমার। চক্ষুষ্মানদের মতো দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে বড় বাসনা জাগছে মনে।'


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের অসংযত আবেগকে সংযত করলেন ধৃতরাষ্ট্র। বললেন, 'বিদুর এই কাজে আপনাকে সাহায্য করবে।' তারপর বিদুরকে উদ্দেশ করে বললেন, 'ভাই, অস্ত্রবিদ্যা প্রদর্শনীমঞ্চ তৈরি করতে যা অর্থের প্রয়োজন হবে, তা কোষাগার থেকে নিয়ে যাও।'

অস্ত্রবিদ্যা প্রদর্শনীর জন্য গাছপালাহীন বিশাল সমতলভূমির দরকার। বিদুরকে সঙ্গে নিয়ে প্রথমে সেই ভূমি নির্বাচন করলেন দ্রোণ। একদিকে রাজা-রাজন্যদের বসবার মঞ্চ তৈরি করালেন। রাজবাড়ির নারীদের জন্য দর্শনগৃহ নির্মাণের আদেশ দিলেন নির্মাণশিল্পীদের। হস্তিনাপুরের ধনশালী জনপদবাসীরা সেই মাঠের একদিকে নিজেদের খরচে উঁচু উঁচু মঞ্চ তৈরি করলেন।

জনপদবাসীরা ভবিষ্যতের রাজাদের অস্ত্রপ্রয়োগ কুশলতা দেখার জন্য নির্ধারিত দিনে দলে দলে এসে সেই মঞ্চে অবস্থান নিল। পালকি করে ঘরের বউ-ঝিরাও এল।

অস্ত্রকৌশল প্রদর্শনীর নির্ধারিত দিন উপস্থিত হলো। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র মন্ত্রী-অমাত্যসহ মঞ্চে আসন গ্রহণ করলেন।

এলেন পিতামহ ভীষ্ম আর এলেন প্রথমগুরু কৃপাচার্য। কুরুকুলের রাজরানি গান্ধারীও নির্ধারিত আসনে এসে বসলেন। মাতা কুন্তী ও অন্যান্য নারীরা তাঁর তিনপাশে আসন গ্রহণ করলেন।

রঙ্গভূমিতে পুত্র অশ্বত্থামাকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য। তাঁর সাদা চুল, শুভ্র দাড়ি। পরিধেয় বস্ত্রও শ্বেতশুভ্র। তাঁর কাঁধ ছাড়িয়ে নামা শুভ্র যজ্ঞোপবীতখানি ভিন্ন এক অনুপম মাত্রা এনে দিয়েছে দর্শকদের চোখে।

তারপর রাজকুমাররা যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করল। ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্র আর পাণ্ডুর পঞ্চপুত্র পাশাপাশি দাঁড়ালেও প্রকৃতপক্ষে কুরুবাড়ির রাজকুমাররা দ্বিধাবিভক্ত। মানসিকভাবে পরস্পরবিরোধী। একদিকে পঞ্চপাণ্ডব, অন্যদিকে ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্র। পাণ্ডবদের নেতৃত্বে ধনুর্ধর অর্জুন, আর শতভ্রাতার পুরোধা দুর্যোধন।

সবচেয়ে বেশি রেষারেষি ভীম আর দুর্যোধনের মধ্যে। উভয়েই গদাধর। গদাযুদ্ধে উভয়েই সবিশেষ পারঙ্গম। ধনুর্বিদ্যা প্রদর্শনের জন্য প্রতিপক্ষের প্রয়োজন নেই। কিন্তু গদাদক্ষতা প্রদর্শনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রয়োজন।

অস্ত্রদক্ষতা প্রদর্শনের জন্য ভীম আর দুর্যোধন মুখোমুখি দাঁড়াল।

কিন্তু তার আগে যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, দুঃশাসনসহ অন্যান্য কুরুপুত্রদের নিজ নিজ পারঙ্গমতা দেখানোর জন্য দ্রোণাচার্য নির্দেশ দিলেন।

অল্পসময়ের মধ্যে রঙ্গভূমি অস্ত্রের ঝনঝনানিতে মুখরিত হয়ে উঠল। ধনুর টঙ্কারে, অসির ঘর্ষণে, বল্লমের শব্দে, গতিমান বর্শার শাঁ শাঁ ধ্বনিতে গোটা রঙ্গভূমি ভীষণাকার একটা যুদ্ধভূমিতে পরিণত হলো। করতালিতে আর বাহবা ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল।

এল ভীম-দুর্যোধনের পালা। উভয়ের হাতে গদা। দুটি গদাই লৌহনির্মিত। ভীমের গদার হাতল বড়। গদার মাথাটি ক্রমশ বড় হয়ে বর্তুলাকার হয়েছে। সেই বর্তুল আকারের



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চারদিকে বৃত্তাকারে কয়েক সারি ছুঁচালো লৌহদণ্ড। দুর্যোধনের গদার হাতল ছোট। গদার আকারও ভীমের গদার চেয়ে ছোট। গদা নিয়ে প্রতিপক্ষের ওপর ক্ষিপ্র গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে দুর্যোধনের বাড়া নেই।

উভয়ের বাম হাতে ঢাল। দুর্যোধনের ঢাল ভীমের ঢালের চেয়েও বড়। নানা রকমের নকশা আঁকা দুর্যোধনের ঢালে। ভীমের ঢাল সাদামাটা। দুর্যোধন কাঁসার তৈরি বর্ম পরিধান করেছে। ভীমের ওসবে তোয়াক্কা নেই। উভয়ের মস্তকে শিরস্ত্রাণ। লৌহ আর কাঁসামিশ্রিত ধাতুতে তৈরি এই শিরস্ত্রাণ প্রতিপক্ষের গদার আঘাত থেকে মস্তককে বাঁচাবে। ভীম আর দুর্যোধনের পায়ে পদত্রাণ।

উভয়ে প্রস্তুত হয়ে গুরু দ্রোণের ইশারার জন্য অপেক্ষা করছে। অঙ্গুলি নির্দেশ পেলেই দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়বে তারা।

এই সময় ধুন্ধুমার শব্দে রণবাদ্য বেজে উঠল। করতাল, কর্ণাল, কাড়া, খঞ্জনি, খমক, ঘন্টা, জগঝম্প, জয়ডাক, ঝাঁঝরি, দগড়, দুন্দভি, ঢোল, শঙ্খ আর শিঙ্গার শব্দে চতুর্দিক উচ্চকিত হয়ে উঠল।

দ্রোণাচার্য ডান হাত দিয়ে বাতাসে তরঙ্গ তুলে গদাযুদ্ধ শুরুর নির্দেশ দিলেন। গদাদ্বন্দ্ব শুরু হলো। উভয়ের গদার ঘর্ষণে ঘর্ষণে বিকট শব্দের জন্ম হলো।

বিদুৎ ঝলসিত হতে লাগল উভয়ের গদা থেকে। এই দুর্যোধনের গদাক্রমণ থেকে ঢাল দিয়ে নিজেকে রক্ষা করছে ভীম, পলকে ভীমের গদাঘাতে দুর্যোধন ভূপতিত হচ্ছে। আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণের রণকৌশলে সমবেত দর্শকমণ্ডলী মুহূর্তে মুহূর্তে চমকিত হচ্ছে।

হঠাৎ দ্রোণাচার্য লক্ষ করলেন, দুর্যোধন গদাযুদ্ধের নিয়ম ভঙ্গ করে ভীমের উরুতে গদাঘাত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। ভীমও চক্ষু রোষকষায়িত করে দুর্যোধনের আক্রমণের প্রত্যুত্তর দিতে চাইছে। বিচক্ষণ গুরুদেব মুহূর্তেই বুঝে গেলেন, উভয়ের মধ্যে ক্রোধ ধূমায়িত হয়ে উঠেছে। এদের এই মুহূর্তে থামিয়ে না দিলে লঙ্কাকাণ্ড বেধে যাওয়ার সম্ভাবনা।

আচার্য তাঁর শঙ্খে ফুঁ দিলেন। শঙ্খধ্বনি শুনে উভয়ে গদাযুদ্ধ থামাল। পরস্পর পরস্পরের দিকে অগ্নিঝরা চোখে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর পেছনে ফিরে গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা দিল।

সর্বশেষে অস্ত্রগুরু অর্জুনকে রঙ্গভূমিতে আহ্বান জানালেন। অর্জুন অস্ত্রবিদ্যা প্রদর্শনীর শেষ-চমৎকার। অর্জুন দ্রোণাচার্যের মানসপুত্র। তার মাধ্যমে রাজা, রাজন্য আর প্রজাকুলকে তাক লাগাতে চাইলেন আচার্য। অর্জুন পরাক্রমী, সকল অস্ত্রে নিপুণ।

জলদগম্ভীর কণ্ঠে দ্রোণাচার্য বললেন, 'আমার পুত্রের চেয়েও যে আমার প্রিয়তর, ভগবান বিষ্ণুর মতো যে পরাক্রমশালী, সকল রকম অস্ত্র চালনায় যে অতিশয় দক্ষ, সেই অর্জুনকে এবার আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। অর্জুনের অস্ত্রশিক্ষা আপনারা দেখুন।'

ধৃতরাষ্ট্র তাঁর আসনে নড়েচড়ে বসলেন। পাশে দণ্ডায়মান সঞ্জয়কে উদ্দেশ করে নিম্নকণ্ঠে বললেন, 'আচার্য এসব কী বলছেন সঞ্জয় ? আমার সন্তানদের মধ্যে কি কেউ অর্জুনের সমতুল্য নয় ?'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধৃতরাষ্ট্র দৃষ্টিহীন। সঞ্জয় সর্বদা তাঁর পাশেপাশে থাকে। দেখার কিছু হলে সঞ্জয় দেখে। দেখে মহারাজাকে তার অনুপুঙ্খ বর্ণনা দেয়।

মহাধিপতি ধৃতরাষ্ট্রের কথা শুনে সঞ্জয় অনুচ্চ কণ্ঠে জবাব দিল, 'অর্জুনের সাজসজ্জা, দেহভঙ্গি, আত্মবিশ্বাস আর গুরু দ্রোণাচার্যের আচরণ দেখে-শুনে মনে হচ্ছে, অর্জুনই আচার্যের অস্ত্রপাঠশালার শ্রেষ্ঠতম ছাত্র। আপনার পুত্রদের মধ্যে অর্জুনের সমকক্ষ ধনুর্ধর কেউ নেই বলে মনে হচ্ছে। কারণ দ্রোণাচার্যের ঘোষণা শুনে আপনার সকল পুত্র অধোমুখে দাঁড়িয়ে আছে।'

সঞ্জয়ের কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র নিশ্চুপ হয়ে গেলেন।

অর্জুন অস্ত্রকৌশল-দক্ষতা প্রদর্শন শুরু করল। ঘনঘন করতালিতে সমস্ত রঙ্গভূমি ফেটে পড়তে লাগল। নগরবাসীরা সোল্লাসে জয়ধ্বনি দিতে লাগল। এইসময় হঠাৎ কোথা থেকে কর্ণ সেই রঙ্গভূমিতে, ঠিক অর্জুনের সামনে, এসে উপস্থিত হলো। অস্ত্ররঙ্গের প্রসারিত ভূমি হঠাৎ করে স্তব্ধ হয়ে গেল।

কর্ণ সদর্পে বলল, 'প্রতিদ্বন্দ্বীহীন খালি মাঠে নিজেকে সর্বোত্তম অস্ত্রকৌশলী বলে প্রতিপন্ন করছ তুমি অর্জুন। এ মিথ্যে, এ অলীক। তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ নও। এই অস্ত্রকৌশল আমার বাম হাতের খেল। তুমি যা যা দেখিয়েছ বা যা যা দেখাবে, তার সবকিছুই আমার জানা। তার সবটুকুই আমি হেলায় করে দেখাব। তুমি যে শ্রেষ্ঠতম নও তার প্রমাণ দেব আমি।'

কর্ণের দর্পিত কথা শুনে দ্রুতপায়ে নিকটে আসতে আসতে দ্রোণাচার্য বললেন, 'কী বাতুলতা করছ তুমি, কর্ণ?'

'কোন বাতুলতার কথা বলছেন গুরুদেব?' জোড়হাত করে জিজ্ঞেস করল কর্ণ।

কর্ণের চোখমুখের ভাব দেখে আচার্য বুঝতে পারলেন কর্ণের জোড়হাত করার ব্যাপারটা লোকদেখানো। কর্ণের ভেতরে গুরুর প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধার লেশমাত্র আছে বলে মনে হলো না দ্রোণাচার্যের। 'এই যে তুমি বলছ, অর্জুন শ্রেষ্ঠতম ধনুর্ধর নয়। এই যে তুমি বলছ, অর্জুন যা জানে, তার সবটুকু তুমি জানো!' বললেন আচার্য।

'ঠিকই বলেছি আমি। অর্জুন যা জানে, তার চেয়ে বিন্দুমাত্র কম জানি না আমি।'

'তুমি শিক্ষাগ্রহণ অর্ধসমাপ্ত রেখে আমার পাঠশালা ত্যাগ করেছ। তোমার শিক্ষা পূর্ণ হয় নি।'

'আপনার হাতে আমার শিক্ষাগ্রহণ সম্পূর্ণ হয় নি সত্য। কিন্তু আমার অস্ত্রশিক্ষা গ্রহণ অসম্পূর্ণ থাকে নি।' সদম্ভে বলল কর্ণ।

গোটা রঙ্গভূমি নির্বাক। উৎকর্ণ হয়ে কর্ণ-দ্রোণাচার্যের কথোপকথন শুনতে চাইছে রঙ্গভূমির প্রতিটি মানুষ।

'কার কাছে শিখেছ তুমি?' বিস্মিত গলায় প্রশ্ন করলেন আচার্য।

'আপনার গুরু পরশুরামের কাছে।' বলল কর্ণ।

'গুরুদেব পরশুরামের কাছে?' বিস্ময় বিহ্বল প্রশ্ন দ্রোণাচার্যের।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তোমাকে অস্ত্রশিক্ষা দিলেন তিনি ? সূতপুত্রকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করলেন গুরুদেব ?' নিম্নকণ্ঠে প্রশ্নগুলো করে গেলেন আচার্য।

এই সময় রঙ্গভূমিতে গুঞ্জন উঠল। গুঞ্জন কোলাহলে পরিণত হলো। সবাই জানতে চান কী বিষয়ে কথা হচ্ছে দ্রোণাচার্য আর কর্ণের মধ্যে। অর্জুন নির্বাক, বোঝা যাচ্ছে। কারণ সামান্য দূরে সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অঙ্গভঙ্গি আর ঠোঁট নাড়া বুঝিয়ে দিচ্ছে কর্ণ আর দ্রোণ বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েছেন। কিন্তু বিতণ্ডার বিষয় ও কারণ সম্পর্কে কিছুই বুঝতে পারছেন না দর্শকমণ্ডলী। জনকোলাহলে কর্ণের উত্তর হারিয়ে যাচ্ছে। আচার্য স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন না কর্ণকে।

আচার্য হঠাৎ তাঁর দুটো হাত ওপর দিকে তুললেন। জনতার উদ্দেশেই হাত তুললেন তিনি। দু'হাতে একধরনের তরঙ্গ তুলে জনগণকে থামতে বললেন দ্রোণাচার্য। মুহূর্তে কোলাহল থেমে গেল।

ধীরস্থির ভীষ্মের মুখে স্মিত হাসির রেখা দেখা দিল। কর্ণ আর আচার্যের কথোপকথনের বিষয়বস্তু তিনি আঁচ করতে পেরেছেন। তিনি বিচক্ষণ। অভিজ্ঞতা আর জ্ঞান তাঁকে দূর-শ্রোতা করে তুলেছে। কর্ণ যে বিদ্যার্জন অসম্পূর্ণ রেখে আচার্যের অস্ত্রপাঠশালা ত্যাগ করেছিল, সে সংবাদ ভীষ্মের কাছে পৌঁছেছিল।

বিদুর একবার ভীষ্মের দিকে গভীর চোখে তাকিয়ে রঙ্গভূমির দিকে চোখ ফেরালেন।

গান্ধারী পার্শ্ববর্তিনী কুন্তীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'জনকোলাহল হঠাৎ করে থেমে গেল কেন কুন্তী ?'

গান্ধারী চক্ষুষ্মতী। কিন্তু স্বতো অন্ধ। স্বামী ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ। স্বামীর প্রতি আনুগত্য, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা দেখাবার জন্য বিয়ের তারিখ নির্ধারিত হওয়ার দিন থেকেই দুচোখে পট্টি বেঁধেছেন গান্ধারী, বস্ত্রখণ্ড দিয়ে। দু'চোখ বেঁধে স্বেচ্ছায় অন্ধত্বকে বরণ করে নিয়েছেন তিনি। চক্ষুষ্মতী হয়েও অন্ধ তিনি। তাই তিনি কুন্তীকে এরকম প্রশ্ন করলেন।

কুন্তী বললেন, 'প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারছি না দিদি। অর্জুনের অস্ত্রকৌশল প্রদর্শনের মাঝখানে রঙ্গভূমিতে হঠাৎ করে কর্ণ উপস্থিত হয়েছে। নিম্নস্বরে কী যেন বলছে সে গুরুদেবকে। গুরুদেব বোধহয় কর্ণের বক্তব্যকে সহজভাবে মেনে নিতে পারছেন না। গুরুদেব হঠাৎ ওপর দিকে দু'হাত তুলেছেন। এজন্য কোলাহল থেমে গেছে। কী হচ্ছে বুঝতে পারছি না দিদি।' শেষের দিকে তাঁর বুক চিড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। মন বলছে—তাঁর দুইপুত্রের মধ্যে গভীর একটা সংকট ঘনীভূত হয়ে উঠেছে।

'সঞ্জয় রঙ্গভূমি হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল কেন ? ধনুষ্টঙ্কার শুনছি না যে! গদার ঘর্ষণধ্বনি থেমে গেছে। দ্বিশূল-ত্রিশূলের শাঁ শাঁ শব্দ কোথায় ? কুরুপুত্রদের অস্ত্রকৌশল প্রদর্শনী কি শেষ হয়ে গেছে ?' জিজ্ঞেস করলেন ধৃতরাষ্ট্র।

'না মহারাজ, প্রদর্শনী শেষ হয়ে যায় নি এখনো। অর্জুন তাঁর অস্ত্রকৌশল দেখাচ্ছিলেন। মাঝপথে কর্ণ এসে এই প্রদর্শনীতে বোধহয় বাধা দিচ্ছেন। শেষের কথাটা আমার অনুমান মহারাজ।' সঞ্জয় ধীরে ধীরে বলল।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, 'বাধা দিচ্ছে ? কর্ণ ? তার এত বড় সাহস ? কুরুপুত্রদের প্রদর্শনীতে বাধা দিচ্ছে সে ?'

কণ্ঠস্বর উঁচুতেই পৌঁছে গিয়েছিল ধৃতরাষ্ট্রের। ভীষ্ম আর বিদুর তাঁর দিকে তাকালেন। তাঁদের চোখে কৌতুক আর কৌতূহল।

সঞ্জয় নিতান্ত নিচুকণ্ঠে বলল, 'দুর্যোধনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এই কর্ণ। আপনি উত্তেজিত হবেন না মহারাজ। নিশ্চয় কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ আছে। দুর্যোধনকেও পায়ে পায়ে কর্ণার্জুন আর আচার্যের দিকে এগিয়ে যেতে দেখছি।'

ধৃতরাষ্ট্র সংযতবাক হলেন।

AMARBOI.COM


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রাহ্মণো ভার্গবোহস্মি।
আমি ভার্গব গোত্রের ব্রাহ্মণ।

'হ্যাঁ, সূতপুত্র বলে যাকে আপনি ব্রহ্মাস্ত্রবিদ্যা দান করেন নি, শিক্ষার মধ্যপথে যাকে আপনি গুরুকুল থেকে অনেকটা বহিষ্কারই করে দিয়েছিলেন, সেই কর্ণকে সাদরে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন পরম গুরু পরশুরাম।' কর্ণ বলল।

বিস্মিত কণ্ঠে দ্রোণাচার্য বললেন, 'বহিষ্কার করে দিয়েছিলাম আমি! তোমাকে! আমার পাঠশালা থেকে!'

'বহিষ্কারই তো করেছেন আপনি। যে গুরু সমান মেধাবান শিষ্যকে সমান শিক্ষা না দিয়ে পক্ষপাতিত্ব করেন, তাঁকে যথার্থ গুরু বলা যাবে কি না জানি না। মেধায় অর্জুনের চেয়ে আমি কোনো অংশে কম ছিলাম না। কিন্তু আপনার পক্ষপাতিত্ব ছিল অর্জুনের দিকে। নিজপুত্র বলে অশ্বত্থামাকে আর রাজপুত্র বলে অর্জুনকে আপনি ব্রহ্মাস্ত্র দান করলেন। আমাকে বিমুখ করলেন আপনি। বললেন, ব্রাহ্মণরাই এই মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্রের অধিকারী হতে পারে শুধু। অর্থহীন কীসব যুক্তি দিয়ে বোঝালেন, ক্ষত্রিয়রাও এই অস্ত্রের অধিকারী হতে পারে। সূতপুত্র বলে আমাকে ঘৃণা আর অবহেলায় ভিড়িয়ে দিলেন।' দম নেওয়ার জন্য একটু থামল কর্ণ।

তারপর আবার বলল, 'এরপর কোনো শিষ্য কি ভক্তিশ্রদ্ধা নিয়ে আপনার বিদ্যালয়ে বিদ্যার্জন করতে পারে ? পারে না। আপনি পরোক্ষে বলে দিলেন, সূতপুত্র হওয়া সত্ত্বেও করুণাবশে তোমাকে এতদিন অস্ত্রশিক্ষা দিয়েছি আমি। মর্যাদাহীন বংশে জন্মে তুমি ব্রহ্মাস্ত্রের অধিকার চাইছ ? তোমার আর আমার পাঠশালায় স্থান নেই। এরকমই তো ভাবে-ভঙ্গিতে বুঝিয়েছিলেন সেদিন আপনি আমাকে ? বহিষ্কারই তো বলা যায় একে ?'

কী বলবেন দ্রোণাচার্য বুঝে উঠতে পারছিলেন না। কর্ণের কথার কোনো উত্তর তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন অস্ত্রবিদ্যা-প্রদর্শনীর ময়দানে।

এই সময় অশ্বত্থামা বলে উঠল, 'তুমি থামো কর্ণ। আমার পিতাকে অপমান করার সাহস পেলে কোথা থেকে তুমি ?'

কথোপকথনস্থলে কখন অশ্বত্থামা এসে উপস্থিত হয়েছে, টের পান নি দ্রোণাচার্য। চমকে অশ্বত্থামার দিকে ফিরলেন। হাত তুলে অশ্বত্থামাকে থামতে বললেন।

দুর্যোধন বলল, 'অশ্বত্থামা, তুমি কথা বলবে না। এটা গুরু-শিষ্যের সমস্যা। ওঁদের সমাধান করতে দাও।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্ণ বলে উঠল, 'আমার সঙ্গে আপনার মতো হীন আচরণ করেন নি আচার্য পরশুরাম। সূতপুত্র জেনেও ব্রহ্মবিদ্যা দান করেছেন তিনি আমায়।' সত্যের সঙ্গে মিথ্যেকে মিশিয়ে কথা শেষ করল কর্ণ।

দ্রোণাচার্যের চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত। পরশুরাম বৈদিকসমাজের নীতিনির্ধারক। ব্রহ্মাস্ত্র সম্পর্কে কর্ণকে তিনি যা বলেছিলেন, তার সবটুকুই পরশুরামের কথা। তিনিই বলেছিলেন, 'হীনজাতির কেউ ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করার অধিকার রাখে না।' গুরুর কথাটাই বলেছিলেন তিনি কর্ণকে। সেই গুরুদেব পরশুরাম কী করে কর্ণকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করলেন! কী করে তিনি তার হাতে মারণাস্ত্র তুলে দিলেন ? নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না আচার্য।

দ্রোণাচার্যের কাছে পরশুরাম-সম্পর্কিত কর্ণের বক্তব্য ছিল পূর্বপরিকল্পিত। তার কথায় সত্যের চেয়ে মিথ্যে ছিল বেশি। দ্রোণের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে কর্ণ পরশুরামের কাছে উপস্থিত হয়েছিল। হাঁটু গেঁড়ে বসে করজোড়ে শিষ্যত্ব যাচনা করেছিল সে। বলেছিল, 'আপনি ত্রিভুবন-শ্রদ্ধেয় গুরুদেব, আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করার জন্য বহু যোজনপথ অতিক্রম করে এসেছি। আমাকে গ্রহণ করুন।'

পরশুরাম জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কোন কুলে জন্ম তোমার ?'

কর্ণ জানে,পরশুরামের মাহেন্দ্র বিদ্যালয়ে সূতপুত্রের পরিচয় চলবে না। ক্ষত্রিয়দেরও পছন্দ করেন না তিন সপ্তবার ক্ষত্রিয়ান্তক পরশুরাম। মিথ্যাচার করল কর্ণ। পরশুরামের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে বলল, 'আমি ভার্গব গোত্রের ব্রাহ্মণ।'

কাশ্যপ, ভরদ্বাজ অথবা মৌদ্গল্য ব্রাহ্মণ নয়, নিজেকে একেবারে ভার্গব ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিল কর্ণ। পরশুরাম বিগলিত হলেন। কর্ণকে তাঁর অস্ত্র পাঠশালায় স্বাগত জানালেন। কারণ তিনি নিজেই ভৃগুবংশীয় ভার্গব।

বড় যোদ্ধা হওয়ার জন্য, নিজেকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য কর্ণ অবিরাম সংগ্রাম করে গেছে। সর্বদা পরিবেশ আর পরিস্থিতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে তাকে। সূত অধিরথের ছেলে বলে দ্রোণাচার্যের পাঠশালায় তার অভীষ্ট লাভ হলো না। নিজেকে উন্নত করার জন্য অভিমানক্ষুব্ধ কর্ণ আরও বিখ্যাত অস্ত্রগুরু পরশুরামের কাছে গেল। নিজের মিথ্যে পরিচয় দিল পরশুরামকে।

কর্ণ যে নিজেকে ভার্গব বলে পরিচয় দিল, তার স্বপক্ষে একটা যুক্তি দাঁড় করাল মনে মনে। কর্ণ ভাবল—গুরু তো পিতার সমান। শাস্ত্র গুরুকে দ্বিতীয় পিতার স্বীকৃতি দিয়েছে। ভার্গব পরশুরামকে সে গুরু বলে মেনে নিয়েছে। সুতরাং নিজেকে ভার্গব বলে পরিচয় দিতে ক্ষতি কী ? এটা তো মিথ্যে নয়। তাই নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিল কর্ণ। আর এটা যদি মিথ্যাচারও হয়, অভীষ্ট সিদ্ধির জন্যই তো এরকম করেছে সে। তথাকথিত হীনবংশে জন্ম তার। অকুলীন কুলে জন্ম বলে সে কি কখনো বাঞ্ছিত সিদ্ধি অর্জন করতে পারবে না ? অবিরাম অপরিসীম লাঞ্ছনার শিকার হতে থাকবে সে ? না, কিছুতেই না। ব্রহ্মাস্ত্র লাভ তাকে করতেই হবে। এই বাসনায় নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করল না কর্ণ।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরশুরামের মাহেন্দ্র পাঠশালায় কর্ণের অস্ত্রশিক্ষা শুরু হলো। কঠোর পরিশ্রম আর নিষ্ঠা দিয়ে পরশুরামের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হলো কর্ণ। তার সেবামাধুর্যে এবং শ্রদ্ধায় পরম তৃপ্তি লাভ করলেন পরশুরাম। চোখা চোখা সকল বাণ কর্ণের হাতে তুলে দিলেন তিনি।

এসবের অনেকটাই কর্ণের পূর্ব-অধিগত। কিন্তু পরশুরামের সম্মুখে কর্ণ এমন কৃতজ্ঞের অভিনয় করে গেল, এ অস্ত্র যেন তার নতুন করে পাওয়া। এই অভিনয় সে অতি দক্ষতার সঙ্গেই করল। গুরুর প্রতি যে সে সবিশেষ অনুরাগী, সেটা তাকে প্রমাণ করতেই হবে। গুরুর তৃপ্তিতে তার ব্রহ্মাস্ত্র পাওয়ার পথটি কুসুমাস্তীর্ণ হবে।

শেষ পর্যন্ত পরশুরামের মন সন্তুষ্টিতে ভরে গেল। একদিন কর্ণের হাতে ব্রহ্মাস্ত্র তুলে দিলেন পরশুরাম। শিখিয়ে দিলেন এই মারণাস্ত্রের গ্রহণ, ধারণ এবং সংবরণের সমস্ত কৌশল।

শিক্ষণ-প্রশিক্ষণের প্রক্রিয়া তখনো চলছিল। প্রক্রিয়া চলাকালীন এক বিকেলে সেই দুর্ঘটনাটি ঘটে গেল। এই ঘটনাটির পরিপ্রেক্ষিতে কর্ণের প্রকৃত পরিচয় উদ্‌ঘটিত হলো গুরুদেব পরশুরামের কাছে।

সেদিন উপবাসে ছিলেন পরশুরাম। ক্লিষ্ট দেহ। ক্লান্ত পরশুরাম শিষ্য কর্ণের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। এই সময় একটি কাঁকড়াবিছে কর্ণের উরু ভেদ করে রক্ত খেতে লাগল। নড়াচড়া করলে গুরুর ঘুমের ব্যাঘাত হবে—এই আশঙ্কায় কর্ণ এতটুকু নড়ল না। কিন্তু কর্ণের উরু চুঁইয়ে-পড়া রক্ত পরশুরামের গায়ে লাগল। তিনি জেগে গেলেন। তিনি দেখলেন—নিষ্কম্প প্রদীপের মতো কর্ণ স্থির হয়ে বসে আছে। অসহ্য ব্যথা নিজে সহ্য করেছে, কিন্তু গুরুর নিদ্রায় বিন্দুমাত্র বিঘ্ন সৃষ্টি করে নি।

পরশুরামের মনে হঠাৎ সন্দেহের উদ্রেক হলো—এই অসহনীয় ব্যথা কর্ণ সহ্য করল কী করে ? একজন ব্রাহ্মণের পক্ষে এরকম কষ্টসহিষ্ণু হওয়া সম্ভব নয়। ব্রাহ্মণরা যেরকম ক্রোধপরায়ণ, তাদের পক্ষে কাঁকড়াবিছের কামড় মেনে নেওয়া অসম্ভব। হয় ওরা পোকাটিকে পিষে মারত, না হয় গোটা বিছে জাতটাকেই ধ্বংসের অভিশাপ দিত। এ দুটোর কোনোটাই করল না কর্ণ।

তাহলে, তাহলে কি সে ব্রাহ্মণ নয় ? সন্দেহ ধূম্রজাল পাকাল পরশুরামের মনে। সন্দেহতাড়িত পরশুরাম কর্ণকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কে ? কে তুমি ?'

কর্ণ কোনো উত্তর দিল না। বিভ্রান্ত চোখে গুরুদেবের দিকে শুধু তাকিয়ে থাকল।

পরশুরাম জোরগলায় আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি পরিষ্কার করে বলো, কে তুমি ?'

এবার কর্ণ বলল, 'আমি কর্ণ। আমার বড় পরিচয় আমি মহাত্মা পরশুরামের অস্ত্রশিষ্য।'

'তা বুঝলাম। তুমি নিজেকে ভার্গব ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিয়েছ। আমার সন্দেহ হচ্ছে—তুমি ব্রাহ্মণ নও।'

এবার বিনীতভাবে কর্ণ জিজ্ঞেস করল, 'আপনার এরকম সন্দেহের কারণ কী গুরুদেব ?'

আস্থার কণ্ঠে পরশুরাম বলে উঠলেন, 'ব্রাহ্মণের সহ্যশক্তি কতটুকু তা আমার ভালো করেই জানা। কীটের কামড় সহ্য করার মতো ধৈর্য ব্রাহ্মণের নেই। এরকম সহ্যশক্তি শুধু ক্ষত্রিয়েরই আছে। অতএব বলো তুমি কে ? কী তোমার প্রকৃত পরিচয় ?'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবার কর্ণ আর লুকোচুরিতে গেল না। নিজের প্রকৃত পরিচয় জানিয়ে বলল, 'আমি এমন দম্পতির ঘরে জন্মেছি, যাদের একজন ব্রাহ্মণ, অন্যজন ক্ষত্রিয়।'

'মানে!' চোখ বড় বড় করে বললেন পরশুরাম।

কর্ণ পরশুরামকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে বলল, 'হ্যাঁ মহাত্মা, আমার মা ব্রাহ্মণকন্যা। বাবা ক্ষত্রিয়। মায়ের নাম রাধা। লোকে আমাকে রাধেয় কর্ণ বলে ডাকে।'

পিতার পরিচয়ে নিজের পরিচয় দিল না কর্ণ, বলল না—আমি অধিরথ পুত্র। মায়ের পরিচয়ে নিজের পরিচয় দিল এই ভেবে যে, পিতার পরিচয় যা-ই হোক, মা তো ব্রাহ্মণকন্যা। সুতরাং আমার জাত-পরিচয়ের হীনতা কোথায় ? ব্রাহ্মণকন্যা রাধার একটা সামাজিক উচ্চতা আছে, সেই উচ্চতায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইল কর্ণ, গুরু পরশুরামের সামনে। তাই সে জোরগলায় নিজেকে রাধেয় কর্ণ বলে পরিচয় দিতে দ্বিধান্বিত হলো না।

কর্ণের কথা শুনে পরশুরাম ভেতরের ক্রোধকে বাইরে টেনে আনলেন না। জ্বলন্ত লাভাসম ক্রোধকে নিজের মধ্যে চেপে রেখে কর্ণের দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকলেন।

মিথ্যে বলার ভীতিটা তখন কর্ণের কেটে গেছে। সত্যকে লুকিয়ে রেখে মিথ্যের অভিনয় করে যাওয়ার যন্ত্রণা থেকে সে এখন মুক্ত। খাঁচায় বন্দি পাখিটি মুক্তাকাশে উড়াল দেওয়ার সুযোগ পেলে যেমন করে উল্লসিত হয়ে ওঠে, কর্ণেরও সেরকম অবস্থা এখন। তার মাথায় এখন মিথ্যের বোঝা নেই, হৃদয়ে নেই অসত্যের জগদ্দল পাথরের চাপ।

ভীতিহীন চোখে স্পষ্ট গলায় সে আবার বলল, 'আমি অস্ত্রলুব্ধ হয়েই আপনার কাছে এসেছিলাম। এই সত্যটুকু শুনে, আমার বিশ্বাস, আপনি প্রসন্ন হবেন।'

তার পর জোরে শ্বাস টেনে বুকে প্রচুর বাতাস ঢুকিয়ে নিল কর্ণ। এই বাতাসটুকু হয়তো তাকে আরও সাহসী করে তুলল। সাহসী গলাতেই সে বলল, 'যে প্রশ্নটি আমাকে আপনি করেন নি, সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই আমি। আপনার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করছি গুরুদেব।'

পরশুরাম মুখে কিছু বললেন না। আগের মতো তাকিয়ে থাকলেন কর্ণের দিকে।

কর্ণ বলল, 'আমি হস্তিনাপুর থেকে এসেছি, আগেই বলেছি আপনাকে। হস্তিনাপুরে আচার্য দ্রোণের বসবাস। ওখানে অস্ত্রপাঠশালা আছে তাঁর। তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ না করে আপনার কাছে কেন এসেছি এরকম প্রশ্ন আপনার মনে জাগতে পারে। আচার্য দ্রোণ আপনার প্রিয় শিষ্য, খ্যাতিমান অস্ত্রবিদ্। তাঁর কাছে আমার অস্ত্রবিদ্যাভ্যাস করাই তো স্বাভাবিক ছিল।'

এবার কথা বললেন পরশুরাম, 'তাই তো। এই প্রশ্নটি তো আগে ভাবি নি।'

'আপনাকে এই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। আচার্য দ্রোণের পাঠশালার ছাত্র ছিলাম আমি। কুরু রাজপ্রাসাদের চাপে পড়ে হোক বা অনুরাগের বশে, তিনি আমাকে শিক্ষার্থী হিসেবে


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভর্তি করিয়েছিলেন তাঁর অস্ত্রপাঠশালায়। প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াও চলছিল যথানিয়মে। আচার্যের মধ্যে সন্তানবাৎসল্যের আধিক্য। আপনি তো জানেন, স্নেহ মানুষকে অন্ধ করে। বাৎসল্যাধিক্যের কারণে তিনি অশ্বত্থামার প্রতি পক্ষপাতিত্ব শুরু করলেন। এটা স্বাভাবিক। আচার্য তো একজন রক্তমাংসের মানুষ। তাঁর মধ্যে সন্তানস্নেহ থাকা অতিশয় যুক্তিগ্রাহ্য। কিন্তু অর্জুনের প্রতি তাঁর অহেতুক পক্ষপাতিত্ব আমার ভালো লাগে নি।'

'অহেতুক পক্ষপাতিত্ব ? অর্জুনের প্রতি যুক্তিহীন পক্ষপাতিত্ব দেখাবে কেন দ্রোণ ? গুরুর কাছে সব শিষ্যই তো সমান। একজন গুরুর কর্তব্য তো সকল ছাত্রকে সমান মর্যাদায় শিক্ষা দান করা।'

'না মহাত্মা, দ্রোণাচার্য তাঁর সকল ছাত্রকে সমান মর্যাদায় অস্ত্রশিক্ষা দেন নি। পুত্র ছাড়াও অর্জুনের প্রতি তিনি গভীর পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। অন্য শিষ্যদের যে বিদ্যা শিখান নি, অর্জুনকে তা শিখিয়েছেন। সবচাইতে আপত্তির কথা—তিনি অর্জুনকে ব্রহ্মাস্ত্র দান করেছেন।'

'একজন গুরু তাঁর যে-কোনো প্রিয় শিষ্যকে ব্রহ্মাস্ত্র দিতে পারেন।'

'আপনার কথা মানলাম আচার্য। কিন্তু সমান মেধার অন্য কাউকে তিনি যদি বঞ্চিত করেন, তবে সেই শিষ্যের রাগ বা অভিমান করার অধিকার আছে কি না ?' এবার উল্টো পরশুরামকে প্রশ্ন করে বসল কর্ণ।

পরশুরাম বললেন, 'শিষ্যটি যদি মেধাবান হয়, যদি শ্রদ্ধাশীল হয়, যদি কষ্টসহিষ্ণু হয়, যদি অধ্যবসায়ী হয়, তাহলে তো তাঁরও এই মারণাস্ত্রটি পাওয়ার অধিকার থাকে।'

'সেই অধিকার থেকে দ্রোণাচার্য আমাকে বঞ্চিত করেছেন। একজন উপযুক্ত শিষ্যের যে যে গুণের কথা আপনি বললেন, তার সবটুকু যে আমার মধ্যে আছে, এই ক'বছরের প্রশিক্ষণে তা আপনি অনুধাবন করতে পেরেছেন।'

পরশুরাম বললেন, 'অস্বীকার করবার উপায় নেই, তুমি গুণান্বিত।'

'তার পরও হীনজাতে জন্ম বলে আচার্য দ্রোণ আমাকে ব্রহ্মাস্ত্রবিদ্যা দান করেন নি। দান করলেন নিজপুত্র অশ্বত্থামাকে আর ক্ষত্রিয়জ অর্জুনকে। সূতপুত্র বলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলেন তিনি আমাকে। বললেন, নিম্নবর্ণজাত কেউ ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্তির অধিকার রাখে না।' ক্ষোভের সঙ্গে বলল কর্ণ।

ফাঁপরে পড়ে গেলেন পরশুরাম। একদিকে জাত্যাভিমান, অন্যদিকে কর্ণের যুক্তি—কোনটাকে গ্রাহ্য করবেন তিনি ? যুক্তিকে মেনে নিলে তাঁর বহুদিনের লালিত জাত্যাভিমান ভেসে যায়। তাতে সমাজকাঠামো, বৈদিক রীতিনীতির সমাধি ঘটবে। তিনি একজন ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের হাত দিয়ে তো ব্রাহ্মণ্যবাদের চ্যুতি ঘটতে পারে না।

ভাবতে ভাবতে পরশুরামের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যবোধ প্রবল হয়ে উঠল। কণ্ঠকিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'দ্রোণ কী পরিস্থিতিতে তোমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে তা সে-ই ভালো বলতে পারবে। তবে তুমি যদি আমাকে জিজ্ঞেস কোরো—দ্রোণ সঠিক কাজ করেছে কী বেঠিক


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছে, আমি বলব, ব্রাহ্মণ হয়ে সে যথার্থ কাজই করেছে। মানে অক্ষত্রিয়-অব্রাহ্মণ তোমাকে ব্রহ্মাস্ত্রবিদ্যা না দিয়ে দ্রোণ যথার্থ কাজটিই করেছে।'

'আর এইজন্যই মিথ্যে পরিচয় দিয়ে আমি আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছি। একজন ছাত্রের মধ্যে যদি উদগ্র উচ্চাশা থাকে, যদি সে মেধাবান আর অধ্যবসায়ী হয়, শুধু তথাকথিত হীনবংশে জন্ম বলে তার উচ্চাশার পূরণ হবে না কেন ? যদি তা-ই হয়, আচার্য দ্রোণ ব্রাহ্মণ হয়ে জাতিগত পেশা ত্যাগ করে ধনুর্বিদ হলেন কেন ?'

'একজন ব্রাহ্মণের পেশা বদলের অধিকার আছে। ইচ্ছে করলে সমরক্ষেত্রে যুদ্ধও সে করতে পারবে।'

'মানে যত কঠোর কঠিন সামাজিক শৃঙ্খল শুধু আমাদের জন্য। শূদ্র আর বৈশ্যের ঘরে জন্মায় যারা, তাদের উন্নততর জীবনযাপনের কোনো অধিকারকে অনুমোদন করে নি আপনাদের শাস্ত্রাদি!'

যে ছাত্রটি অধোবদনে সর্বদা তাঁর প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে, মাহেন্দ্র বিদ্যালয়ের বৈদিক রীতিনীতি যে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়ে দীর্ঘদিন অস্ত্রবিদ্যা চর্চা করে গেছে, সেই কর্ণ আজ কী বলছে! এই শান্ত যুবকটির হৃদয়ে এত প্রতিবাদ, এত বেদনা জমা হয়ে ছিল!

মৃদু কণ্ঠে পরশুরাম বললেন, 'বহু বছরের প্রচলিত শাস্ত্রপ্রথা ভাঙার অধিকার তো আমার নেই। মেনে নিলাম—ব্রহ্মাস্ত্রবিদ্যার্জনের প্রবল বাসনা তোমার মধ্যে ছিল, ছাত্র হিসেবে তা পাওয়ার অধিকারও তুমি দাবি করতে পারো, কিন্তু সমাজবিধি বলে একটা কথা আছে।'

গুরুর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কর্ণ বলে উঠল, 'মানে যতই নিষ্ঠাবান বা মেধাবী আমি হই না কেন, শুধু অকুলীন বংশে জন্ম বলে ওই অস্ত্র পাওয়ার অধিকার আমার নেই। এই তো বলতে চাইছেন আচার্য ?'

পরশুরাম বললেন, 'তুমি যথার্থ বুঝতে পেরেছ বৎস।'

'আর এই জন্যই আমার জন্মপরিচয় লুকিয়ে ভার্গব ব্রাহ্মণ বলে নিজের মিথ্যে পরিচয় দিয়ে আপনার শিষ্য হয়েছি। আপনি দয়াপরবশ হয়ে আমাকে নিপুণ অস্ত্রবিদে পরিণত করেছেন। শুধু তাই নয়, ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ-সংবরণের কৌশলও আমাকে শিখিয়ে দিয়েছেন।'

'মিথ্যে বলার অপরাধের জন্য তোমাকে শাস্তি পেতেই হবে।' পরশুরামের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যচিন্তা হঠাৎ চাগিয়ে উঠল।

ত্রস্ত গলায় কর্ণ জিজ্ঞেস করল, 'শাস্তি পেতে হবে আমায় ?'

'শাস্তি নয়, অভিশপ্ত হতে হবে তোমায়।' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে এবার বললেন পরশুরাম।

বিহ্বল চোখে কর্ণ বলল, 'অভিশপ্ত হতে হবে! আমি তো জাতবর্ণ-বিন্যাসের বিপরীতে দাঁড়িয়ে নিজের বোধবুদ্ধি আর কৌশলকে প্রয়োগ করতে চেয়েছি মাত্র।'

'মিথ্যে তো বলেছ। মিথ্যে বলার শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে।' রোষ কষায়িত চোখে পরশুরাম বললেন।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্ণের মুখে আর কোনো কথা সরল না। ভীতিময় চোখে গুরু পরশুরামের দিকে তাকিয়ে থাকল।

এই সময় পরশুরাম আবার বলে উঠলেন, 'মিথ্যে পরিচয় দিয়ে বিদ্যার্জন করার অপরাধে তোমাকে আমি কঠিন দণ্ড দিতে পারতাম। কিন্তু তোমার নিষ্ঠা দেখে আমি তুষ্ট হয়েছি। তাই তোমাকে আমি লঘুদণ্ড দিচ্ছি।'

এর পর ক্রোধ পরশুরামকে উন্মত্ত করল। তিনি ক্রোধান্বিত গলায় বললেন, 'শুধু অস্ত্রপ্রাপ্তির লোভে তুই আমার সঙ্গে মিথ্যে আচরণ করেছিস, আমি তোকে অভিশাপ দিচ্ছি— সংকটমুহূর্তে যখন তোর বিনাশকাল ঘনিয়ে আসবে, ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগকৌশল তুই বিস্মৃত হবি। ভুলে যাবি তুই এই অস্ত্রের নিক্ষেপণ প্রক্রিয়া।' বলে পরশুরাম নিজের ক্রোধকে সংবরণের চেষ্টায় রত হলেন।

পরশুরামের পা জড়িয়ে ধরে কর্ণ বলল, 'আচার্য, আপনার ক্রোধ সংবরণ করুন। আমার অপরাধ মার্জনা করুন।'

পরশুরাম স্থিতধী হয়ে ধীরে ধীরে বললেন, 'তবে হ্যাঁ, তোমাকে এই আশীর্বাদটুকু দিচ্ছি, যুদ্ধকালে তোমার সঙ্গে কোনো ক্ষত্রিয়পুরুষ এঁটে উঠবে না।' এই বলে তিনি মৌন হলেন।

গুরু পরশুরামের শেষ আশ্বাস বাক্যটিকে সম্বল করে কর্ণ হস্তিনাপুরে ফিরে এল। ফিরে সুহৃদ দুর্যোধনের সঙ্গে দেখা করল। প্রাসাদ-অভ্যন্তরে কয়েকদিন বিশ্রাম নিল। এবং যথাদিনে রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হয়ে অর্জুনের মুখোমুখি হলো।

AMARBOI.COM


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যৎ কৃতং তত্র পার্থেন তচ্চকার মহাবলঃ।
অর্জুন যা যা করে দেখাল, কর্ণও তার সবকিছু করে দেখাল।

'মহামহিম পরশুরাম আমাকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং ব্রহ্মাস্ত্রবিদ্যা দান করেছেন।' দ্রোণাচার্যের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল কর্ণ।

'আপনি চাইলে এই রঙ্গভূমির আপামর জনগণকে আমার করায়ত্ত ব্রহ্মাস্ত্র-প্রয়োগ-কৌশল দেখাতে প্রস্তুত আমি।' সমবেত রাজন্য আর জনসাধারণের ওপর দৃষ্টি ফেলে কথা শেষ করল কর্ণ। পরশুরামের অভিশাপের কথা চেপে গেল সে।

এই সময় দুর্যোধন হাততালি দিয়ে উঠল। বলল, 'বাহবা, বাহবা মিত্র। তুমি ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করেছ ? কী আনন্দ! কী সুখের সংবাদ এটি!'

দ্রোণাচার্য বললেন, 'তুমি থামো দুর্যোধন। বালকের মতো আচরণ করছ কেন ? এটা রঙ্গভূমি। শতসহস্র চোখ আমাদের ওপর। তোমার বালখিল্য আচরণ দেখে ওঁরা তোমার সম্পর্কে কী ভাববেন ?'

গুরুর ধমক খেয়ে আপাতত চুপ মেরে গেল দুর্যোধন। কিন্তু কর্ণ দমল না।

উপহাসের কণ্ঠে কর্ণ বলে উঠল, 'সূতপুত্র বলে যে-আমাকে আপনি একদিন ব্রহ্মাস্ত্রবিদ্যার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিলেন, দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, সেই কর্ণকে শিষ্যত্ব দিয়েছেন পরশুরাম।'

কর্ণের কথায় ভীষণ চিন্তান্বিত দেখাল দ্রোণাচার্যকে। গম্ভীর মুখে ঊর্ধ্বাকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

এই সময় অর্জুন বলে উঠল, 'তুমি মিথ্যে বলছ কর্ণ। মিথ্যে বলে গুরুদেবকে বিভ্রান্ত করছ। মহাত্মা পরশুরাম তোমার মতো সূতপুত্রকে কখনো শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন না। যদি করেই থাকেন, তুমি তাঁর কাছে নিজের বংশপরিচয় লুকিয়েছ!'

কর্ণ দেখল, তাঁর জারিজুরি ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। কঠোর কণ্ঠে বলে উঠল, 'আচার্য আর আমার মধ্যে কথা হচ্ছে। মাঝখানে তুমি কথা বলার কে ? তুমি তো একজন সুবিধাবাদী। প্রবঞ্চক তুমি। আমাকে প্রবঞ্চিত করে ব্রহ্মাস্ত্রবিদ্যা হাতিয়ে নিয়েছ দ্রোণাচার্যের কাছ থেকে।'

অর্জুন প্রত্যুত্তর দিতে যাচ্ছিল, হাত তুলে তাকে থামালেন দ্রোণ। বললেন, 'এখানে রাজপুত্রদের অস্ত্রবিদ্যা প্রদর্শন চলছে। তুমি রাজপুত্র নও, সূত অধিরথপুত্র। তোমার এই রঙ্গভূমিতে থাকার অধিকার নেই। তুমি এই স্থান ত্যাগ কোরো কর্ণ।'


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আবার জাতপাতের কথা তুললেন গুরুদেব! জাতপাত তো আপনাদেরই সৃষ্ট। শোষণ-শাসনের সুবিধার জন্য ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় মিলে বর্ণপ্রথার কঠিন নিগড়টি তৈরি করেছেন। কঠোর শৃঙ্খলে বেঁধেছেন রাজ্যের অধিকাংশ খেটেখাওয়া মানুষকে। দেশের অধিকাংশ মানুষই তো বৈশ্য আর শূদ্র।'

কর্ণকে আজ কথায় পেয়ে বসেছে। একদিন যে দ্রোণাচার্য তার গুরু ছিলেন, তাঁরই হাতে যে তার বাছা বাছা অস্ত্রশিক্ষা সম্পন্ন হয়েছিল, কর্ণ তা ভুলে গেল। বলল, 'রাজপুত্রের দোহাই দিয়ে আমাকে বিতাড়িত করতে চাইছেন এই রঙ্গভূমি থেকে। তা না হয় মানলাম। রাজপুত্র নই বলে রঙ্গভূমি ত্যাগ করলাম আমি। কিন্তু একলব্য তো রাজপুত্র ছিল, নিষাদরাজ্যের রাজপুত্র ছিল সে। তাকে কেন আপনি বঞ্চিত করলেন ?'

বিস্ফারিত চোখে কর্ণের দিকে তাকালেন দ্রোণাচার্য। বললেন, 'একলব্যের কথা তুমি জানলে কী করে ? তখন তো তুমি পাঠশালায় ছিলে না।'

'সত্য কখনো গোপন থাকে গুরুদেব ? আপনি একলব্যকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন গুরুদেব। বলেছেন, হীনজাতে জন্ম তোমার, তুমি আমার শিষ্য হওয়ার যোগ্য নও। ঠিক বলছি না আমি গুরুদেব ?'

এই রকম বিব্রতকর অবস্থায় আগে কখনো পড়েন নি দ্রোণাচার্য। হ্যাঁ, আরেকদিন বিব্রত, উন্মত্ত, বাছাবাছা হয়েছিলেন তিনি। দ্রুপদের রাজসভায় যেদিন বন্ধুত্বের দাবি নিয়ে রাজা দ্রুপদের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন তিনি, সেদিন দ্রুপদ বন্ধুত্ব অস্বীকার করে তাঁকে অপমানে অপমানে জর্জরিত করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান দিনের সঙ্গে ওইদিনের পার্থক্য আছে। ওইদিন ক্রোধান্বিত দ্রোণ বলে উঠেছিলেন, 'একদিন তোমার এই অপমানের প্রতিশোধ নেব আমি দ্রুপদ, পায়ের তলায় ফেলব আমি তোমাকে একদিন।'

কিন্তু আজ কী করবেন তিনি ? একের পর এক যুক্তি দাঁড় করিয়ে কর্ণ তাঁকে যেভাবে ঘায়েল করছে, তার উপযুক্ত জবাব তো তাঁর কাছে নেই। শাস্ত্রের দোহাই দেবেন তিনি ? আগে যেভাবে বলেছেন, সেভাবে বলবেন ? বলবেন, ক্ষত্রিয় ছাড়া অস্ত্রশিক্ষার বিধি নেই ? এটাই শাস্ত্রনিয়ম। কিন্তু শাস্ত্রবিধি কি তিনি ভাঙেন নি ? তিনি ব্রাহ্মণ হয়েও যজনযাজন আর শাস্ত্রপাঠ ত্যাগ করে অস্ত্রবিদ্ হন নি ? খোঁড়া যুক্তি দিয়ে কর্ণের মুখ বন্ধ করা যাবে না আজ।

এই সময় কর্ণ আবার কথা বলে উঠল, 'একলব্যের দুর্গতির কথা আমি মিত্র দুর্যোধনের কাছে শুনেছি।'

পরশুরামের মাহেন্দ্র বিদ্যালয় থেকে অভিশপ্ত কর্ণ ফিরে কুরুরাজপ্রাসাদে আশ্রয় নেয়। মিত্র দুর্যোধনকে তার আগমনবার্তা চেপে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে। বলে, 'উপযুক্ত সময়ে আমি নিজের উপস্থিতি জানান দেব।' সেই সময় গোটা রাজপ্রাসাদ জুড়ে, শুধু রাজপ্রাসাদ কেন, গোটা রাজধানী জুড়ে অস্ত্রবিদ্যা প্রদর্শনীর তোড়জোড় চলছিল। 'ক'দিন তোমার নিকটে থাকতে দাও মিত্র।' বলে কথা শেষ করেছিল কর্ণ।

দুর্যোধনের সাহচর্যে থাকার সময় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব তথ্য জেনে নিয়েছিল কর্ণ।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্জুনের মৃন্ময়পক্ষীর গলাকর্তন, যুধিষ্ঠির-দুর্যোধনাদিকে পরীক্ষা ছাড়া অকৃতকার্য ঘোষণা করা আর একলব্য-বিষয়ক ঘটনার অনুপুঙ্খ বিবরণ দুর্যোধনের কাছ থেকে জেনে নিয়েছিল কর্ণ। মোক্ষম সময়ে সেই তথ্যকে কাজে লাগাল সে। বলল, 'আমি কিন্তু এখনো আমার উত্তর পাই নি গুরুদেব। রাজপুত্র হয়েও কেন একলব্য আপনার শিষ্য হওয়ার অনুমতি পেল না ?'

'আমার উত্তর তোমাকে অনেক আগেই দিয়েছি। যেদিন তুমি ব্রহ্মাস্ত্র করায়ত্ত করবার জন্য আমার কাছে গিয়েছিলে, সেদিনের উত্তরই আমার আজকের উত্তর।' মৃদুকণ্ঠে বললেন আচার্য।

'অর্থাৎ আপনি উচ্চবর্ণের গুরু। নিচুদের নন। বেছে বেছে উঁচুজাতের ধনাঢ্য সন্তানদের আপনি অস্ত্রশিক্ষা দেবেন। কর্ণ আর একলব্যের মতো তথাকথিত হীনজাতের মানুষরা আপনার কৃপা থেকে বঞ্চিত হবে, এই তো বলতে চাইছেন আপনি ?' কর্ণের সারা মুখে উপহাসের হাসি ছড়িয়ে পড়ল।

দ্রোণাচার্য দেখলেন—এই বিতণ্ডায় রঙ্গভূমি ঔজ্জ্বল্য হারাতে বসেছে। সমবেত মানুষরা গভীর ঔৎসুক্য নিয়ে তাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে। কর্ণকে আর সুযোগ দিলে তাঁর সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। কর্ণকে থামানো দরকার।

কর্ণকে উদ্দেশ করে দ্রোণাচার্য বললেন, 'তোমার যদি আর কিছু বলার থাকে আমি শুনব। তবে এই রঙ্গভূমিতে নয়, একান্তে। এখন অর্জুনকে তার কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দাও।'

'তা হবে না গুরুদেব। অর্জুনকে আমি সেই সুযোগ দেব না। এই রঙ্গভূমিতে প্রমাণ করব, আমি অর্জুনের চেয়ে কোনো অংশে কম নই, বরং বাড়া।' ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলল কর্ণ।

ওই দিকে রঙ্গভূমির মানুষরা উত্তাল হয়ে উঠলেন। সমবেত কণ্ঠে আওয়াজ উঠল, 'আমাদের ধৈর্য শেষ। প্রদর্শনীর কাজ শুরু করুন গুরুদেব।'

কৌতূহলী জনতার চিৎকার শুনে দ্রোণ কর্ণকে অনুমতি দিতে বাধ্য হলেন। এরপর অর্জুন অস্ত্র নিক্ষেপণ আর সংবরণের যতরকম কৌশল দেখাল, তার প্রত্যেকটি অতি দক্ষতার সঙ্গে করে দেখাল কর্ণ। এতক্ষণ একতরফাভাবে রঙ্গমঞ্চে শুধু অর্জুনেরই প্রশংসা চলছিল, সেই প্রশংসার সিংহভাগ চলে গেল কর্ণের দিকে।

কর্ণের বাণমুখর অস্ত্রকুশলতা দেখে দুর্যোধন-দুঃশাসনাদি শতভাই অতিশয় উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তারা কর্ণের নিকটে এগিয়ে এল।

সাভিনন্দনে কর্ণকে জড়িয়ে ধরে দুর্যোধন বলল, 'অর্জুনকে লা-জবাব করে দিয়েছ মিত্র। উচিত শিক্ষা দিয়েছ তাকে। তার গরিমা বড় বেড়ে গিয়েছিল, শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে মাটিতে পা পড়ছিল না তার। তুমি অজস্র মানুষের সামনে তার দর্প ভেঙে একেবারে চুরমার করে দিলে। আমাদের ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। আমার সকল ভাইয়ের যেমন, তেমনি তোমারও আজ থেকে কুরুরাজ্যের সমস্ত ভোগ্যদ্রব্যের ওপর অধিকার বর্তাল।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিচক্ষণ কর্ণ দ্রুত বলে উঠল, 'ওসবের কিছু চাই না আমি মিত্র। আমি শুধু তোমার বন্ধুত্বের প্রত্যাশী। আর অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাই আমি।'

কর্ণের কথা শুনে শতভাই তাকে ঘিরে ধরে উল্লাস প্রকাশ করতে লাগল। অর্জুন বিষণ্ন মুখে দাঁড়িয়ে থাকল। সমস্ত মাঠ কর্ণের পক্ষে জয়ধ্বনি দিচ্ছে তখন।

কর্ণ অর্জুনের দিকে এগিয়ে গেল। তীক্ষ্ণ চোখে ঘৃণা ছড়িয়ে বলল, 'তোর সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাই আমি। তোর গুরুর সামনেই যুদ্ধ করব, ওঁর সামনেই তোর মাথা কেটে মাটিতে নামাব আমি।'

সমস্ত রঙ্গভূমিতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। ভীষ্ম উদ্বেগাকুল হয়ে উঠলেন। উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়ল কুন্তীর সমস্ত মুখে। ধৃতরাষ্ট্র আর গান্ধারী ঘনঘন প্রশ্ন করে পরিস্থিতি জেনে নেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন।

বিদুর দেখলেন—পরিবেশ-পরিস্থিতি ভয়ংকর রূপ ধারণ করছে। পাশে বসা কৃপাচার্যের দিকে ইংগিতময় চোখে তাকালেন তিনি। কৃপাচার্য যা বোঝার বুঝে গেলেন। আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। চিৎকার করে বললেন, 'থামো তুমি কর্ণ। তোমার উল্লম্ফন থামাও।'

একটা ঢোঁক গিললেন কৃপাচার্য। তারপর সেই চরম অপমানজনক শব্দটি উচ্চারণ করলেন, 'যুদ্ধের আগে নিজের গোত্রপ্রবরের কথা জানাতে হয়। অর্জুন রাজপুত্র। কর্ণ, তুমি কোন বংশের ছেলে বলো। তোমার জন্মপরিচয় জেনে অর্জুন তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে।'

আবার সেই জন্মযাতনা। এই জন্মপরিচয় তাকে যমদূতের মতো আজীবন তাড়িয়ে বেড়িয়েছে, এই জন্মপরিচয় তার জীবনোন্নয়নের পথে বারবার অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সকল কিছু থাকা সত্ত্বেও শুধু জন্ম-হীনতার কারণে দ্রোণাচার্য তাকে মর্যাদা দেন নি। আচার্য পরশুরাম তাকে অভিশাপ দিয়েছেন। এই সকল প্রতিকূলতা অতিক্রম করে আজ যখন নিজেকে প্রমাণিত করার উদ্যোগ নিয়েছে সে, ঠিক তখনই আবার জন্মগোত্র পরিচয়ের কথাটি উচ্চারণ করলেন প্রথমগুরু কৃপাচার্য।

কৃপাচার্যকে অনেক উঁচুদরের মানুষ বলে জানত কর্ণ। সৎ, মননশীল, যুক্তিবাদী মানুষ হিসেবে আজীবন সে কৃপাচার্যকে সম্মান করে এসেছে। আজ সেই মানুষটি তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার প্রয়াস পাচ্ছেন। গোত্রপরিচয় দিয়ে প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে এমন কথা কোনো শাস্ত্রে লিখা নেই। যুদ্ধক্ষেত্রে কত জাতের মানুষ যুদ্ধে লিপ্ত হয়, এই প্রমাণ তো 'রামায়ণ' থেকে আরম্ভ করে বহু সমরগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এই কথা আচার্য কৃপের না জানার কথা নয়। জানেন তিনি। জেনেও তিনি রাজাদের পক্ষ নিলেন।

এতক্ষণ দ্রোণাচার্যের সঙ্গে বাকযুদ্ধ করতে করতে দম ফুরিয়ে এসেছে কর্ণের। এই মুহূর্তে কৃপাচার্যের মিথ্যাচারের বিরুদ্ধাচরণ করতে তার আর ইচ্ছে করল না। মহতের হীনাচরণের প্রতিবাদ করল না কর্ণ। এত বড় বীর যে কর্ণ, মুহূর্তে চুপ মেরে গেল। কৃপের কথা শুনে প্রতিস্পর্ধী কর্ণের মুখটি লজ্জায় অবনত হয়ে গেল।

কৃপাচার্যের নিকটে দুর্যোধন এগিয়ে গেল। বলল, 'আচার্য, রাজা তিন রকমের হয়—যিনি সৎকুলে জন্মেছেন, যিনি বীর এবং যিনি সৈন্যপরিচালনা করতে পারেন। এই মুহূর্তে


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি কর্ণকে অঙ্গরাজ্যের রাজা করে দিলাম। এখন তো অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে কর্ণের আর কোনো বাধা নেই ?'

কর্ণ অভিভূত। দ্রুত দুর্যোধনের নিকট এগিয়ে গেল সে। জড়িয়ে ধরল তাকে। বলল, 'এত বড় উপহারের বিনিময়ে আমি তোমাকে কী দেব মিত্র ?'

'কিছুই না। শুধু আলিঙ্গন আর বন্ধুত্ব।' নিবিড় গলায় বলল দুর্যোধন।

পাণ্ডববিরোধী দুই মহাবীর পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করল।

এই সময় ভীম ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। কর্কশ কণ্ঠে বলল, 'ওরে সারথির বেটা কর্ণ। অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইছিস তুই ? তুই কী যুদ্ধ করবি রে বেটা। অঙ্গরাজ্যের রাজা হওয়ার কী যোগ্যতা আছে তোর ? তোর হাতে কি রাজদণ্ড শোভা পায় ? তোর হাতে তো শোভা পাবে ঘোড়ার লাগাম। ওই তো দূরে একটা রথ দেখা যাচ্ছে। তুই এক কাজ কর। শিগগির ওই রথে লাফিয়ে ওঠ। রথটা চালিয়ে বরং রঙ্গভূমির মানুষদের দেখা। জন্মের নেই যার ঠিক, সে চায় রাজপুত্র অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে! ফুঃ।'

কর্ণ মাথা নিচু করে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল। কিন্তু দুর্যোধন ছাড়বার পাত্র নয়। সরোষে সে বলে উঠল, 'ভীম, মূর্খের মতো প্রলাপ বকছ কেন ? আমার তো জানা ছিল—শারীরিক শক্তির সঙ্গে তোমার কিছু জ্ঞানগম্যিও আছে। এখন দেখছি, দৈহিক মেদ তোমার মেধার বিকাশ ঘটতে দেয় নি।'

'চুপ থাকো তুমি দুর্যোধন। অর্বাচীনের মতো মাঝখানে কথা বলতে এসো না।' তীব্র কণ্ঠে বলল ভীম।

হো হো করে হেসে উঠল দুর্যোধন। শ্লেষ মিশানো গলায় বলল, 'একজন মানুষের শক্তিই সবকিছু। কর্ণ একজন শক্তিমান বীর। বলবান পুরুষ আর নদীর উৎস খুঁজতে যেয়ো না। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে। তুমি কর্ণের জন্মঠিকানা জানতে চাইছ, না ? বলি তোমাকে—বিশ্বামিত্র, গুরুদেব দ্রোণ, আচার্য কৃপ—এঁদের জন্মবিন্দুর রহস্য জানো ? আর শোনো ভীম, তোমাদের পাঁচ ভাইয়ের জন্ম কীভাবে হয়েছে তুমি জানো ?'

এই সময় কর্ণ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'থাক মিত্র থাক। ওভাবে বলতে নেই। ভীম উন্মাদের মতো আচরণ করছে বলে তুমি করতে যাবে কেন ?'

'তুমি থামো মিত্র। আমাকে বলতে দাও।' তার পর ভীমের দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গকণ্ঠে বলল, 'আমি জানি তোমাদের জন্মরহস্য।'

দ্রুত এগিয়ে এসে কর্ণ দুর্যোধনের মুখে হাত চাপা দিল। বলল, 'নারীর অপমান কোরো না তুমি মিত্র। আমার মা আছেন, তোমারও। তোমার কথায় পাণ্ডবদের মা'দের অপমান হচ্ছে। তোমায় মিনতি করছি, জননীদের অপমান কোরো না।'

দুর্যোধন ক্রোধ সংবরণ করল। শান্তস্বরে বলল, 'কর্ণের দিকে চেয়ে দেখো ভীম। সোনার বর্ম আর কুণ্ডল জন্ম থেকে ওর গায়ে আঁটা। সূর্যের মতো উজ্জ্বল গায়ের রং কর্ণের। এই রকম মানুষের জন্ম কি নীচুকুলে হতে পারে ? হরিণের পেটে কি বাঘ জন্মায় ? এই


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সসাগরা পৃথিবীর রাজা হওয়ার যোগ্যতা রাখে কর্ণ। আর হ্যাঁ, অর্জুনকে বলছি—কোরো না যুদ্ধ কর্ণের সঙ্গে। তোমার বাহুতে কী ক্ষমতা আছে দেখিয়ে দাও না।'

দুর্যোধনের কথা শুনে অর্জুন যুদ্ধের জন্য এগিয়ে এল। কর্ণ আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। একা দূরে দাঁড়িয়ে দ্রোণাচার্য অসহায় দৃষ্টিতে প্রস্তুতয়মান দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। দর্শকদের মধ্যে হাহাকার উঠল। ধীরে ধীরে বাদ্যিবাজনা বেজে উঠল।

ওই সময় টুপ করে সূর্য অস্ত গেল। সূর্যাস্ত হলে যুদ্ধ নিষিদ্ধ। যুদ্ধ আর হলো না। অর্জুন আর কর্ণ—উভয়ে বুকে ক্রোধের জ্বালা নিয়ে যার যার আলয়ে প্রস্থান করতে উদ্যোগী হলো।

যাওয়ার আগে কর্ণ দ্রোণাচার্যকে উদ্দেশ করে বলল, 'হীনবংশজাত বলে যাদের আজ তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছেন, এমন একদিন আসবে, এই হীনজাতের মানুষরাই পৃথিবী শাসন করবে। আর আপনারা হবেন এই হীনজাতির করুণাপ্রার্থী।' বলে দুর্যোধনের হাত ধরে হনহন করে হাঁটা দিল কর্ণ।

নির্বাক দ্রোণাচার্য তাদের গমনপথের দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকলেন।

AMARBOI.COM


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঞ্চালরাজং দ্রুপদং গৃহীত্বা রণমূর্ধনি।
পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে জীবন্ত ধরে আনতে হবে আমার কাছে।

রঙ্গভূমিতে অর্জুন বীরোচিত মর্যাদায় নিজেকে উন্নীত করেছিল।

কর্ণের অস্ত্রকুশলতায় আর বাগাড়ম্বরে সেই মর্যাদার অনেকটাই ক্ষুণ্ন হয়ে গেল। কৃপাচার্যের হস্তক্ষেপে এবং সূর্যাস্তের কারণে কর্ণ আর অর্জুনের মধ্যে যুদ্ধ হলো না বটে, কিন্তু উভয়ের মনে সারা জীবনের শত্রুতার বীজ উপ্ত হয়ে গেল।

কর্ণের অকারণ উপস্থিতি আর বাগাড়ম্বরতা বাদ দিলে প্রশিক্ষণ প্রদর্শনী মনোহরই হলো। হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদবাসীরা, মন্ত্রী-অমাত্যরা দ্রোণাচার্যের নামে জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন। রাজবাড়িতে তাঁর গুরুত্ব বেড়ে গেল অনেক গুণ। অতুল্য অস্ত্র-প্রশিক্ষণের কারণে এবং অবশ্যই ব্রাহ্মণ হওয়ার কারণে সার্বত্রিকভাবে সকলে দ্রোণকে গুরু বলে মেনে নিলেন। সকলের মান্যতার মধ্যে দ্রোণাচার্যের যে কথাটি প্রথমে মনে পড়ল, তা হলো—প্রতিশোধ, পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের ওপর প্রতিশোধ।

এক প্রত্যুষে দ্রোণাচার্য তাঁর সকল অস্ত্রশিষ্যকে ডাকলেন। সবাইকে সামনে দাঁড় করিয়ে নিজে উচ্চাসনে বসে বললেন, 'বৎসরা, তোমরা তো আমার কাছে অস্ত্রশিক্ষা সম্পন্ন করেছ?'

এই প্রশ্নের উত্তর নিষ্প্রয়োজন। গুরু এবং শিষ্য—উভয়পক্ষই জানেন এর উত্তর ধ্রুবতারার মতো স্পষ্ট এবং সত্য। শিষ্যরা তাই নিশ্চুপ থাকল।

গুরু আবার বলতে শুরু করলেন, 'গুরুদক্ষিণা বলে একটা কথা আছে। শিক্ষণ শেষে শিষ্যদের শোধ করতে হয় এই দক্ষিণা। তোমাদেরও সেই দক্ষিণা শোধ করার সময় এসে গেছে।'

দুর্যোধন ত্বরিত বলে উঠল, 'বলুন গুরুদেব, কী দক্ষিণা দিলে আপনি আনন্দিত হবেন?'

স্মিত হাসলেন দ্রোণাচার্য। সেই হাসির মধ্যে সূক্ষ্ম অবহেলা জড়িয়ে ছিল। তা বোঝার ক্ষমতা দুর্যোধনের নেই। দুর্যোধনাদি শতভাই শুধু হাসিটুকু দেখল, শ্লেষটুকু নয়। যুধিষ্ঠির আর অর্জুন ছাড়া অপরাপর পাণ্ডবরাও তা-ই দেখল।

দ্রোণাচার্য অর্জুনের দিকে মুখ ঘোরালেন। বললেন, 'কী অর্জুন, গুরুদক্ষিণা দেবে না?'

অর্জুন উত্তর দেওয়ার আগে দুর্যোধন আবার বলে উঠল, 'আমাদের বলুন, কী করতে হবে।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবার সমবেত শিষ্যের ওপর দৃষ্টি ফেলে উদাত্ত কণ্ঠে আচার্য বলে উঠলেন, 'পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে ধরে আনতে হবে। জীবন্তই চাই আমি তাকে।'

দিন আর রাত্রি জুড়ে যে-বেদনা তাঁকে কুরে কুরে খেয়েছে, তার জ্বালা শুধু দ্রোণাচার্য নিজেই অনুভব করেছেন। সেই দিনের সেই মৃত্যুসম অপমান এই এতদিন পর্যন্ত তাঁকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। সেই অন্তর্জ্বালার কথা কাউকে বলতে পারেন নি তিনি। হিমালয়সম বেদনার বোঝাটি বুকে নিয়ে এই দিনটির জন্য তিনি অপেক্ষা করে ছিলেন। আজ সেই দিনটি এল। তাই ছাত্রদের উদ্দেশে বললেন, 'দ্রুপদকে পরাজিত করে আমার পাদুকার সামনে এনে ফেলো।'

গুরুর কথা শুনে যৌবনোদ্ধত রাজকুমারদের মধ্যে সাজ সাজ রব উঠল। রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে পাঞ্চালের উদ্দেশে রওনা দিল তারা। এই যুদ্ধযাত্রার গুরুত্ব কতটুকু, এর রাজনৈতিক তাৎপর্য কী বা তাদের যুদ্ধায়োজন দ্রুপদকে পরাস্ত করার মতো পর্যাপ্ত কি না এসবের কিছুই ভাবল না রাজকুমাররা।

এদিকে দ্রোণাচার্য একবারও অনুমতি নিলেন না ধৃতরাষ্ট্র বা বিদুর অথবা ভীষ্মের কাছ থেকে। অস্ত্রগুরু হিসেবে নিযুক্তির দিনই ভীষ্মকে দ্রোণাচার্য জানিয়ে রেখেছিলেন দ্রুপদের প্রতি তাঁর প্রতিশোধস্পৃহার কথা। অন্যদিকে শিষ্যদের কাছে যা-ইচ্ছে দক্ষিণা চাওয়ার স্বাধীনতা দ্রোণাচার্যের আছে। গুরুদক্ষিণা চাওয়ার ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র বা বিদুর অথবা ভীষ্মের হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার নেই।

এ ছাড়া পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে পরাস্ত করার ব্যাপারে কুরুপ্রাসাদের অভিভাবকদের একধরনের সমর্থন ছিল। দীর্ঘদিন ধরে পাঞ্চাল আর কুরুদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিরাজ করছিল। দ্রোণাচার্যের প্রণোদনায় কুরুরাজকুমাররা দ্রুপদকে পরাস্ত করতে পারলে পরোক্ষে কুরুদেরই লাভ। দীর্ঘদিনের শত্রুর ধ্বংস কে না চায়!

যুদ্ধযাত্রার আগে আগে কৌরব আর পাণ্ডব ভ্রাতাদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হলো। দুর্যোধন বলল, 'জ্যেষ্ঠ, আপনাদের যুদ্ধযাত্রার প্রয়োজন নেই। দ্রুপদকে ধরে আনার জন্য আমরা শতভাই-ই যথেষ্ট। অন্য ভাইদের নিয়ে আপনি প্রাসাদের আরাম উপভোগ করুন।'

যুধিষ্ঠির বলল, 'তা কী করে হয় ? তোমাদের যেমন দায়িত্ব আছে, শিষ্য হিসেবে আমাদের পঞ্চভাইয়েরও তো কর্তব্য আছে। গুরুদক্ষিণা শুধু তোমরা একা দেবে কেন ? আমাদেরও তো ঋণ শোধ করতে হবে।'

যুধিষ্ঠিরের কথা এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিল দুঃশাসন। 'বহুদিন প্রশিক্ষণ নিয়ে আপনি এমনিতেই ক্লান্ত। তা ছাড়া অর্জুন আর ভীম, রঙ্গভূমিতে কর্ণের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে শক্তিহীন প্রায়। তাদেরও বিশ্রামের প্রয়োজন। ওদের নিয়ে আপনি রাজপ্রাসাদে বিশ্রাম নিন। আমরা পাঞ্চালরাজকে ধরে আনি।' একটুক্ষণ থেমে দুঃশাসন আবার বলল, 'ও হ্যাঁ জ্যেষ্ঠ, যুদ্ধযাত্রায় বীর কর্ণ আমাদের সঙ্গে থাকবে।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু কর্ণসহ শত ভাইয়ের আক্রমণ দ্রুপদ প্রতিহত করে দিল। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রণক্ষেত্র থেকে পালাতে শুরু করল কুরুভ্রাতারা। এই সময় সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হলো অর্জুন আর ভীম। তাদের পরাক্রমে দ্রুপদসৈন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো।

অর্জুনের হাতে শেষ পর্যন্ত জীবন্ত ধরা পড়লেন দ্রুপদ। বন্দি দ্রুপদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করল অর্জুন। তাঁকে সে এইটুকু বুঝিয়ে দিল যে, ব্যক্তিগত কোনো আক্রোশ থেকে পাঞ্চাল আক্রমণ করে নি অর্জুন, শুধু গুরু দ্রোণের আদেশ পালনের জন্য এই আক্রমণ।

বন্দি দ্রুপদকে গুরুর সামনে উপস্থিত করল ভীমার্জুন। এবার দ্রোণাচার্যের কথা বলার পালা। এতদিনের সংবরিত ক্রোধ আচার্যের চোখে-মুখে-কথায় ফুটে উঠল।

দ্রুপদকে উদ্দেশ করে তীব্র ভাষায় দ্রোণ বললেন, 'তুমি বলেছিলে দ্রুপদ, রাজা নয় এমন মানুষ নাকি রাজার সখা হতে পারে না। নিজের জোরে তোমার রাজ্য বিধ্বস্ত করেছি, তোমার রাজধানীও আজ আমার দখলে। শুধু তা নয়...।' বাক্য অর্ধসমাপ্ত রেখে আচার্য থেমে গেলেন।

দ্রুপদ তাঁর অধোবদন ওপর দিকে তুললেন। প্রশ্নাকুল চোখে দ্রোণের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

দ্রোণাচার্য বাক্য শেষ করলেন, 'তা ছাড়া তোমার মরা-বাঁচাও এখন আমার ইচ্ছের অধীন। বলো এখন, আমার কাছ থেকে তুমি কী চাও? ও হ্যাঁ, আমার প্রতি বিগত দিনের দুর্ব্যবহারের কথা স্মরণে রেখেই তুমি তোমার প্রার্থনা জানাবে আশা করছি।'

দ্রুপদ পূর্ববৎ নির্বাক থাকলেন। কী বলবেন তিনি, কী বলারই বা আছে তাঁর! দ্রোণের সেই প্রার্থনার দিনটির কথা মনে পড়ল দ্রুপদের। সেদিন ভালো ব্যবহার করেন নি তিনি দ্রোণের সঙ্গে। বন্ধুত্বকে এক ঝটকায় উড়িয়ে দিয়েছিলেন। রাজাহংকারে এককালের বন্ধু দ্রোণকে সপরিবারে অপমান করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি। আজকের দিনটির জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না তিনি। সামান্য একজন ব্রাহ্মণপুত্র মনের ভেতর এতটি বছর ক্রোধকে লালন করে রাখবেন, ভাবেন নি তিনি।

দ্রোণ কুরুবাড়িতে শিক্ষকতা করছেন এইটুকু শুনেছেন তিনি। কিন্তু সেই শিক্ষকতার পেছনে দ্রোণের যে এত গভীর চাল ছিল, ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারেন নি দ্রুপদ। আজ তিনি পরাজিত। বিজিতের কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকতে নেই। জয়ী যে-বিধান দেয়, তা বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে হয় বিজিতকে। তাই দ্রুপদ নির্বাকই থাকলেন।

বন্ধুর বিব্রতকর, অসহায়, ধূলিধূসরিত অবস্থা দেখে দ্রোণের হৃদয় বিগলিত হলো। দ্রুপদকে উদ্দেশ করে তিনি ধীরে ধীরে বললেন, 'আমরা ব্রাহ্মণ মানুষ। ক্ষমাই আমাদের ধর্ম। তোমার মতো নির্মম নই আমি, দুরাচারীও নই। তোমার প্রাণের ভয় নেই দ্রুপদ। আমার দিক থেকে তোমাকে হত্যার কোনো উদ্যোগ নেব না আমি। ছোটবেলায় যে তুমি আমার বন্ধু ছিলে, সেটা তুমি ভুলে গেলেও আমি ভুলি নি। আমরা একসঙ্গে খেলেছি, শুয়েছি। তোমার আর আমার মধ্যে বন্ধুত্ব, ভাব ভালোবাসাও কিছু কম ছিল না। সেদিন তোমার দুর্মতি হলো। অস্বীকার করলে তুমি আমাকে।'


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা দীর্ঘশ্বাস দ্রোণাচার্যের বুক চিড়ে বেরিয়ে এল। 'তুমি যা-ই কোরো আর যা-ই ভাবো, পুরনো দিনের বন্ধুত্ব এখনো আমি চাই।'

তারপর একটু থেমে সামনে দণ্ডায়মান অর্জুন-ভীম-যুধিষ্ঠির-দুর্যোধনাদির ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। কী যেন ভাবলেন মনে মনে। উপবীতটি যত্ন করে যথাস্থানে রাখলেন। উত্তরীয় দিয়ে মুখমণ্ডল মুছে নিলেন। তারপর বললেন, 'তুমি সেদিন রাজসভায় যতগুলো কথা বলেছিলে, তার মধ্যে একটি কথা আমার মনের মধ্যে গেঁথে আছে।'

দ্রুপদ তাড়াতাড়ি দ্রোণাচার্যের মুখের দিকে তাকালেন। তাঁর চোখে চোখ রেখে আচার্য বললেন, 'অরাজা কখনো রাজার সখা হতে পারে না। যেহেতু তোমার বন্ধুত্ব আমার দরকার, তাই আমাকে রাজা হতে হবে। আর তার জন্য তোমার রাজ্যের অধিকার চাই আমি।'

বিষণ্ন ক্লান্ত কণ্ঠে এতক্ষণে কথা বললেন দ্রুপদ, 'আমার রাজ্য এখন তোমার পদানত। তুমি যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারো।'

'তোমার রাজ্য নিয়ে আমি ছিনিমিনি খেলব না। তোমার রাজ্যকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারি, দেব না। শুধু রাজ্যের অর্ধেকাংশ তোমার কাছ থেকে কেড়ে নেব আমি।'

এই সময় দুর্যোধন বলে উঠল, 'অর্ধেক কেন, গোটাটাই অধিকার করবেন আচার্য।'

দ্রোণাচার্য ডান হাত তুলে দুর্যোধনকে থামিয়ে দিলেন। দ্রুপদকে উদ্দেশ করে বললেন, 'গঙ্গার দক্ষিণ তীরের পাঞ্চালরাজ্যটুকু তোমার আর উত্তর তীরের রাজ্যাংশটুকু আমার। এখন কি তুমি আমাকে বন্ধু বলে মেনে নেবে?'

দ্রুপদ বিচক্ষণ। তিনি জানেন—পরাজিতজনের কোনো বক্তব্য থাকা উচিত নয়। শত্রুর দাপট সহ্য করে তাঁর বশীভূতই থাকতে হবে তাঁকে। তিনি দ্রোণাচার্যের শর্ত মেনে নিলেন।

পাঞ্চালরাজ্য দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল। দ্রুপদের ভাগে পড়ল গঙ্গার দক্ষিণভাগে কাম্পিল্য, মাকন্দী ইত্যাদি নগরীর সমাবেশে চর্মণ্বতীর জলধোয়া চম্বল পর্যন্ত। ওদিকে গঙ্গার উত্তরে দ্রোণাচার্য যে রাজ্য পেলেন তার রাজধানী হলো অহিচ্ছত্র।

শিষ্য অর্জুনের কল্যাণে দ্রোণ রাজা হলেন। দ্রোণের আশৈশবের দারিদ্র্য একেবারে ঘুচে গেল। জীবনের যন্ত্রণা তাঁকে কম ভোগ করতে হয় নি। এমন একটা সময় গেছে, যখন তিনি স্ত্রী-পুত্রের অন্ন জোগাড় করতে পারেন নি, পুত্রের মুখে তুলে ধরতে পারেন নি এক বাটি দুগ্ধ। শুধু চেষ্টার জোরে কুরুপ্রাসাদে সামান্য ঠাঁই করে নিতে পেরেছিলেন। অশেষ চেষ্টা আর অপরিসীম ধৈর্যের কারণে তাঁর শৈশবের স্বপ্ন আজ ফলবতী হয়েছে।

রাজা হওয়ার পরও দ্রোণাচার্য অহিচ্ছত্রে গেলেন না, যেমন করে অঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর হওয়ার পরও যায় নি কর্ণ। কর্ণ কখনো অঙ্গরাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করে নি। থেকে গিয়েছিল হস্তিনাপুরে। তেমনি করে দ্রোণাচার্যও হস্তিনাপুর ছেড়ে অহিচ্ছত্রে গেলেন না।

হস্তিনাপুরের সম্মান আর রাজপ্রাসাদের রাজনীতির আস্বাদ দ্রোণাচার্যকে হস্তিনাপুরেই রেখে দিল।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বহিরাঙ্গনের ঝনঝনানি থেমে গেলে একদিন শিষ্যদের ডেকে দ্রোণাচার্য বললেন, 'তোমরা সবাই যুবক হয়েছ। যুদ্ধজয়ের অভিজ্ঞতাও তোমাদের হয়েছে। অশেষ ক্লান্ত এখন তোমরা। তোমাদের আনন্দের প্রয়োজন। তোমরা মৃগয়াতে যাও। সজীব জীবন ফিরে পাবে তোমরা।'

কুরুরাজপ্রাসাদের রাজকুমারদের মধ্যে মৃগয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল।

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃত্তিকার দ্রোণ-মূর্ত্তি করিয়া রচন।
নানা পুষ্প দিয়া তাঁর করয়ে পূজন॥

বিড়ম্বিত একলব্য হাঁটতে থাকল।

তার গন্তব্য স্থির নয়। লক্ষ্যহীনভাবে অবিরাম সে হেঁটে যেতে লাগল। পা দুটো তার রক্তাক্ত। অরণ্যের ঝোপঝাড়ে আর কাঁটায় লেগে তার ঊর্ধ্বাঙ্গের কাপড়টি শতচ্ছিন্ন। পরিধেয়বসনেরও এখানে ওখানে ছিঁড়ে গেছে। শরীরের নানা জায়গায় গাছের শাখার আর কাঁটার খোঁচায় ছিঁড়েফুঁড়ে গেছে। কোনো কোনো স্থান থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। কোনো দিকে খেয়াল নেই তার, না শরীরের দিকে, না বসনের দিকে। উদ্‌ভ্রান্তের মতো সামনের দিকে হেঁটে যাচ্ছে একলব্য।

সেই সকাল থেকে কতক্ষণ হাঁটছে একলব্য, হিসেব রাখে নি। সে অনেকটা বাহ্যজ্ঞানরহিত। চোখ খোলা থাকা সত্ত্বেও সে ঠিকঠাকমতো দেখছে না, মস্তিষ্ক সচল থাকা সত্ত্বেও সে যথাপূর্ব ভাবতে পারছে না। শুধু তার কানে বাজছে গুরু দ্রোণের কথা—'অপাঙ্‌ক্তেয় কোনো জনগোষ্ঠীর সন্তানকে আমি অস্ত্রশিক্ষা দিই না।'

আচার্যের এই বাক্য তার ভেতরটা পুড়িয়ে দিচ্ছে। গুরুর যেমন কোনো গোত্রাগোত্র পরিচয়ের দরকার হয় না, তেমনি শিষ্যেরও। তাহলে ? তাহলে গুরুদেব তার প্রতি এমন নিষ্ঠুর তাচ্ছিল্য দেখালেন কেন ?

গুরুরা তাঁদের নিজস্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত, ছাত্ররাও নিজেদের নম্রতায় আর শ্রদ্ধাবোধে চিহ্নিত। যথার্থ গুরুর কাছে একজন ছাত্রের ব্রাহ্মণত্ব বা ক্ষত্রিয়ত্বের পরিচয়টা মুখ্য নয়, গণনীয় বিষয় হলো ছাত্রটি কতটুকু মেধাবান, অধ্যবসায়ী আর নিষ্ঠাবান। একজন শিষ্য বর্ণ-ইতর হলেই মানবেতর প্রাণীর মতো তাকে তাড়িয়ে দিতে হবে ? দ্রোণের বিদ্রূপময় কথাগুলো একলব্যকে রক্তাক্ত করতে থাকে। তার ভাবনাগুলো গলন্ত সীসা হয়ে তার চোখ-কান-নাসিকা দিয়ে বেরোতে থাকে।

একলব্য দিশাহীনভাবে হাঁটছে আর ভাবছে আচার্য দ্রোণের কাছে একজন মানুষের পরিচিতি শুধু তার উচ্চবর্গীয়তার জন্য ? আদর্শ, সত্যপ্রিয়তা, একনিষ্ঠতা, মেধা—এসব সদ্‌গুণ আচার্যের কাছে তাহলে বিবেচ্য নয় ? কোন ঘরে জন্মাল, কোন বংশে জন্মাল—সেটাই কি একজন মানুষের সব ? সেই মানুষের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বলে কিছুই নেই ?

অখ্যাত কোনো স্থানে বা বংশে একজন মানুষ জন্মালেও নিজের চেষ্টায় সে বড় হয়, দুর্গম জীবনপথ অতিক্রম করে সে জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়, নিজের একটা আলাদা পরিচিতি


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৈরি করে। একলব্যও তা-ই চেয়েছিল। নিষাদবংশে জন্মেও এই পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চেয়েছিল। হতে চেয়েছিল দুর্দান্ত ধনুর্ধর। সে তো কাউকে অতিক্রম করতে চায় নি, হতে চায় নি কারও প্রতিদ্বন্দ্বীও। কুরুবাড়ির রাজপুত্ররা তো কুরুবাড়ির রাজপুত্র। তাদের আলাদা একটা জৌলুস আছে, আছে পৃথক একটা মর্যাদা। তাদের প্রতিযোগী হয়ে নিজেকে তৈরি করার চিন্তা ঘুণাক্ষরেও তার মাথায় আসে নি।

সে শুধু চেয়েছিল রাজপুত্রদের পাশে বা দূরে, দ্রোণাচার্যের সামনে বসার একটা আসন। ওই আসনে বসে গুরুর সাহচর্যে নিজের বিদ্যাকে ঝালিয়ে নিতে চেয়েছিল সে। ওদের শিক্ষাদান শেষে গুরু সামান্যটুকু সময়ের জন্য তার দিকে তাকালে হতো। শুধু একটু মিষ্টি হেসে অস্ত্রকৌশলের সামান্যতম প্রশিক্ষণ তাকে দিলেই তার স্বর্গপ্রাপ্তির মতো আনন্দ হতো। কিন্তু গুরুদেব এরকম তো কিছুই করলেন না। বললেন, 'তুমি আসো এখন।'

আহ! এসব কী ভাবছে সে! আচার্য দ্রোণ সম্পর্কে এরকম মন্দ ভাবছে কেন সে! আচার্য তো তার গন্তব্য, তার তীর্থভূমি। তিনি তো তার স্বপ্নপূরণের জায়গা। মানস-সরোবর। মানস-সরোবরের জলে স্নান করে মানুষ নাকি যা কামনা করে, তা পায়। এই দ্রোণাচার্য-সরোবরে অবগাহন করে সে ঐশ্বর্যশালী হতে চেয়েছিল, চেয়েছিল অস্ত্রকৌশলী হতে।

তার মনস্কামনা পূরণ হয় নি। তাতে কী আসে যায়! রক্তমাংসের আচার্য ক্রোধের বা মোহের বা লোভের অথবা সামাজিক কোনো সীমাবদ্ধতার কারণে তাকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করেন নি। তাতে তো একলব্যের কিছু যাওয়া-আসার কথা নয়। তার ভেতরে, তার মস্তিষ্কের কোষে কোষে, তার ভাবনার পরিক্রমভূমিতে আরেকজন দ্রোণাচার্য তো দাঁড়িয়ে আছেন। ওই তো তিনি ডান হাতে বরাভয় করছেন। ওই তো তাঁর মুখমণ্ডলে স্নিগ্ধ পবিত্র হাসি। ওই তো তাঁর দুটো চোখে স্নেহাভা জ্বলজ্বল করছে। ওই তো তিনি বলছেন—'ভয় পেয়ো না বৎস, থেমে যেয়ো না। রিপুবশীভূত রক্তমাংসের আমি তোমাকে অস্বীকার করেছি তো কী হয়েছে ? তোমার মনোভূমিতে আরেকজন যে দ্রোণ আছেন, তিনি তো তোমার অনুকূলে। তাঁকে ঘিরে তুমি তোমার নিজস্ব জগৎ গড়ে তোলো। তাঁকে প্রণিধানযোগ্য করে তুমি তোমার সাধনা চালিয়ে যাও।'

থমকে দাঁড়াল একলব্য। তাই তো, এতক্ষণ সে পাগলের মতো এই গহিন অরণ্যের মধ্যে হাঁটছে কেন ? কেন সে সৎচিন্তা থেকে বিচ্যুত হয়েছে ? কেন গুরুকে নিয়ে এরকম অপবিত্র কথা ভেবেছে ? ছিঃ ছিঃ! গুরু দ্রোণ যে তার প্রণম্য, প্রাতঃস্মরণীয়!

দুদিকে জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল একলব্য। কলুষিত চিন্তা এক ঝটকায় মাথা থেকে বেরিয়ে গেল। চারদিকে চোখ তুলে তাকাল সে। দেখল—সামনে ছোটোবড়ো নানা গাছগাছড়ার মাঝখানে একফালি খালি জায়গা। অদূরে কদলিগাছের বন। দু-চারটা আম কাঁঠালের গাছ এদিকে ওদিকে। বিশাল বিশাল তিন-চারটি বৃক্ষ স্থানটিকে ছায়াশীতল করে রেখেছে। বেশ কিছু দূরে জলাশয়ের আবছা অবস্থান তার চোখ এড়াল না।

একলব্য মনস্থির করল—এই স্থানটিই হবে তার সাধনার স্থল। তার অর্জনের জায়গা। ভেতরের সকল কলুষযুক্ত ভাবনাকে বিসর্জন দিয়ে অর্জনের সাধনায় মগ্ন হবে সে এই


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্থানটিতেই। অদ্ভুত একটা হাসি ছড়িয়ে পড়ল একলব্যের সারা মুখে। এই হাসি কি আশাভঙ্গের ? না স্বার্থপর এই পৃথিবীকে জানিয়ে দেওয়ার যে, তুমি যতই আমাকে দমিয়ে রাখতে চাও না হে ধরিত্রী মাতা, একটা সময়ে আমি মাথা তুলে দাঁড়াবই।

স্থানটি পরিষ্কার করল একলব্য। ক'দিনের চেষ্টায় সে একটা কুটিরও তৈরি করল সেখানে। উঠানটা বেশ প্রশস্ত রাখল। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষার্থীর মতো পোশাক-পরিচ্ছদ ধারণ করল। ফল-মূল-লতা-গুল্মকে আহার্য করে তুলল। পানীয়জল সংগ্রহ করল সেই জলাশয় থেকে।

এবার গুরুর মূর্তি নির্মাণের পালা। যে-কিছুক্ষণ দ্রোণাচার্য-সান্নিধ্যে ছিল একলব্য, গভীর অভিনিবেশে লক্ষ করেছে তাঁকে। তাঁর দেহসৌষ্ঠব, বাহুর দৈর্ঘ্য, শরীরের গৌরবর্ণতা বিশেষ করে শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখের গড়নকে অবলোকন করেছে সে। বাস্তবগুরুর চেহারার সঙ্গে মানসগুরুর স্নিগ্ধতা মিশিয়ে এক মৃন্ময় মূর্তি তৈরি করল একলব্য। নিপুণ খেয়াল আর অপরিসীম শ্রদ্ধার ফল যেন দ্রোণাচার্যের মৃন্ময় মূর্তিটি।

দ্রোণাচার্য ছাড়া আর কারও কাছে অস্ত্রশিক্ষা গ্রহণ করবে না একলব্য। দ্রোণ ছাড়া আর কাউকে সে গুরুর আসনে বসাতে পারবে না। মনে মনে দ্রোণাচার্যকে গুরু হিসেবে বরণ করে তাঁর মৃন্ময় মূর্তিটি গড়ল একলব্য। এবং এই মূর্তিটির কাছ থেকেই মনে মনে দীক্ষা গ্রহণ করল সে।

গুরুর কাছে দীক্ষিত হওয়ার অপর নাম চরম আত্মসমর্পণ। এই আত্মসমর্পণের মধ্যদিয়ে নিজের লজ্জা-ভয়-মান-অপমান-সুখ-দুঃখ-ভাবনা সব বিলীন হয়ে যায়। মূর্তিকে প্রণিপাত করার পর একলব্যের ভেতর থেকে এসবকিছু একেবারে দূরীভূত হয়ে গেল। থেকে গেল শুধু বিনয়াবনত শ্রদ্ধা আর ধনুর্বিদ্যার্জনের নিষ্ঠা। মনে মনে সে বলল, হে গুরুদেব, আমার যা কিছু অস্ত্রশিক্ষা হবে, তা শুধু আপনার করুণায় হবে, আমি যা কিছু শিখছি বা শিখব, তা শুধু আপনার আনুকূল্যের কারণে হবে।

মৃন্ময় মূর্তির মধ্যে দ্রোণের আচার্যস্বরূপটি প্রতিষ্ঠা করে একলব্য ধনুক বাণের অভ্যাস শুরু করল।

যথার্থ শিক্ষার জন্য জীবনের অন্যসমস্ত আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জন দিতে হয়। কোনো বিষয়ে চরম নৈপুণ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন একাগ্রতা। ইন্দ্রিয় সংযম, একাগ্রতা আর ত্যাগ মানুষকে চরম প্রাপ্তির জন্য উপযুক্ত করে তোলে। একলব্যের মধ্যে ধীরে ধীরে এসব গুণ স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

দিন কাটল। সপ্তাহ-মাস গেল। বছরও অতিক্রান্ত হতে লাগল একের পর এক। পরম একাগ্রতায় একলব্য ধনুঃশরের সাধনা করে যেতে লাগল। আমি অবশ্যই শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর হব— এই নিষ্ঠায় সে অস্ত্রের গ্রহণে, সন্ধানে এবং নিক্ষেপণে একটা সহজ অথচ ক্ষিপ্র গতিময়তা দান করতে সক্ষম হলো। নিজে নিজে সে এমন এমন বাণ আবিষ্কার করল, যা সে ছাড়া এই পৃথিবীর অন্য কেউ জানে না। দ্রোণাচার্যের প্রতি নিষ্ঠা আর শ্রদ্ধার গুণেই সে এসব স্বকল্পিত অস্ত্রের সন্ধান করতে শিখে গেল।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুরুরাজকুমাররা মৃগয়ায় বেরিয়েছে। যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব। দুর্যোধনের সঙ্গে দুঃশাসন, দুর্বিষহ, দুর্মুখ, বিকর্ণসহ নিরানব্বইজন ভ্রাতা। আর আছে মিত্র কর্ণ।

এই মৃগয়া ছিল শুধু কুরুবাড়ির রাজপুত্রদের জন্য, কর্ণ সে যাত্রায় অগ্রহণীয়। কিন্তু দুর্যোধনের এককথা—'মিত্র কর্ণ আমাদের সঙ্গে যাবে।'

দ্রোণাচার্য এই আবদারে প্রীত ছিলেন না। ধৃতরাষ্ট্র যেন দ্রোণের ভাবনারই প্রতিধ্বনি করলেন দুর্যোধনের সামনে। মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'রাজ ঐতিহ্য বলে একটা কথা আছে পুত্র। এই মৃগয়া শুধু পশুশিকার নয়, রাজ-ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণও বটে। রাজপুত্রদের মৃগয়ায় কর্ণ বেমানান।'

'আমি আপনার এই যুক্তি মেনে নিতে পারছি না তাত। মৃগয়া-যাত্রায় শুধু কি রাজপুত্ররাই যায় ? রথচালকরা যায় না, হাতি-ঘোড়ার যত্ন নেওয়ার লোকগুলো যায় না ? পাচক-পাচিকারা যায় না ? দড়ি-কাছি নিয়ে কাঠুরেরা যায় না ? মালামাল বহনকারীরা যায় না ? ওরা সবাই কি রাজপুত্র ? নিশ্চয় নয়। ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রিয়-ইতর মানুষ তারা। তারা যদি যেতে পারে, কর্ণ যেতে পারবে না কেন ?' একটু থেমে কী যেন ভাবল দুর্যোধন। তারপর বলল, 'আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি পিতা, আপনি অন্ধ। দৃষ্টিশক্তি থাকলে দেখতেন—কী দিব্য চেহারা কর্ণের! যে-কোনো ক্ষত্রিয়কে হার মানাবে তার চেহারা। আর কর্ণের গুণের কথা তো নিজ কানে শুনেছেন। এই মৃগয়ায় যারা যাচ্ছে সবাই রাজপুত্র, রাজা নয় কেউ। কর্ণ কিন্তু রাজা, অঙ্গদেশের রাজা সে এখন। ফলে এই মৃগয়ায় যাওয়ার সকল অধিকার কর্ণের আছে। আপনি কর্ণের যাত্রাপথের অন্তরায় হবেন না।'

জ্যেষ্ঠপুত্রের যুক্তি শুনে ধৃতরাষ্ট্র চুপ মেরে গেলেন। কর্ণও দুর্যোধনাদির সঙ্গে মৃগয়ায় গেল। সঙ্গে রথ, হাতি, ঘোড়া তো গেলই, আরও গেল শিকারি কুকুর। মৃগয়ার নানা উপাচার যেমন জাল, রজ্জু প্রভৃতি নিয়ে প্রশিক্ষকও সঙ্গে চলল।

যে-অরণ্য অতিক্রম করে দ্রোণাচার্য পাঞ্চাল থেকে হস্তিনাপুরে এসেছিলেন, যে-অরণ্যে দ্রোণাচার্যের মৃন্ময় মূর্তির সামনে বসে একলব্য অস্ত্রসাধনায় মগ্ন, সেই অরণ্যে কুরুবাড়ির রাজকুমাররা মৃগয়ায় গেল।

বনে ঢুকে রাজকুমাররা ইতস্তত পশুর অন্বেষণ আরম্ভ করল। কেউ কেউ পশুর পেছনে রথ ছোটাল, কেউ ঘোড়ায় চড়ে পশুর অনুসন্ধানে রত হলো। আবার কেউ হাতির পিঠে আরোহণ করে গদাই লস্করি চালে পশুর খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। মৃগয়া চলতে থাকল আপন প্রক্রিয়ায়।

শিকারি কুকুরটিও বেশ মজা পেয়ে গেল। সে একবার রথের পেছনে ছোটে, আবার ঘোড়ার পেছনে। কখনোবা হাতির সঙ্গী হয়ে তীব্র স্বরে ঘেউ ঘেউ করতে থাকে। কুকুরটির কর্কশ অথচ গম্ভীর শব্দে পশুরা এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে শুরু করল।

একটা সময়ে পশু অন্বেষণকারী কুকুরটি ইতস্তত ঘুরতে ঘুরতে একলব্যের সামনে এসে পৌঁছাল। নির্জন বনের মধ্যে নিকষ কালো একজন মানুষকে দেখে প্রথমে থমকে দাঁড়াল



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুকুরটি। এ কাকে দেখছে সে ? সারা গায়ে ধুলোমাটির আস্তরণ, জটপাকানো চুল, এক টুকরা মৃগচর্ম পরনে, হাতে তীর ধনুক! এ কে ? এরকম কিম্ভূতকিমাকার চেহারার কেউ তো তার স্মৃতিতে নেই। খুব ছোটবেলা থেকেই রাজবাড়িতে প্রতিপালিত হচ্ছে সে। তার সামনে যাদের যাদের সে দেখতে পেয়েছে তাদের সবাই সুবেশি সুপুরুষ, গৌর তাদের গায়ের রং। যাকে একটু মলিন বসনের দেখেছে, সে তার প্রশিক্ষক। তারপরও প্রশিক্ষকটির তো এরকম অদ্ভুতুড়ে চেহারা-বসন নয়! তাহলে এ কে ? নিশ্চয় শত্রুশ্রেণির কেউ। তার হাতে যে তীর ধনুক! নিশ্চয় তার প্রভুদের অকল্যাণ করার জন্য সে এখানে ঘাপটি মেরে আছে। একে তো ছাড়া যাবে না। আক্রমণ করে লোকটিকে কুপোকাত করাই বিধেয়। কিন্তু আক্রমণ করবেই বা কীভাবে ? তার হাতে যে তীর-ধনুক। তাই স্বভাবজ স্বভাবে সে চিৎকার করে উঠল, ঘেউ ঘেউ। তার চেঁচানো একলব্যকে লক্ষ্য করে।

একলব্য সে-সময় তীর-নিক্ষেপণে একাগ্রমনা ছিল। কুকুরটি চেঁচিয়ে ওঠায় তার একাগ্রতায় বিঘ্ন ঘটল। তীর লক্ষ্যচ্যুত হলো।

কিন্তু তীর তো লক্ষ্যচ্যুত হওয়ার কথা নয়! গত ক'বছরের সাধনায় একলব্য এমনই দক্ষ হয়ে উঠেছে। কিন্তু সত্যিই তীরটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। বিরক্ত হলো একলব্য। নির্জন গভীর অরণ্যে এই আপদটা এল কোথা থেকে ? বিরক্ত হলেও মানবেতর প্রাণীটিকে থামাতে চাইল একলব্য। মুখে শো শো আওয়াজ করে এবং নানা ভঙ্গি করে সে তার আশ্রমের গণ্ডি থেকে কুকুরটিকে তাড়াতে চাইল। কিন্তু কুকুরটি আরও তীক্ষ্ণ কর্কশ স্বরে চিৎকার করতে লাগল। একলব্য ক্রোধান্বিত হয়ে উঠল।

একাগ্রতা ভঙ্গের অপরাধে একলব্য কুকুরটির মুখ লক্ষ্য করে সাতটি বাণ ছুড়ল। ক্ষিপ্রগতিতে গিয়ে সাতটা তীর কুকুরটির মুখ এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল। ধনুর্বেদীয় ভাষায় একে বলে লাঘব। নিজের বিরক্তি নিবারণের জন্য একলব্য অস্ত্রলাঘব করেছে।

শরাহত কুকুরটির আওয়াজ একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। সেই অবস্থাতেই রাজকুমারদের খুঁজে বের করল কুকুরটি। কুরুকুমাররা বিস্ময়ে কুকুরটির দিকে তাকিয়ে থাকল—এ কী দশা কুকুরটির! চেঁচানোর ক্ষমতা নেই যে তার! কুকুরটির মুখ তো তীরবিদ্ধ দেখা যাচ্ছে! কী আশ্চর্য, একফোঁটাও রক্ত পড়ছে না কুকুরটি মুখ থেকে! কে কুকুরটির এই দশা করল ? যে-ই করুক, সে ধনুর্বেদের চরম দুটো রহস্য জানে। ক্ষিপ্রতা আর চরমতম হস্তলাঘব সেই ধনুর্ধরের অধীন। দূর থেকে যে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করতে পারে, লক্ষ্যবস্তু দেখার প্রয়োজন হয় না যার, সে-ই শুধু এরকম দক্ষতা দেখাতে পারে। এই দক্ষ ব্যক্তিটিকে তো খুঁজে বের করতেই হবে।

অন্যান্য ভাইয়েরা বিস্মিত হলেও অর্জুন ভাবিত হলো। এ কোন ধনুর্ধর যে, তাকে অতিক্রম করেছে। পৃথিবীখ্যাত দ্রোণাচার্যের কাছে তার অস্ত্রশিক্ষা গ্রহণ। তাঁর সমস্ত জ্ঞানভাণ্ডার উজাড় করে অর্জুনকে শিখিয়েছেন তিনি। কিন্তু এরকম অস্ত্রচালনা তো তিনি তাকে শেখান নি! তাহলে তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর এই পৃথিবীতে আছে। রহস্যময় সেই ব্যক্তিটির সন্ধান করা অতীব জরুরি। অসূয়া জর্জরিত অর্জুন এবং তার সঙ্গে অপরাপর ভাইয়েরা চলল একলব্যের অনুসন্ধানে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাক্‌বন্দি কুকুরটিকে অনুসরণ করে অর্জুনাদি ভাইয়েরা একলব্যের কুটিরের সামনে উপস্থিত হলো। দেখল—তাদেরই বয়সি এক যুবক বিরামহীনভাবে অস্ত্রাভ্যাস করে চলেছে। তাকে দেখে রাজকুমারদের পছন্দ হলো না। তার মুখ-চোখ-কান, তার হনুদ্বয়ের সংস্থান, তার গায়ের রং, তার উচ্চতা কোনো কিছুই মনঃপূত হলো না তাদের। কারণ এ তো তাদের জনজাতির ঘনিষ্ঠ কেউ নয়। একলব্যকে বিকৃত চেহারার বলে মনে হলো তাদের।

ভেতরে অবহেলা তীব্র হয়ে উঠল অর্জুনের। ক্ষুব্ধকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি ? কার ছেলে ?'

নিজের পরিচয়টাই কি সবকিছু নয় ? পিতৃপরিচয়ের দরকার কী ? তার তো পিতৃপরিচয় আছে। অর্জুনের আছে কি ? এ যে অর্জুন, এরা যে কুরুপ্রাসাদের রাজকুমার, চিনতে এতটুকুও ভুল হলো না একলব্যের। সেদিনের সেই দ্রোণাচার্যের অস্ত্রপাঠশালায় অর্জুনকে দেখেছে সে। সেই দেখার স্মৃতিটি একলব্যের করোটিতে এখনো জ্বলজ্বল করছে। সামান্য সময়ের জন্য দেখা অর্জুনকে। তারপরও তাকে ভুলতে পারে নি একলব্য। সেদিন অর্জুনের সারা মুখে ছিল গাঢ় অবহেলা, তীব্র ঘৃণা। সেই ঘৃণার আর সেই ক্ষুব্ধ চেহারার অর্জুনকে ভুলে কী করে একলব্য ? আজ সেই অর্জুন তার পিতার পরিচয় জানতে চাইছে। এখন, এই মুহূর্তে যদি একলব্য অর্জুনের পিতৃপরিচয় জানতে চায়, যদি জিজ্ঞেস করে, 'অর্জুন, তোমার প্রকৃত জন্মাদাতা কে ?' কী জবাব দেবে অর্জুন ? প্রশ্নটা খলবলিয়ে উঠল একলব্যের গলা বেয়ে। সৌজন্যবোধ সামনে এসে দাঁড়াল। অর্জুন জিজ্ঞেস করতে পারে, সে তো পারে না। নিজেকে সংযত করল একলব্য। সে কয়েক মুহূর্তের জন্য অস্ত্রানুশীলন থামাল।

অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে বলল, একলব্য আমার নাম। তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলছি নিষাদগোষ্ঠীর অধিপতি হিরণ্যধনু আমার পিতা।'

'একলব্য! এই নামটি কোথায় শুনেছি যেন!' অর্জুন একলব্যের নামটি স্মরণ করবার চেষ্টা করল।

পাশ থেকে দুর্যোধন বলে উঠল, 'তুমি সেই নিষাদপুত্র একলব্য না, যে একদা গুরু দ্রোণের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্য গিয়েছিলে ?'

'যথার্থ বলেছ তুমি।' নিস্পৃহ গলায় বলল একলব্য।

'একলব্য গুরুদেবের কাছে গিয়েছিল অস্ত্রবিদ্যা শিখতে ?' বিস্মিত কণ্ঠ অর্জুনের।

'হ্যাঁ গিয়েছিলাম। তোমার চোখেমুখে প্রচণ্ড তাচ্ছিল্য ছিল সেই সকালে। তোমার মনটা অন্ধকারে ঢাকা ছিল। তাই তুমি আমাকে দেখেও দেখতে পাও নি। আমি কিন্তু তোমাদের প্রায় সবাইকে মনে রেখেছি, যেমন ধরো—তুমি অর্জুন, ও দুর্যোধন, এ ভীম। আর ওই যে দূরে দাঁড়িয়ে আছে নিস্পৃহ ভঙ্গিতে, ও যুধিষ্ঠির। আর এই যে ঘুরে ঘুরে আচার্যের মূর্তিটি দেখছে, সে বিকর্ণ।'

'দ্রোণাচার্যের মূর্তি! তোমার এখানে!' অর্জুন প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবার শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে একলব্য বলল, 'হ্যাঁ, গুরুদেব দ্রোণের মূর্তি গড়েছি আমি। ওই দেখো উঠানের এককোণে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। তাঁর পদতলে বসে আমার অস্ত্রবিদ্যা শিখা।'

চকিতে মূর্তিটির দিকে তাকাল অর্জুন।

একলব্য বলল, 'আমি আচার্য দ্রোণের শিষ্য।'

'আচার্য দ্রোণের শিষ্য! তুমি!'

'আমার বাণ নিক্ষেপের যত রহস্য তার সবকিছু দ্রোণাচার্যের কাছেই শেখা।' অবনত মস্তকে বলল একলব্য। গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যই বুঝি বা একলব্যের মস্তক অবনত হওয়া।

একলব্যের এই কথা শুনে পাণ্ডু আর ধৃতরাষ্ট্র-পুত্ররা একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল।

মুচকি মুচকি হাসতে লাগল শুধু কর্ণ।

'আর এই শরনিক্ষেপণ, কুকুরের প্রতি চরমতম হস্তলাঘবের প্রক্রিয়াটিও কি আচার্যের কাছ থেকে শিখেছ তুমি ?' অর্জুন পুনরায় প্রশ্ন করল।

এবার অর্জুনকে নিয়ে একটু খেলতে ইচ্ছে করল একলব্যের। বলল, 'শুধু এই হস্তলাঘব কেন, এর চেয়ে আরও দুর্দান্ত, আরও ভয়ংকর অস্ত্রবিদ্যা আমার অধিগত। যার অনেকটাই হয়তো তুমি জানো না। ও হ্যাঁ, এসব কিছু গুরুদেব দ্রোণের কাছেই শিখেছি আমি। তিনিই আমাকে এই বিচিত্র, বিধ্বংসী অস্ত্রগুলোর কলা শিখিয়েছেন।'

একলব্যের কথাগুলো অর্জুনের কানে দিয়ে আর ঢুকছিল না। তার মাথা ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। পরিপার্শ্ব তার চোখে আবছা হয়ে এল।

এই সময় কর্ণের কণ্ঠ শুনতে পেল অর্জুন, 'কী অর্জুন, ভাবছ—গুরুদেব তো শুধু আমারই ছিল। তাঁর অস্ত্রভাণ্ডার তো আমার দখলেই থাকার কথা। গুরুদেব তো সেরকমই কথা দিয়েছিলেন তোমাকে। মাঝখানে ভুঁইফোঁড়ের মতো এই নিষাদপুত্র একলব্য কোথা থেকে হাজির হলো ? একলব্যের মতো অপাঙ্‌ক্তেয়দের তো পায়ের কাছে থাকার কথা। এ কোন একলব্য, যে সদর্পে গুরুদেবের শিষ্যত্ব দাবি করছে ? তাও না হয় তুমি মেনে নিতে। কিন্তু একলব্যের তুলনাহীন অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষাকে কীভাবে মানবে তুমি ? আমি কি ভুল বললাম অর্জুন ? এরকম ভাবছ না তুমি ?'

কর্ণের প্রশ্নের উত্তর দিতে ইচ্ছে করল না অর্জুনের। শুধু ভাবল—এ কী করে সম্ভব! দ্রোণাচার্য একলব্যকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছেন! এই রকম অভূতদর্শন অস্ত্রগুলো তুলে দিয়েছেন একলব্যের হাতে ? একলব্য নিজেকে দ্রোণের শিষ্য বলে পরিচয় দিচ্ছে অথচ অর্জুন তাকে চেনেই না।

মৃগয়া অসমাপ্ত রেখে রাজকুমাররা হস্তিনাপুরে ফিরে এল।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে-কিছু মাগিবা প্রভু সকলি তোমার।
আজ্ঞা কর গুরু করিলাম অঙ্গীকার॥

'আমি এই রহস্যের কিছুই বুঝি নি।'

'কোন রহস্যের ?'

'যে রহস্য আমাকে গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলেছে গুরুদেব।'

'তুমি তোমার বক্তব্য স্পষ্ট কোরো অর্জুন। তোমার কথার রহস্যময়তা আমার বোধগম্য হচ্ছে না।' বললেন দ্রোণাচার্য।

'আমি একলব্যের কথা বলছি গুরুদেব। আপনার শিষ্য বলে দাবি করেছে সে নিজেকে। বলেছে...।'

অর্জুনের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আচার্য বললেন, 'কী বলেছে সে ?'

'বলেছে—এই অদ্ভুত, বিচিত্র ক্ষমতাসম্পন্ন বাণগুলোর সবটাই গুরুদেব দ্রোণ থেকে পাওয়া। যে-তীর দিয়ে তোমাদের কুকুরের মুখ বিদ্ধ করেছি, তাও তো গুরুর পাদদেশে বসে পাওয়া। বলেছে—এই অভূতদর্শন তীরের মতো আরও ক্ষিপ্র তীক্ষ্ণ বাণ আমার তূণে জমা আছে।' অর্জুন ধীরে ধীরে বলল।

'যুদ্ধকামী যে-কোনো তীরন্দাজের কাছে এরকম তীর থাকতেই পারে।'

'তাহলে আমার আপত্তি ছিল না।'

'তোমার আপত্তিটা কোথায় ?'

'একলব্য আপনার শিষ্যত্ব দাবি করার মধ্যেই আমার আপত্তি।'

'একলব্য তো আমার শিষ্য নয়। তাকে তো আমি শিক্ষার্থী হিসেবে গ্রহণ করি নি।'

'ও নিজেকে আপনার শিষ্য বলে দাবি করছে।'

'ভুল বলেছে অথবা মিথ্যে।'

'একজন মিথ্যেবাদী কখনো এরকম তীব্র তীক্ষ্ণ বাণের অধিকারী হতে পারে না। একমাত্র একনিষ্ঠ গুরুমুখী শিষ্যের পক্ষেই সম্ভব শুধু। সে আপনার শিষ্য। অবশ্যই আপনার কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছে।' শেষের কথাগুলো অনেকটা আনমনেই শেষ করল অর্জুন।

দ্রোণাচার্য ফাঁপরে পড়ে গেলেন। একলব্যের নামটি সামান্যই মনে করতে পারছেন তিনি। সেই কবে, বহু বছর আগে, কালাকোলা বাবড়ি চুলের একজন তরুণ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। সেই সকালের কথা একটু একটু করে মনে পড়ছে তাঁর।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরাসরি পায়ের কাছে হত্যে দিয়ে পড়েছিল তরুণটি। শিষ্য হতে চেয়েছিল তাঁর। রাজপুত্রদের মাঝখানে তরুণটিকে বড় বেমানান লাগছিল। নিজের নাম একলব্য বলেছিল সে। নিষাদপুত্র বলে নিজের পরিচয় দিয়েছিল। কী একটা যেন সেদিন বলেছিল। ভালো করে তরুণটির কথা শোনেন নি আচার্য। শুনবার তেমন ইচ্ছেও জাগে নি। শুধু এইটুকু স্পষ্ট মনে পড়ছে— সে তাঁর অস্ত্রশিষ্য হতে চেয়েছিল। গভীর আগ্রহ ছিল একলব্যের মধ্যে।

আচার্য স্বীকার করেন নি একলব্যকে। বলেছিলেন, ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়-ইতর কাউকে তিনি অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেন না। যাওয়ার আগে সে তার অধীতবিদ্যা দেখাতে চেয়েছিল। রাজি হয়েছিলেন তিনি। এক অভূতপূর্ব অস্ত্রনিক্ষেপণ-চমৎকারিত্ব দেখিয়েছিল একলব্য, সেই সকালে। ক্ষণকালের জন্য মনটা তাঁর দয়ার্দ্র হয়ে উঠেছিল। পরমুহূর্তে ব্রাহ্মণ্যদর্প তাঁকে দখল করে ফেলেছিল। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে অস্ত্রপাঠশালা থেকে একলব্যকে বিদায় করেছিলেন।

এতদূর পর্যন্তই তো মনে পড়ে দ্রোণাচার্যের। অর্জুনের বলা কথার কিছুই তো মনে পড়ছে না তাঁর। এরপর একবারের জন্যও তো একলব্যের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় নি। তাহলে একলব্য যে দাবি করছে—সে তাঁর ছাত্র। তাঁর হাত দিয়ে তার সকল শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ। শিক্ষণ-প্রশিক্ষণের জন্য তো শিষ্য আর গুরুর সম্মিলনের প্রয়োজন। কিন্তু একলব্য-দ্রোণাচার্যের সম্মিলন তো, সেই প্রথমবার ছাড়া আর কখনো হয় নি। তাহলে একলব্যের দাবি অলীক ? যদি অলীক হয়, তাহলে অর্জুনরা যে তার অস্ত্রদক্ষতা দেখে এল তার কী ব্যাখ্যা ? ভীষণ রহস্যময়। কোনটা সত্য ? একলব্যের মিথ্যাচার, না তার হস্তলাঘব রহস্য ? ব্যাপারটি গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলল আচার্যকে।

রাজকুমাররা রাজপ্রাসাদে ফিরে অনতিবিলম্বে গুরু দ্রোণের সঙ্গে দেখা করেছিল। কুকুরের মুখে শরপতন থেকে আরম্ভ করে একলব্যের শিষ্যত্ব দাবি পর্যন্ত সবকিছুর অনুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছিল রাজপুত্ররা। নীরবে সব শুনেছিলেন আচার্য। কথা শেষে সবাই একে একে স্থান ত্যাগ করলেও অর্জুন থেকে গিয়েছিল। গুরুকে একান্তে নির্জনে পেতে চায় সে। পেয়েও গিয়েছিল। আচার্যের সঙ্গে কথা বলা শুরু করেছিল অর্জুন। আচার্যকে মৌন দেখে অর্জুন বলতে শুরু করছিল। তবে এবারে তার কণ্ঠে অভিযোগের স্পর্শ, 'আমার লক্ষ্যভেদ-দক্ষতা দেখে, সেই রাতে, আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন—বৎস, তুমি হবে আমার শ্রেষ্ঠতম শিষ্য। তোমার জন্য আমি গৌরবান্বিত। আজ প্রতিজ্ঞা করছি, তোমার চেয়ে বেশি জানবে এমন অস্ত্রশিষ্য আমার আর কেউ থাকবে না।'

'ঠিকই তো বলেছিলাম। এবং এখনো তোমার তুল্য কোনো শিষ্য আমার নেই।' স্পষ্ট গলায় বললেন দ্রোণ।

'আগে হলে আপনার এই কথাকে বেদতুল্য পবিত্রজ্ঞানে বিশ্বাস করতাম। একলব্যের কথা শুনে আমার সেই বিশ্বাস টলে গেছে। আমি ছাড়া আপনার আরেকজন শিষ্য আছে, যে আমার চেয়ে অনেক বড় তো বটেই, পৃথিবীর অনেক খ্যাতিমান অস্ত্রবিদের চেয়েও সে অনেক বেশি দক্ষ।'


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্রোণাচার্য তাঁর ঘটনাবহুল জীবনে বহু বিপরীত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন, কিন্তু এরকম অবস্থার মুখোমুখি হন নি কোনোদিন। অবশ্যই সেরাতের কথা মনে আছে তাঁর, অর্জুনকে আলিঙ্গন করে সেরাতে তিনি বলেছিলেন, তোমার চেয়ে বড় কোনো শিষ্য আমার থাকবে না। কিন্তু এটা একেবারেই বুঝতে পারছেন না যে, নৈষাদি একলব্য তাঁর শিষ্য হলো কখন থেকে ? শুধু শিষ্যত্ব দান নয়, অর্জুনের চেয়ে অধিক চৌকষ অস্ত্রশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলেছেন নাকি তিনি তাকে!

একদিকে একলব্যের অস্তিত্ব যেমন সত্য, অন্যদিকে অর্জুনের অভিমানও উড়িয়ে দেওয়ার নয়।

দ্রোণাচার্য অর্জুনকে উদ্দেশ করে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'চলো।'

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় গুরুদেব।'

'একলব্য সকাশে। তোমার ক্ষেদ বা অভিমান যে মিথ্যে, তা প্রমাণ করতে হবে যে আমায়।' বলে দৃঢ় পদক্ষেপে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন আচার্য।

অর্জুন তাঁকে অনুসরণ করল। আর এ দুজনকে অনুসরণ করল কর্ণ।

সবাই চলে গেলেও কর্ণ সেই স্থান ত্যাগ করে নি। অর্জুন গুরুর কাছে থেকে গেলে তার ভেতর দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছিল—অর্জুন থেকে যাওয়ার কারণ কী ? আড়াল থেকে গুরু-শিষ্যের সকল কথোপকথন শুনেছিল সে। এই ঘটনার পরিণতি কী—তা জানার জন্য কর্ণের মধ্যে গভীর ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হয়েছিল। তাই অর্জুন আচার্যের পিছু নিয়েছিল সে। গুরু আর শিষ্য রথে উঠলে ঘোড়ায় চেপে তাঁদের অনুসরণ করেছিল কর্ণ।

যেতে যেতে দ্রোণ ভাবলেন—প্রতিপক্ষের দুর্ভাবনায় অর্জুন এখন প্রবলভাবে উত্তেজিত। সেই উত্তেজনার কিছুটা নিজের মধ্যেও টের পেলেন আচার্য। শুধু অর্জুনের কেন, নিজের প্রতিদ্বন্দ্বীকেও যেন তিনি নিজের সামনে দেখতে পেলেন। যে অস্ত্রের কথা অর্জুনাদির মুখে শুনেছেন তিনি, তার অন্ধিসন্ধি তো তাঁর জানা নেই। শুধু একটি কেন এরকম আরও অনেক অস্ত্রের সুলুকসন্ধান তার জানা, এরকমই তো দাবি করেছে একলব্য। যদি তা-ই হয়, অর্জুন তো কোন ছাড়, তাঁর চেয়েও দক্ষ ধনুর্ধর একলব্য।

ভাবতে ভাবতে উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন দ্রোণাচার্য। যে করেই হোক জংলি নিষাদটাকে থামাতে হবে। নইলে একলব্যের সঙ্গে সঙ্গে ওই বর্বর ব্যাধরাও একদা অস্ত্রনিপুণ হয়ে উঠবে। পৃথিবীর দখল নিতে চাইবে তারা। তখন কোথায় যাবে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র, ক্ষত্রিয় জৌলুস আর বিপুল সুখৈশ্বর্য! একলব্যের উত্থানকে ঠেকাতে হবে, যে-কোনো মূল্যে। কিন্তু অর্জুনের মতো উত্তেজিত হলে চলবে না। শান্তভাবে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে। কূটবুদ্ধিই তো ব্রাহ্মণের সম্বল।

দ্রোণাচার্য সশিষ্য একলব্যের কুটিরে উপস্থিত হলেন। গুরুকে সামনে দেখতে পেয়ে বিপুলভাবে আন্দোলিত হয়ে উঠল একলব্যের হৃদয়। কৃতজ্ঞতায় নুইয়ে এল তার মাথা। অদ্ভুত এক শিহরণে তার আপাদমস্তক কম্পিত হতে লাগল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে স্থির



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পলকে গুরুর দিকে তাকিয়ে থাকল একলব্য। তার মুখখানি প্রদীপের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারপর তার সমস্ত চেতনার ওপর বিহ্বলতা নেমে এল। আজন্ম সাধনার আদর্শ যে গুরু, তিনি আজ তার পর্ণকুটিরের আঙিনায়! এই গুরু প্রত্যক্ষভাবে তাকে শিক্ষা দেন নি বটে, কিন্তু তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই তো আজ সে ধনুর্বিদ হতে পেরেছে। গুরুর কাছে কায়মনোবাক্যে আত্মসমর্পণ করতে হয়, এই কথাই বাল্যকাল থেকে তাকে শিখিয়ে এসেছেন পিতামহ অনোমদর্শী। এই মুহূর্তে পিতামহের কথাটি মনে পড়ল—গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই।

একনিষ্ঠ শিষ্যের নম্রতায় একলব্য দ্রোণাচার্যের চরণে অবনত হলো। গুরুর সামনে হাঁটু গেড়ে বসল একলব্য। দ্রোণের পায়ে মাথা ছোঁয়াল। গুরুর চরণস্পর্শে একলব্যের মনে হলো—তার জীবনে যত বেদনা-ক্লান্তি, যত হতাশা-নিরানন্দ সবই এক নিমিষে উধাও হয়ে গেছে। সে যেন যমুনাজলে সদ্য স্নান করে তীরে উঠল।

সাষ্টাঙ্গ প্রণাম সমাপ্ত করে উঠে দাঁড়াল একলব্য। করজোড়ে দণ্ডায়মান থাকল দ্রোণাচার্যের সামনে। সে আশা করেছিল, আচার্য আশীর্বাদমূলক কিছু একটা তার উদ্দেশে বলবেন। কিন্তু কিছুই বললেন না তিনি। কী রকম কঠিন কঠিন মুখ তাঁর। সারা মুখে স্নেহকোমলতার বিন্দুমাত্র স্পর্শ নেই।

দ্রোণ হঠাৎ ধমকের সুরে বলে উঠলেন, 'তুমি আমার শিষ্য ?'

একলব্য মৃদু কণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ গুরুদেব, আমি আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছি।'

'মিথ্যে। মিথ্যেবাদী তুমি। দীক্ষিত না হয়ে শিষ্যত্ব দাবি করছ কোন সাহসে ?'

'আমি তো আপনাকে গুরুর আসনে বসিয়েছি সেই কবে থেকে। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার বহু আগে, যখন আমি বালক থেকে কিশোরে পদার্পণ করছি, সেই সময় থেকে আপনাকে আমার অস্ত্রগুরু বলে বরণ করেছি।' বিনম্র শ্রদ্ধায় বলে গেল একলব্য।

'তোমার এসব নাটক বন্ধ কোরো। অনেক ঔদ্ধত্যের পরিচয় দিয়েছ তুমি। তোমার স্পর্ধা আমাকে অবাক করছে। আমার নাম ভাঙিয়ে তুমি নিজেকে জাহির করছ। তুমি তো আমার শিষ্য নও।'

গুরুর এরকম কথা শুনে একলব্যের বুকের ভেতর থরথর করে কেঁপে উঠল।

দ্রোণাচার্য আবার বলে উঠলেন, 'তোমাকে শিষ্য বলে স্বীকার করি না আমি। কোনোদিন তোমাকে অস্ত্রবিদ্যার কোনো পাঠও দিই নি আমি।'

তারপর অর্জুনকে কাছে টেনে বললেন, 'আমার যত বাসনা এই অর্জুনকে ঘিরে। এই অর্জুনই আমার শিষ্য, সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য। আমি শুধু কৌরব-পাণ্ডবদের অস্ত্রগুরু, তোমার মতো নিষাদের নই। আমি কখনো তোমার গুরু ছিলাম না, এখনো নই।'

দু'হাত জোড় করে একলব্য বলল, 'আপনিই আমার অস্ত্রগুরু। আপনি স্বীকার করেন বা না করেন, আপনিই আমার দীক্ষাগুরু। আমার যা কিছু অস্ত্রবিদ্যাজ্ঞান, সবই আপনার কল্যাণে। আপনার পদতলে বসে অবিরত শ্রদ্ধায় আপনার কাছ থেকে দিনের পর দিন



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাতের পর রাত অস্ত্র প্রয়োগ ও সংবরণের প্রক্রিয়াগুলো আমি শিখেছি। নতুন কিছু যদি শিখে থাকি তাও আপনার অনুগ্রহে।'

'আমি তোমার কথার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি না।' দ্রোণ বললেন।

এই সময় অর্জুন বলে উঠল, 'আপনার মন জয় করার জন্য ভড়ং দেখাচ্ছে সে। ওর কথা বিশ্বাস করবেন না গুরুদেব।'

এবার বাম হাত প্রসারিত করে অর্জুনকে থামতে বলল একলব্য। তারপর গুরুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওই দেখুন।'

অনতিদূরে, উঠানের পূর্বপার্শ্বে আচার্যের মৃন্ময় মূর্তিটি দেখিয়ে একলব্য বলে উঠল, 'ভড়ং নয়, কোনোরূপ ফাঁকিও নয়, মিথ্যে তো নয়-ই। ওই দেখুন আচার্য, আপনার কাছে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর এই নিবিড় অরণ্যে আশ্রয় নিয়েছিলাম আমি। আপনার প্রত্যাখ্যান, আপনার অবহেলা আমাকে বিন্দুমাত্র টলাতে পারে নি। আন্তরিক শ্রদ্ধায় আপনার মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করেছি আমি। ওই মূর্তিরই পদতলে বসে আমার যত শিক্ষা। এখন বলুন আপনি আমার গুরু কি না ?'

'আমার মৃন্ময় মূর্তির পদতলে বসে তুমি অস্ত্রসাধনা করেছ!!'

'হ্যাঁ গুরুদেব। দিনের পর দিন রাতের পর রাত গভীর অধ্যবসায়ে তা-ই আমি করে গেছি।'

'কিন্তু অস্ত্রনিক্ষেপণ মন্ত্র! তীর নিক্ষেপণের আগে তো মন্ত্রোচ্চারণ করতে হয়। সেই মন্ত্র কোত্থেকে শিখলে তুমি ? কার কাছেই বা শিখলে তুমি ?'

একলব্য বলল, 'মন্ত্রোচ্চারণ করেছি আমি। আপনার মূর্তির পদতলে বসে তীর নিক্ষেপের আগে মুখে যা এসেছে ভক্তিভরে তা-ই উচ্চারণ করে গেছি আমি।'

'এবং তা-ই মন্ত্র হয়ে গেছে, তাই না একলব্য ?' শ্লেষের সঙ্গে বলল অর্জুন।

'যথার্থই বলেছ তুমি অর্জুন। যা বলে তীরটি নিক্ষেপ করেছি, তাতেই তীরটি তীব্র গতিসম্পন্ন হয়েছে, লক্ষ্যভেদী হয়েছে।' সহজ কণ্ঠে বলল একলব্য।

'কী বলছ তুমি অর্বাচীনের মতো ?' রূঢ় ভঙ্গিতে বললেন দ্রোণাচার্য।

গুরুর প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দিল না একলব্য। বলল, 'ভক্তিই আমার মূলধন গুরুদেব। আমার সমস্ত অন্তর জুড়ে বিরাজ করছেন আপনি। আমার পৃথিবীর সকল অণু-পরমাণুতে আপনি ছড়িয়ে আছেন। আমার অন্তরের শ্রদ্ধাই আমাকে প্রণোদিত করেছে। রক্তমাংসের আচার্যকে এড়িয়ে এই মৃন্ময় মূর্তির মধ্যে আমি প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছি। ভক্তি দিয়ে তুষ্ট করেছি আমি এই মাটির মূর্তিকে। আমার কাছে বাস্তবের গুরুর সঙ্গে কল্পনার গুরু একাকার হয়ে গেছে। আমি গুরুর অনুকম্পা পেয়েছি। তাই হয়তো অদ্ভুত, বিচিত্রগামী, প্রবল শক্তিসম্পন্ন কিছু অস্ত্র আমার হস্তগত হয়েছে।' অনেকক্ষণ কথা বলে হাঁপিয়ে উঠল একলব্য। দম নেওয়ার জন্য থামল।

একলব্যের কথা শুনে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন দ্রোণাচার্য। কী চমৎকার যুক্তি দিল ছেলেটি! কথার কী মনোহর ধূম্রজাল সৃষ্টি করল! আমার নাম ভাঙিয়ে কী কৌশলে নিজেকে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য পথ তৈরি করে নিয়েছে সে! নিজের প্রতিভা প্রকাশের জন্য সে শঠতার আশ্রয় নিয়েছে। সে এমন কৌশলে কথাগুলো প্রচার করেছে, যার সঙ্গে আমার নামটাও যুক্ত হয়ে গেছে। একলব্যের শঠতার কারণে শিষ্যদের মনে আমার সম্পর্কে সন্দেহ জেগেছে। অবিশ্বাসের দোলাচলে দুলছে আজ অর্জুন। একজন অর্ধশিক্ষিত বর্বর নিষাদ তার শিক্ষার সঙ্গে আমার নাম মিশিয়ে প্রাপ্যের অধিক সম্মান পেতে চাইছে।

আচার্য কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'তুমি শঠতা করেছ আমার সঙ্গে।'

বিস্ফারিত চোখে একলব্য গুরুর দিকে তাকাল। গুরুর কথা শুনে মর্মাহত হলো সে। মৃদুকণ্ঠে বলল, 'নিষাদের ঘরে জন্মেছি আমি। এজন্য আমার দুঃখ যাতনার অবধি ছিল না। গভীর একটা ক্ষোভ আমার মধ্যে তো ছিলই। নিজের চেষ্টায় মানুষের মধ্যে স্থান করে নেওয়া কি অপরাধ ? আপনার দক্ষতা আর সুখ্যাতিতে মুগ্ধ হয়েই আপনার মূর্তি নির্মাণ করেছি আমি। অস্ত্রসাধনাও করেছি। কোনো ছলচাতুরি বা শঠতার আশ্রয় নিই নি কখনো।'

একলব্যের এই মানবিক যুক্তি শুনে থমকে গেলেন দ্রোণাচার্য। বুঝলেন, যুক্তি দিয়ে একলব্যকে কব্জা করা যাবে না। তাকে শৃঙ্খলিত করতে হবে ভক্তির বেড়াজালে। অধিকতর যুক্তিতে অধিকতর দুর্বল হওয়ার আগে দ্রোণ একলব্যকে বললেন, 'তাহলে তুমি দাবি করছ—তুমি আমার শিষ্য ?'

'অবশ্যই গুরুদেব।'

'তাহলে বাছা, তার জন্য তো তোমাকে গুরুদক্ষিণা দিতে হবে।'

একলব্যের হৃদয় আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যে গুরু এতক্ষণ তাকে শিষ্য বলেই স্বীকার করেন নি, সেই গুরু তার কাছে দক্ষিণা চাইছেন। একথার অর্থ তো পরিষ্কার। আচার্য দ্রোণ তাকে শেষ পর্যন্ত শিষ্য বলে স্বীকার করলেন। শিষ্য বলে স্বীকার না করলে তো তার কাছে গুরুদক্ষিণা চাইতেন না। হীনবর্ণের বলে যে-একলব্যকে তিনি শিষ্যত্ব দেন নি, আজ তাকে শিষ্য বলে মেনে নিলেন। কী আনন্দ! কী অদ্ভুত শিহরণ একলব্যের সর্বাঙ্গে!

অভিভূত কণ্ঠে একলব্য বলে উঠল, 'বলুন আচার্য, কী চান আপনি আমার কাছে ? কী দক্ষিণা পেলে আপনি তৃপ্তি পাবেন ?'

একলব্যের এই কথা শুনে কর্ণের ভেতরটা প্রবলভাবে কম্পিত হলো। কী বোকা! কী অর্বাচীন এই একলব্য! দ্রোণাচার্যের ছলনায় আষ্টেপৃষ্ঠে বন্দি হয়ে পড়ছে সে। দ্রোণের আপাত সহজতার মধ্যে কী কঠিন নির্মমতা অবস্থান করছে, বুঝতে পারছে না অর্বাচীনটা। ওরে মূর্খ, ব্রাহ্মণ্যছলনায় ভুলিস না। দ্রোণের এই নিরীহ চাওয়ার মধ্যে তোর সর্বনাশ লুকিয়ে আছে। ভক্তিতে আর আপ্লুত হোস না, নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করিস না।

এই রকমই গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ভাবছিল কর্ণ। দ্রোণ আর অর্জুন একলব্যের আঙিনায় ঢুকে গেলে কর্ণ একটি বড় বৃক্ষের আড়ালে দাঁড়িয়েছিল। সেখান থেকেই সবার কথোপকথন শুনতে পাচ্ছিল কর্ণ।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্রোণাচার্যের গুরুগম্ভীর অথচ নির্মম কণ্ঠ ভেসে এল, 'দেবে তো তুমি, যা চাইব ?'

'বলুন আচার্য, কী চান আপনি আমার কাছে ? কী আমায় দিতে হবে আপনাকে ? যা চাইবেন, তা-ই দেব।'

ক্রূর হাসি ছড়িয়ে পড়ল দ্রোণের সমস্ত মুখে। 'যা চাইব তা-ই দেবে তুমি আমাকে ?' জিজ্ঞেস করলেন দ্রোণ।

'আপনার কাছে আমার কোনো কিছুই অদেয় নয়। প্রাণ চাইলে প্রাণও দেব।' সংশয়হীন গলায় বলল একলব্য।

'এ তোমার আবেগ। তরুণ তুমি। আবেগের বশে কথাগুলো বলছ তুমি।'

'ভক্তি আমার আবেগকে সংহত করেছে। আমার মূলধন আমার ভক্তি। আবেগ দ্বারা পরিচালিত নই আমি। আপনি আমাকে আদেশ করুন, কী গুরুদক্ষিণা দেব।' অত্যন্ত শান্ত সংযত গলায় কথাগুলো বলে গেল একলব্য।

এই সময় গাছের আড়াল থেকে প্রায় চিৎকার দিয়ে উঠল কর্ণ। 'থাম, ওরে অর্বাচীন, থাম তুই।' সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সংযত করল কর্ণ। তার কথা গোঙানি হয়ে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। গোঙানোর শব্দ আচার্য আর অর্জুনের কানে পৌঁছাল। একলব্য শুনতে পেল না। সে ভক্তির ঘোরে ছিল। আচার্য উৎকর্ণ হয়ে পরবর্তী শব্দ শুনতে চাইলেন। অর্জুন ইতিউতি তাকাতে লাগল। কর্ণ গাছের আড়ালে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকল। একসময় অর্জুন-দ্রোণ নিশ্চিত হলেন যে আশপাশে কেউ নেই। যা শুনেছেন, তা মানুষের কণ্ঠধ্বনি নয়। গভীর বনমধ্যে কত কিছুরই তো আওয়াজ হতে পারে।

কর্ণ ভেবে চলেছে—ভক্তিরসে ডুবন্ত এই মূর্খটাকে বাঁচানো উচিত। নইলে তার সমূহ বিপদ। ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয় মিলে এই নিষাদের যে ক্ষতিটা করবে, জীবন দিয়ে তার শোধ দিতে হবে তাকে। কর্ণ নিশ্চিত যে, দ্রোণ একলব্যের প্রাণ নেবে না, কিন্তু এমন কিছু একটা চেয়ে বসবে, যার জন্য চরম মূল্য দিতে হবে একলব্যকে।

কর্ণ আরও ভাবল—অরণ্যচারী এই মানুষগুলো যুগ যুগ ধরে সহজ-সরলই থেকে গেল। ব্রাহ্মণ্যকূটবুদ্ধির মারপ্যাঁচ আর ক্ষত্রিয়ের বাহুবলের স্বরূপ বুঝল না কোনোদিন। মানুষকে বিচার করতে শিখল—মানবিক মূল্যবোধের নিরিখে। প্রয়োজনে এবং স্বার্থে আঘাত লাগলে এই ক্ষত্রিয় আর ব্রাহ্মণরা যে কতটুকু হিংস্র হয়ে উঠতে পারে, তা জানল না এই বনভূমির মানুষগুলো। দ্রোণের দাবি মেটাতে গিয়ে তুমি যে একেবারে রিক্ত নিঃস্ব হয়ে যাবে একলব্য। তুমি ওভাবে রাজি হয়ো না। যা চান, তা দিতে সম্মত হয়ো না তুমি নিষাদপুত্র।

কর্ণের এই ভাবনাগুলো কথা হয়ে নৈষাদি একলব্য পর্যন্ত পৌঁছাল না। কর্ণের ভাবনাগুলো তারই মনের ভেতর ঘুরপাক খেতে লাগল। নিরুপায় কর্ণ চিৎকার করে উঠতে পারছে না, পাছে তার উপস্থিতি টের পেয়ে যান দ্রোণ। এই মুহূর্তে কুরুরাজপ্রাসাদে দ্রোণাচার্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিধর মানুষ। রাজপ্রাসাদের পরবর্তী উত্তরাধিকারীরা তাঁর বশীভূত। পিতামহ ভীষ্ম তাঁকে সমীহ করেন, ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে মূল্য দেন। সুতরাং এইসময় দ্রোণের


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্মকাণ্ডে বাধা দেওয়া মানে যমদূতকে ডেকে আনা। গাছের আড়ালে নিজে নিজেই নিষ্পেষিত হতে থাকল কর্ণ।

দ্রোণাচার্য সহজ গলায় বললেন, 'তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারছি না বৎস। গুরুদক্ষিণার নামটি শুনে তুমি যদি পিছিয়ে যাও। যদি বলো—তা কী করে সম্ভব গুরুদেব! অন্যকিছু চান আপনি আমার কাছে।'

বিনীতভাবে একলব্য বলল, 'নিষাদদের কাছে আর কিছু না থাকুক, কথার মূল্য আছে। জীবন দিয়ে কথার মর্যাদা রাখে তারা। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, যা চাইবেন, তা-ই দেব আমি।'

'তুমি প্রতিজ্ঞা না করলে আশ্বস্ত হতে পারছি না আমি। অল্প বয়স তোমার। আমার দাবি শুনে তুমি ভড়কে গিয়ে আবার পিছিয়ে না পড়ো।' অর্জুনের দিকে তাকিয়ে কথা শেষ করলেন দ্রোণ।

অর্জুন বুঝল—আচার্য কূটপথ ধরেছেন। জোরের পথে গেলেন না তিনি। এইসব হীনজাতের মানুষদের যা বললে নিতান্ত দুর্বল হয়ে পড়ে, তা-ই বলতে চাইছেন গুরুদেব। ভক্তির নেশায় আপ্লুত করে চরম ক্ষতি করতে চাইছেন একলব্যের।

গুরুর কথাকে সমর্থন করে অর্জুন বলে উঠল, 'গুরুদেব ঠিকই বলেছেন, তুমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও আগে, তারপর তিনি গুরুদক্ষিণার নাম উল্লেখ করবেন।'

এবার একলব্য দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠল, 'মা-বাবা আমাকে জন্ম দিয়েছেন, তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু জীবনে যাঁর কাছে আমি সর্বতোভাবে ঋণী, তিনি আমার পিতামহ অনোমদর্শী। সেই অনোমদর্শীর নামে শপথ করে বলছি—গুরুদক্ষিণা হিসেবে আপনি আমার কাছে যা চাইবেন, বিনা দ্বিধায় তা-ই দেব আমি আপনাকে।'

দ্রোণাচার্য আর অপেক্ষা করলেন না। ত্বরিত বললেন, 'তোমার ডান হাতের বুড়ো আঙুলটি আমায় দিতে হবে। সেটাই হবে তোমার গুরুদক্ষিণা।'

সেকালে গুরুরা শিষ্যদের কাছে গুরুদক্ষিণা চাইতেন। এটাই প্রথা। কিন্তু তাঁরা এমন কিছু চাইতেন, যা পূরণ করতে শিষ্যদের অনেক কঠিন পথ অতিক্রম করতে হতো, অনেক কায়িক শ্রম করতে হতো। কিন্তু গুরুরা এমন কিছু চাইতেন না, যা পূরণ করতে গিয়ে শিষ্যদের সাংঘাতিক কিছু ক্ষতি হয়ে যেত, জীবন সংশয় হতো।

কিন্তু গুরু দ্রোণ এমন দক্ষিণা চাইলেন, তা পূরণ করতে গিয়ে একজন তীরন্দাজের জন্য সবচাইতে দরকারি প্রত্যঙ্গটি হারাতে হবে। দ্রোণ একদিনের জন্যও একলব্যকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেন নি, অথচ একলব্য তাঁকে গুরুর সম্মান দিচ্ছে বলে তার সমূহ ক্ষতি করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত হলেন না দ্রোণ।

একলব্য দ্রোণাচার্যের গুরুদক্ষিণাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারত, কিন্তু ও যে দাদুর নামে প্রতিজ্ঞা করেছে। তাও না হয় উড়িয়ে দেওয়া যেত, কিন্তু ও যে অস্ত্রগুরুকে কথা দিয়েছে। যাকে সারাটা জীবন মনে মনে ভক্তি করে এসেছে, সেই গুরুকে কী করে প্রত্যাখ্যান করবে


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একলব্য! না, কিছুতেই না। বুড়ো আঙুলটি কর্তন করতে গিয়ে যদি তার প্রাণও যায়, তাতেও ঠিক আছে। নিজেকে কিছুতেই মলিন করা চলবে না।

অবিচলিতভাবে স্থির চোখে সে দ্রোণের মুখের দিকে তাকাল। তাকিয়েই থাকল কিছুক্ষণ। আচার্যের চোখে তখন নিষ্ঠুরতা খেলা করছে, অর্জুনের চোখ চকচকে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে তার প্রবল প্রতিপক্ষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। এর চেয়ে আনন্দের ও লোভের আর কী হতে পারে ?

কোমরে গোঁজা টাঙ্গিটা টেনে বের করল একলব্য। তারপর উঠানের একপ্রান্তে দৃঢ় পদক্ষেপে হেঁটে গেল। কদলিবৃক্ষের নিকটেই গেল সে। একটা নবীন কদলিপত্রের অগ্রভাগ সেই টাঙ্গি দিয়ে কেটে নিল। তারপর গেল জলভর্তি কলসির কাছে। পত্রআগাটি ভালো করে ধুয়ে নিল সে। অপরিষ্কার কোনো পত্রের ওপর তো আর গুরুদক্ষিণা দেওয়া যায় না। আস্তে আস্তে দ্রোণাচার্যের পায়ের কাছে এগিয়ে গেল একলব্য। হাঁটু গেড়ে বসল। কদলিপত্রটি পায়ের কাছে রাখল।

তারপর তীক্ষ্ণ টাঙ্গিটি দিয়ে একটানে নিজের ডানহাতের বুড়ো আঙুলটি কেটে ফেলল। ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। কলাপাতাটি ঘন লাল রক্তে ভরে উঠল। সেই রক্তের মাঝখানে একলব্য তার কর্তিত আঙুলটি রাখল। অবিচলিত মুখ তার, স্থির চোখ। তার শরীরটি থিরথির করে কাঁপছে।

হঠাৎ হা হা করে হেসে উঠল অর্জুন। দ্রোণাচার্য একপলকের জন্যও একলব্যের কর্তিত আঙুলটির দিকে তাকালেন না। হনহন করে উল্টো দিকে হাঁটা শুরু করলেন তিনি।

উঠানের মাঝখানে, সারা গায়ে সূর্যকিরণ মেখে, নিজের কর্তিত রক্তাক্ত বুড়ো আঙুলটির সামনে, নির্বাক হয়ে বসে থাকল একলব্য।

নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না কর্ণ। হা হা করে বৃক্ষের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। দ্রোণ-অর্জুনের পথ আগলে দাঁড়াল।

'বাঃ! বাঃ! কী চমৎকার বিচার আপনার গুরুদেব! ধুত্তুরি, বিচার বলছি কেন, এ তো আপনার গুরুদক্ষিণা। দীক্ষা না দিয়েও গুরুদক্ষিণা নিলেন আপনি! আপনি না নিজেকে সত্যপ্রিয় ন্যায়বিচারক বলে দাবি করেন ? সদ্‌ব্রাহ্মণ বলে আপনার সে-কী অহংকার! এই কি সদ্‌ব্রাহ্মণের গুরুদক্ষিণা ? যে তরুণটিকে আপনি হীনবংশের বলে একদিন দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, একদিনের জন্যও যাকে আপনি অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেন নি, সেই তরুণটির কাছ থেকে দক্ষিণার দোহাই দিয়ে তার দামি প্রত্যঙ্গটি কেড়ে নিলেন ? আপনি তো অবিরাম বলে গেলেন—নিষাদ, তুমি আমার শিষ্য নও, তোমাকে আমি কখনো দীক্ষা দিই নি। তাহলে শিষ্য নয় এমন একজন সহজসরল তরুণের কাছ থেকে দক্ষিণা নিলেন কী করে ? আর নিলেন যদি, কী নিলেন ? তীর নিক্ষেপণে যে প্রত্যঙ্গটি সবচাইতে জরুরি, সেটাই কেড়ে নিলেন আপনি ? গুরুর তো উচিত গুরুদক্ষিণা সঙ্গে নিয়ে যাওয়া। আপনি তো দক্ষিণা সঙ্গে নিচ্ছেন না, ফেলে রেখে যাচ্ছেন। ভুলে বোধ হয় ফেলে যাচ্ছেন। দাঁড়ান, আমি রক্তভেজা আঙুলটি আপনার কাছে এনে দিই।' কখনো রুষ্ট, কখনো শোকার্ত গলায় বলে গেল কর্ণ।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এতক্ষণে কথা বললেন দ্রোণ, 'পথ ছাড়ো কর্ণ। আমাকে যেতে দাও। বাতুলতা কোরো না।'

'তা তো হয় না গুরুদেব। আমি অত সহজে তো আপনাকে যেতে দেব না। একলব্যের কাটা আঙুলটি আপনাকে নিয়ে যেতেই হবে।' বলে হু হু করে কেঁদে উঠল কর্ণ। অনেকক্ষণ কাঁদল সে।

তারপর অর্জুনের দিকে মুখ ফেরাল কর্ণ। তীব্র রোষে জ্বলে ওঠা কণ্ঠে বলে উঠল, 'তুমি তৃপ্ত হয়েছ তো অর্জুন ? কল্পিত প্রতিদ্বন্দ্বীর উজ্জ্বল ভবিষ্যতটি ধ্বংস করতে পারায় তোমার তো খুশি হওয়ারই কথা। একজন নিষাদের ভয়ে তুমি কম্পিত হলে ? তুমি না দ্রোণের শ্রেষ্ঠ শিষ্য ? অসহায় কাউকে নির্মূল করার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের কী-ই বা আছে ? উত্তম ছাত্রের দোহাই দিয়ে আচার্যকে অন্যায় কাজে প্ররোচিত করেছ তুমি। তোমারই উস্কানিতে উত্তেজিত হয়ে জগদ্বিখ্যাত অস্ত্রগুরু ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করলেন। না গুরুদেব ?' দ্রোণের দিকে তাকিয়ে কথা শেষ করল কর্ণ।

'তুমি সূতপুত্র। তোমার সঙ্গে অযথা তর্ক করতে রাজি নই আমি।' দ্রোণাচার্য বললেন।

অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল কর্ণ। বলল, 'হাসালেন গুরুদেব, ভীষণ হাসালেন আমায়।' একটু থেমে আবার বলতে শুরু করল কর্ণ, 'সূতপুত্র বলে নিন্দা করছেন আমাকে। এ আপনার নতুন কথা নয়, পুরনো কথা। জিজ্ঞেস করি—সূতপুত্র বড় না নিষাদপুত্র ? জানি, ব্রাহ্মণ্যচিন্তায় উদ্বেলিত হয়ে আপনি বলবেন—কেন, সূতপুত্র নিষাদপুত্রের চেয়ে বড়। মানে নিষাদরা সূতের চেয়েও হীন, নিকৃষ্ট। জিজ্ঞেস করি, সেই নিকৃষ্ট মানুষটির কাছ থেকে দান গ্রহণ করতে কেমন লাগল আপনার ? গুরু না হয়েও যিনি গুরুদক্ষিণা নেন, তা তো তখন দক্ষিণা থাকে না আর। তা হয়ে যায় অনুগ্রহের দান। আজ সেই অনুগ্রহের দানই গ্রহণ করলেন আপনি তথাকথিত সেই হীন জাতের নিকৃষ্ট তরুণটির কাছ থেকে।'

দ্রোণের মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোল না। অর্জুন বলল, 'তুমি চুপ থাকো কর্ণ।'

'আমি চুপ থাকলে কী হবে ? ভবিষ্যতের পৃথিবী একদিন তোমাদের দুজনকেই নিন্দা জানাবে। ধিক্কার দেবে তোমাদের নামে। শোনো অর্জুন, বিনা অপরাধে একলব্যের বুড়ো আঙুলটি কেটে নিলে তোমরা। এর জন্য সর্বাংশে তুমি দায়ী। ভবিষ্যতে তোমাকে এর জন্য মস্ত বড় মূল্য দিতে হবে। কে জানে, হয়তো এই একলব্যের সামনেই, প্রাণভিক্ষার জন্য একদিন হাঁটু গেড়ে বসতে হবে তোমায়।'

তারপর কর্ণের কী হলো কে জানে, খুব বিচলিত দেখাল তাকে। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর কড়া দুটো চোখ দ্রোণের দিকে ফেরাল। কঠিন কণ্ঠে বলল, 'আমি অধিরথ-পুত্র। গোটা জীবনে আমি যদি সামান্য ভালো কাজ করে থাকি, তার দোহাই দিয়ে বলছি—এমন একদিন আসবে সেদিন এই অসহায় একলব্যের মতো আপনি নিরুপায় ভঙ্গিতে বসে থাকবেন। একলব্যের বুড়ো আঙুলের মতো আপনার শরীরের কোনো প্রত্যঙ্গ কেউ ধারালো অস্ত্র দিয়ে কেটে নিয়ে যাবে। এই আমার অভিশাপ হলে অভিশাপ,


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঈশ্বরের কাছে আকুল প্রার্থনা হলে প্রার্থনা, এ দুটোর যে-কোনো একটি বা দুটোই ধরে নিতে পারেন।'

বলতে বলতে আকুলিত কান্নায় ভেঙে পড়ল কর্ণ। তার তূণ, তার ধনুক মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। ধুলার ওপর দুমড়ে মুচড়ে বসে পড়ল কর্ণ।

মাথা নিচু করে দ্রোণাচার্য আর অর্জুন একলব্যের কুটিরাঙ্গন ত্যাগ করলেন।

পেছনে পড়ে থাকল কর্ণ। পড়ে থাকল কর্তিত আঙুলের একলব্য, পড়ে থাকল রক্তভেজা একলব্যের বুড়ো আঙুলটি।

AMARBOI.COM


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।

রজনী গভীর।

বেঘোরে পড়ে আছে একলব্য।

শয্যার ওপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে সে। মুদিত চোখ। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। মুখমণ্ডলে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ধূলিমলিন দেহ। অদূরে মাটির প্রদীপ ক্ষীণ আলো ছড়াচ্ছে। আঙিনার মধ্যিখানে তিনটি শিবা ঘাপটি মেরে বসে আছে। একলব্য মৃত না জীবিত বুঝে উঠতে পারছে না। মৃত বলে নিশ্চিত হলে হয়তো দেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। সন্ধ্যা নাগাদ উঠানে এসেছে তারা। কদলিপত্রের রক্ত চেটেপুটে খেয়েছে। বুড়ো আঙুলটি চিবানোর চেষ্টা করেছে। বড় শক্ত কর্তিত আঙুলটি। নিত্যদিন জ্যা-এর ঘর্ষণে ঘর্ষণে আঙুলটির চামড়া জমাট বেঁধে গেছে। মাংস শুকিয়ে জট পাকিয়ে গেছে আঙুলটায়। বুড়ো আঙুলটি চিবিয়ে স্বাদ পেল না শিবারা। ধুলায় পড়ে থাকল আঙুলটি। লোভী চোখে, সেই সন্ধ্যা থেকে, একলব্যের দিকে তাকিয়ে আছে শিয়ালরা।

দ্রোণরা চলে গেলে একলব্যের নিকটে এগিয়ে এসেছিল কর্ণ। মাটি থেকে টেনে দাঁড় করিয়েছিল একলব্যকে। তখনো হাতের কর্তিত জায়গাটি থেকে টপটপ করে রক্ত ঝরছিল। একলব্য স্থির। তার চোখের পলক নিষ্কম্প। কোনো ক্রোধ বা সন্তোষের চিহ্ন নেই তার মুখে-কপালে। তার যেন কিছুই হয় নি। তার ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই, ভাবনা নেই, যাতনা নেই। সে যেন এক রক্তমাংসহীন মানুষ।

উঠানের ধারে তাকে টেনে নিয়ে গেল কর্ণ। একটা বড় গাছের ছায়ায় বসাল। একলব্যের বাম হাতখানি দিয়ে কর্তিত অংশটি চেপে ধরাল। 'আসছি' বলে দ্রুত স্থানান্তরে গেল কর্ণ।

পরশুরামের মাহেন্দ্র বিদ্যালয়ে অস্ত্রবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে ভেষজবিদ্যার শিক্ষাও দেওয়া হয়েছিল কর্ণকে। অস্ত্রপাঠশালার এটাই নিয়ম। অস্ত্রের সঙ্গে অস্ত্রাঘাতের নিবিড় সম্পর্ক। অস্ত্রাঘাতে মানুষ ক্ষতবিক্ষত হয়। ক্ষতের শুশ্রূষার প্রয়োজন পড়ে তখন। ক্ষত নিরসনের তাগিদ থেকেই প্রত্যেক অস্ত্রপাঠশালায় ভেষজবিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা। মাহেন্দ্র বিদ্যালয়ে কর্ণ অস্ত্রবিদ্যার পাশাপাশি ভেষজবিদ্যাতেও পারদর্শী হয়ে উঠেছিল। একলব্যকে গাছতলায় বসিয়ে রেখে সে গহিন অরণ্যে ঢুকে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যে কিছু লতাগুল্ম ও পাতা নিয়ে ফিরে এল। হাতের তালুতে কচলে তা কর্তিত অংশে বেঁধে দিল। তৎক্ষণাৎ রক্তপড়া বন্ধ


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলো। কিছু ভেষজাঙ্গ একলব্যকে খাইয়ে দিল। তারপর বামহস্ত আকর্ষণ করে কর্ণ একলব্যকে কুটিরের দাওয়ায় নিয়ে গেল। কলসি থেকে জল গড়িয়ে জলপাত্রটি মুখের কাছে ধরল। ঢক ঢক করে সম্পূর্ণ জল খেয়ে ফেলল একলব্য। একলব্যকে বিছানায় শুইয়ে দিল কর্ণ। তারপর নির্বাক কর্ণ বসে থাকল একলব্যের পাশে।

দুজনের মধ্যে একটি কথাও বিনিময় হলো না। সূর্যের রথ মধ্যগগন পেরিয়ে পশ্চিমে চলে গেল। তখনো একলব্য স্থিরনেত্র, নির্বাক। কর্ণ ভেতরে ভেতরে ভীষণ অবাক হলো। এ কেমন মানুষরে বাবা! এত বড় অন্যায় কাজের পর, নিজের মূল্যবান অঙ্গ হারানোর পর, নিদারুণ লাঞ্ছনার পরও কোনো ভাবান্তর নেই! রোষে জ্বলে ওঠা নেই, কান্নায় ভেঙে পড়া নেই, উন্মাদের মতো আচরণ নেই, শুধু ধীরস্থির হয়ে থাকা। এ কেমন নিষাদ! নিষাদদের কি জ্বালাযন্ত্রণা নেই ? তারা কি বেদনায় কাঁদে না ? তারা কি অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শিখে নি ?

এসব ভাবতে ভাবতে সন্ধ্যা নেমে এল। এবার কর্ণকে যেতে হবে। একলব্যের দিকে তাকাল কর্ণ। বলল, 'তোমার ভেতরে কী হচ্ছে অনুমান করছি। আমাকে যেতে হবে। বহুদূরের পথ। রাত্রি নামার আগে অরণ্যপথ অতিক্রম করে যেতে হবে আমায়। আশা করছি, তুমি সেরে উঠবে। তোমার দেহ সারলে কী হবে, জানি—তোমার মনের ঘা শুকাবে না কোনোদিন।'

তার পর আরও কিছুক্ষণ বসে থাকল কর্ণ একলব্যের পাশে। তারপর উঠে দাঁড়াল। 'যাওয়ার আগে তোমাকে একটা কথা বলে যাই—থেমে যেয়ো না তুমি। তুমি প্রমাণ কোরো—ব্রাহ্মণদের হাজারো বিরোধিতার মধ্যেও তথাকথিত হীনজাতের মানুষরা মাথা তুলে দাঁড়াতে জানে। আমার দিকে তাকাও। আমি কর্ণও সেরকম একজন মানুষ।' বলে আর দাঁড়াল না কর্ণ। দূরের বৃক্ষগুঁড়ি থেকে অশ্বের বাঁধনটি খুলে চড়ে বসল।

একলব্য মূর্ছা গেল। সেই অচেতন অবস্থা এখনো চলছে। মৃদু লয়ে শ্বাস পড়ছে। অনাবৃত বুকটি সামান্য ওঠানামা করছে।

অতি ভোরে চেতনা ফিরে এল একলব্যের। চোখ খুলল সে। মাথাটা হালকা লাগছে। শরীর থেকে ব্যথা অনেকটাই তিরোহিত। চট করে উঠে বসল একলব্য। দ্রুত ডানহাতের দিকে তাকাল। কর্ণের কথা মনে পড়ল একলব্যের। হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠল সে। বুক ফেটে কান্না এল তার। অনেকক্ষণ কাঁদল একলব্য। যখন তার কান্না থামল, পুবাকাশে সূর্য তখন অনেক দূর উঠে এসেছে। সে দাওয়া থেকে নামল।

ধীর পায়ে দ্রোণের মৃন্ময় মূর্তির নিকটে হেঁটে গেল একলব্য। স্পষ্ট চোখে তাকাল মূর্তিটির দিকে। এরপর কদলিপত্রটির দিকে এগিয়ে গেল। পত্রটি এখন ছিন্নভিন্ন। শেয়ালের পায়ের আঁচড়ে, আর জিহ্বার ঘর্ষণে পাতাটি ছিঁড়ে গেছে। নিকটেই তার বৃদ্ধাঙুলটি পড়ে আছে। আঙুলটির চামড়া এখানে ওখানে উবে গেছে। অনেকটা নির্মোহ দৃষ্টিতেই একলব্য



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকিয়ে থাকল কর্তিত আঙুলটির দিকে। তারপর তাকাল ডানহাতের দিকে। উষ্ণ ক্ষুব্ধ বায়ু তার বুকের ভেতর থেকে নাকমুখ দিয়ে বেরিয়ে এল।

দৃঢ় পদক্ষেপে দ্রোণের মূর্তিটির দিকে আবার এগিয়ে গেল একলব্য। কী চমৎকার মূর্তি, কিন্তু কী নিষ্ঠুরতায় ভরা! এই সেই আচার্যের মূর্তি, যার পায়ের কাছে বসে সে দিন ও রাত্রিকে এক করে ছেড়েছে। কখন সূর্য উঠল, কখন অস্ত গেল, কখনই বা রাত্রি গভীর হলো, কখন পূর্ণিমা হলো, কখন অমাবস্যার তুমুল অন্ধকার পৃথিবীকে ঢেকে দিল—কোনো কিছুরই খবর রাখে নি একলব্য। গ্রীষ্মের খররোদ, শীতের দন্তবিস্তারি কামড় বা ঘোর বর্ষার দাপট সাধনা থেকে তাকে বিচ্যুত করতে পারে নি। এই মূর্তিকে জ্যান্ত দ্রোণাচার্য ভেবে নিবিড় শ্রদ্ধায় অবিরত অস্ত্রসাধনা করে গেছে একলব্য। কোনো শারীরিক কষ্ট বা প্রকৃতির অত্যাচার সাধনপথ থেকে তাকে টলাতে পারে নি।

কিন্তু আজ, আজ যে সে একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছে। এতদিন দ্রোণাচার্যই তার বেঁচে থাকার সম্বল ছিলেন; তার আদর্শ, তার সাধনার উজ্জীবনী শক্তি ছিলেন। আজ তো সবই ফুরিয়ে গেল। তার গুরু নেই, তার কোনো অবলম্বন নেই আজ।

'হায় আচার্য, এত নির্দয় নিষ্ঠুর আপনি! কিছুই তো দাবি করি নি। আপনার কাছে শুধু স্বীকৃতিটুকু চেয়েছিলাম। সেই স্বীকৃতির বিনিময়ে আমার এত বড় ক্ষতি করলেন আপনি! আমার জীবনের সবকিছু কেড়ে নিলেন! আজ আমাকে একেবারে রিক্ত করে পথের ধূলিতে বসিয়ে দিলেন! তার চেয়ে মৃত্যুদণ্ড দিলেই তো ভালো করতেন। তা না করে মৃত্যুর চেয়ে অধিক যাতনা দিয়ে গেলেন। ধনুর্বিদ্যাই আমার জীবনের ধ্যানজ্ঞান। আপনার আশীর্বাদে, আপনার প্রত্যক্ষ সাহচর্য ছাড়া এই বিদ্যার্জনে আমি বেশ কিছুদূর এগিয়েও গিয়েছিলাম। কিন্তু সেই এগোনোর পথ রুদ্ধ করে দিলেন আপনি। আমাকে সর্বস্বান্ত করে ছাড়লেন।'

'আপনি মানুষ ? আপনি গুরু ? মানুষ তো বটেই। মানুষ না হলে গুরু হলেন কী করে ? তবে আপনি সাধারণের গুরু নন। উঁচুবর্ণের গুরু আপনি। নিজে দরিদ্র হয়েও ধনীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব আপনার। অতিসহজেই অতীতকে ভুলেছেন আপনি।'

একলব্যের অন্তরের যন্ত্রণা তার মস্তিষ্ককে আবৃত করল। মনে হলো গতকাল দ্রোণ শুধু তার বুড়ো আঙুলটি কেটে নেন নি, তীক্ষ্ণ তরবারি দিয়ে তার হৃৎপিণ্ড, তার সকল স্বপ্নসাধকে কেটে কেটে টুকরো টুকরো করেছেন।

কত অল্প বয়সে তার স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার প্রাসাদটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল! একলব্যের প্রতিভার কোনো মূল্য দিলেন না দ্রোণ। জাতপাতের দোহাই দিয়ে, নিষাদ বলে ঘৃণা করে দূরে ঠেলে দিলেন। কিন্তু স্বার্থসিদ্ধির সময় ঠিকই কাছে এলেন। হেলায় তার সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে চলে গেলেন।

আচার্য দ্রোণের সঙ্গে একলব্যের একটা হার্দিক সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। এ সংযোগ শুদ্ধভক্তির। কিন্তু একলব্যের সরলতার সুযোগ নিয়ে দ্রোণ মস্তবড় ডাকাতিটা করলেন। পাছে অর্জুন শ্রেষ্ঠ ধনুর্বিদের সম্মান থেকে বঞ্চিত হয়, তাই কৌশলে একলব্যের বৃদ্ধাঙুলটি হরণ করলেন।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসবকিছু ভাবতে ভাবতে ছটফট করে উঠল একলব্য। বিধাতার রাজ্যে সকল মানুষই তো এক। মানুষই মানুষের মধ্যখানে দেয়াল তুলল। ছোট জাত বড় জাত, উঁচু বর্ণ নিচু বর্ণ বলে বলে কী রকম আলাদা আলাদা হয়ে গেল। একদল অন্যদলের হাতে পীড়িত-লাঞ্ছিত হলো। একদল শাসন করল, অন্যদল শাসিত হলো। এই বৈষম্য আর বিদ্বেষে মানুষ জর্জরিত হতে থাকল। এই অসাম্য আর বিদ্বেষ ছড়াতে যারা সবার আগে এগিয়ে এল, তারা ব্রাহ্মণ। নিষ্কর্মা একটা শ্রেণি। তারা শুধু পঠনপাঠন আর শাস্ত্ররচনাকে মূলধন করে মানুষের বিশ্বাস আর আবেগের ওপর গভীর একটা রেখাপাত করল। ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে মিশে মানুষের মস্তকে পাদুকা রাখল তারা। তারাই আজ মনুষ্য-বিশ্বাসের হর্তাকর্তাবিধাতা।

হঠাৎ ভীষণ অস্থির হয়ে উঠল একলব্য। বুনো শুয়োরের মতো পৃথিবীকে খানখান করতে ইচ্ছে করল তার। টুকরো টুকরো পৃথিবীকে ছুড়ে ছুড়ে মেরে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের এই অহংদীপ্ত সমাজপ্রথাকে ছিন্নভিন্ন করতে চাইল সে। হাতের কর্তিত অংশের দিকে তাকিয়ে একলব্যের ভেতরে ঘৃণার প্রবল একটা পিণ্ড পাকিয়ে উঠল। দ্রোণরা এই অবাক করা সুন্দর পৃথিবীকে মনোহর থাকতে দেবেন না। এঁদের মস্তিষ্ক নেই, এদের হৃৎপিণ্ড নেই, বোধশক্তি নেই, ভালোবাসা নেই, কিছুই নেই। সামনে দাঁড়ানো দ্রোণের মূর্তিকে ভেঙে তছনছ করে দিতে ইচ্ছে করল একলব্যের। এ তো এখন সুশোভন শ্রদ্ধার মূর্তি নয়, এ তো শুধু একতাল মাটি।

পাশ থেকে বামহাতে একটা মুগুর কুড়িয়ে নিল একলব্য। প্রচণ্ড আক্রোশে একের পর এক আঘাত করতে লাগল দ্রোণাচার্যের মৃন্ময় মূর্তিটির ওপর। ঝুর ঝুর করে ভেঙে পড়তে লাগল মাটি। একলব্য চিৎকার করে বলতে লাগল, 'তুমি আমার গুরু নও, তুমি আমার আদর্শ নও। তুমি লোভী, তুমি স্বার্থপর, তুমি পক্ষপাতী। তুমি পাষণ্ড। তুমি হত্যাকারী। তুমি হত্যা করেছ আমার আজন্মলালিত বাসনাকে। তুমি দস্যুর মতো আমার সর্বস্ব লুণ্ঠন করে একেবারে নিঃস্ব করে দিয়েছ আমায়।'

তারপর আকাশের দিকে মুখ তুলে একলব্য গর্জন করে উঠল,'দ্রোণ, এখন থেকে তুমি আমার গুরু নও। অর্জুন, তোমাকে আমি দেখে নেব।'

পরদিন থেকে একলব্য অন্যমানুষে রূপান্তিত হলো। দৃঢ়, বাস্তববাদী, আবেগবর্জিত। একলব্যের মন একেবারে শক্ত হয়ে গেল। স্রষ্টা মানুষকে দুটো হাত দিয়েছেন কাজ করার জন্য। কোনো হাত ছোট, কোনো হাত বড় করেন নি। তার তো সবই ঠিক আছে। শুধু ডান হাতের বুড়ো আঙুলটি নেই। তাতে কী হয়েছে ?

'মানুষের গোটা শরীরের তুলনায় আঙুলটি নিতান্ত ক্ষুদ্র একটি প্রত্যঙ্গ। এই প্রত্যঙ্গ ছাড়াই আমি উঠে দাঁড়াব। আমার তো বুদ্ধি, মেধা, কর্মতৎপরতা—সবই ঠিক আছে। আমার কিছুই তো অকেজো হয়ে যায় নি। এই তো ডান হাতটা আগের মতো সচল আছে। তাহলে ম্রিয়মান হব কেন ? আমি আবার উঠে দাঁড়াব। উঠে দাঁড়াতেই হবে আমাকে। জগতকে দেখিয়ে দিতে হবে দ্রোণের মতো গুরু ছাড়াও শ্রেষ্ঠ ধনুর্বিদ হওয়া যায়।' এরকমই ভাবল একলব্য।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা সময়ে ক্ষতস্থানটা শুকিয়ে গেল একলব্যের। সে ডান হাত দিয়ে আবার ধনুকে তীর যোজনা করবে, আবার লক্ষ্যভেদ করবে, বুড়ো আঙুলবিহীন ওই ডান হাত দিয়েই। কিন্তু শুধু প্রতিজ্ঞা করলে তো হবে না, চাই অধ্যবসায়, প্রতিদিনের কষ্টলগ্ন শিক্ষণ।

বৃদ্ধাঙুলটি কর্তন করে গুরুদক্ষিণা দেওয়ার পরে একলব্য আবার কঠোর অস্ত্রসাধনা শুরু করল। বুড়ো আঙুল ছাড়া ডানহাতের অন্য চারটি আঙুল দিয়ে আগের মতো দূরে, আগের মতো ক্ষিপ্রতায় শরনিক্ষেপের সাধনা করে যেতে লাগল একলব্য। বুড়ো আঙুল না থাকায় তার বাণের গতি কমে এসেছিল, বারবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছিল তার নিক্ষেপিত তীর। যত শিগগির পরের পর পর বাণ নিক্ষেপ করতে পারত একলব্য, এখন তা আর পারে না। কিন্তু একলব্য দমবার পাত্র নয়। দাদু বলেছিলেন, অভ্যাসই মানুষের মূল চালিকাশক্তি। অভ্যাস মানুষকে অপটু থেকে নিপুণ করে তোলে। অভ্যাসে নিষ্ঠাবান থাকলে যে-কোনো মানুষ তার কাঙ্ক্ষিত স্থানে পৌঁছাতে পারে।

দাদু অনোমদর্শীর বাক্যকে সম্বল করে একলব্য তীর নিক্ষেপের অভ্যাস চালিয়ে যেতে লাগল। অঙ্গবৈকল্য থাকা সত্ত্বেও নিজের মতো করে তীর চালনা অব্যাহত রাখল একলব্য। ধীরে ধীরে তার অসংগতি কেটে যেতে লাগল। তার নিক্ষেপিত তীর গিয়ে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করা শুরু করল। একলব্য বুঝল—কর্মসাধনায় সে এগোচ্ছে। তবে পূর্ণ সাফল্য অর্জন এখনো অনেক দূর।

কী করে, কী করে নিষাদরাজ্যের রাজধানীতে সংবাদ গেল—দ্রোণাচার্য রাজপুত্র একলব্যের ডান হাত কেটে নিয়েছেন। সংবাদ কণ্ঠান্তর হলে যা হয়, তিল তাল হয়, মূষিক হাতি হয়, টিলা পর্বত হয়, একলব্যের ক্ষেত্রেও তা-ই হলো। ডান হাতের বুড়ো আঙুল সম্পূর্ণ ডানহাত হয়ে গেল।

সংবাদ পেয়ে বিশাখা একেবারে ভেঙে পড়লেন—হায় হায়, ঈশ্বর, যে গুরুর কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিখতে গেল, সেই গুরুই হাত কেটে নিল! হায় ভগবান, এ-কী হলো রে! আমার বাছাধনের সর্বনাশ হয়ে গেল রে!

হিরণ্যধনু ভেতরে ভেতরে চূর্ণবিচূর্ণ হলেন। বাইরের কাউকে কিছু বুঝতে দিলেন না। গুপ্তচর পাঠিয়ে একলব্যের অবস্থা ও অবস্থান জানার নির্দেশ দিলেন সেনাপতিকে।

কোনো ভাবান্তর হলো না শুধু অনোমদর্শীর। তিনি তাঁর নাতিকে যথার্থভাবে চেনেন। তাকে ঘিরে কোনো একটা কিছু হয়েছে এটা সত্য, তবে একলব্য যে বিধ্বস্ত হয় নি, এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত। ব্যাপারটি জানার জন্য তিনি কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

গুপ্তচর সংবাদ আনলে পুত্রের কাছে যাওয়ার জন্য হিরণ্যধনু প্রস্তুত হলেন। অল্পসংখ্যক দক্ষ অশ্বারোহী সৈনিক সঙ্গে যাওয়ার জন্য তৈরি হলো। প্রধান সেনাপতি সঙ্গে যেতে চাইলে হিরণ্যধনু নিষেধ করলেন।

বিশাখা পথ আগলে দাঁড়ালেন, 'আমিও যাব তোমার সঙ্গে।'


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিরণ্যধনু বললেন, 'বন্ধুর পথ, পাহাড়ি চড়াই-উৎরাই। গহিন বন, শ্বাপদসংকুল। যে-কোনো মুহূর্তে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা। যাচ্ছি একলব্যকে ফিরিয়ে আনতে। শিগগির তাকে নিয়ে ফিরব। তুমি যেয়ো না বিশাখা।'

বিশাখা বিরত হলেন। কিন্তু অনোমদর্শীকে থামানো গেল না। তিনি হিরণ্যধনুর সঙ্গে চললেন।

এক অপরাহ্নে একলব্যের কুটিরের সামনে উপস্থিত হলেন তাঁরা। একলব্য তখন উঠানের মধ্যিখানে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে অনুশীলনে মগ্ন। জ্যা-এ তীর যোজনা করে তর্জনী ও মধ্যমা দিয়ে নিজের দিকে টানতে ব্যস্ত। তার মন একাগ্র, দৃষ্টি দূরবর্তী বস্তুতে স্থির নিবদ্ধ।

হিরণ্যধনু ডান হাত তুলে শব্দ করতে নিষেধ করলেন সবাইকে। ভালো করে দৃষ্টি প্রসারিত করলেন ছেলের দিকে। এ-কী দেখছেন তিনি! এ কাকে দেখছেন! ও-ই কি রাজপুত্র একলব্য ? যদি হয়, তবে তার রাজবসন কোথায় ? শরীরের পেলবতা কোথায় ? কাঁধ ঝুলানো চুল কোথায় ? এই কি তার সন্তান একলব্য ? এ একলব্যের মাথায় যে জটা! শ্মশ্রু যে তার মনোহর মুখমণ্ডলখানি ঢেকে ফেলেছে। সমস্ত শরীর যে ধুলায় মলিন। জীর্ণ বসনে নিম্নাঙ্গ ঢাকা, তা-ও হাঁটু পর্যন্ত। রাজপুত্রের শরীরে লাবণ্য কোথায় ? হাড় জিরজিরে দেহের ওই তরুণটি কি তাঁর পুত্র, তাঁর প্রিয়তম আত্মজ!

অনেক কষ্টে নিজের আবেগকে দমন করলেন হিরণ্যধনু। নিঃশব্দ পায়ে একলব্যের কাছে এগিয়ে গেলেন। অস্ত্রনিমগ্ন পুত্রের কাঁধে আলতো করে হাত রাখলেন।

ভীষণ চমকে পেছন ফিরল একলব্য। সামনে পিতাকে দেখে মুহূর্তকালের জন্য স্থির থাকল সে, তারপর বিদ্যুদ্‌বেগে পিতার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। হিরণ্যধনুর বুকে নিজের মাথাটি রেখে ফুলে ফুলে কাঁদল একলব্য। সে একজন অবলম্বন খুঁজছিল। এই বিষণ্নতাময় বেদনার দিনে সাহস ও শক্তি জোগাবার জন্য একজন সহানুভূতিশীল মানুষের প্রয়োজনীয়তা ভীষণভাবে অনুভব করছিল একলব্য। এই নিরাশার দিনে পিতা তার সামনে এসে দাঁড়ালেন। তার বুকে আশার সঞ্চার হলো। বিপুল কান্নাটা স্তিমিত হয়ে এলে একলব্য বলল, 'বাবা, আমাকে সাহস দাও। বেঁচে থাকার শক্তি জোগাও।'

কখন অনোমদর্শী পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, দুজনের কেউ টের পান নি। গম্ভীর দরদভরা কণ্ঠে তিনি বললেন, 'তোমার মতো একজন দুঃসাহসীকে কে সাহস জোগাবে একলব্য ? এত বড় ঝড়ের পরও যে টিকে থাকে, তার কখনো অন্যের সাহসের দরকার পড়ে না।' বলতে বলতে নাতির হাত চেপে ধরলেন অনোমদর্শী।

'নিজের ভেতরের সকল আবেগকে নির্বাসনে পাঠাও। তোমার সকল বিভ্রম কেটে যাবে।' বললেন তিনি।

'আমার ভেতরের সকল মোহ, সকল আবেগ কেটে গেছে দাদু। আমি এখন সম্পূর্ণ একজন পরিবর্তিত মানুষ।' ধীরে ধীরে একলব্য বলল।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সন্ধ্যা নামল। ফিরে যাওয়ার সময় নেই এখন। রাতটা এই কুটিরেই কাটিয়ে দিই পিতা। কাল প্রত্যুষে যাত্রা শুরু করব।' পিতার দিকে চেয়ে কথা শেষ করলেন হিরণ্যধনু।

অনোমদর্শী সম্মতি জানালেন।

কুটিরের চারদিকে সৈন্যরা পাহারা বসাল। স্থানে স্থানে প্রদীপ জ্বালাল। অদূরে উনুন জ্বালানো হলো। সৈন্যরা রাতের খাবারের প্রস্তুতি নিতে থাকল।

আহার শেষে কুটিরের মধ্যে মুখোমুখি ত্রিভুজ আকারে বসলেন তিন প্রজন্মের তিনজন মানুষ। তিনজনই চুপচাপ। পিদিমের মৃদু আলো ঘরের ভেতর একধরনের মায়াময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। একলব্যকে ভিনজগতের মানুষ বলে মনে হচ্ছে হিরণ্যধনুর। আত্মজের সেই কোমল মুখখানি কী রকম অচেনা অচেনা লাগছে। চোখের নিচে কালি। কপালে কি বলিরেখার সামান্য উদ্ভাসন ? ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না। হাতের আঙুলগুলো সৌষ্ঠবহীন। ডানহাতের দিকে তাকাতেই হিরণ্যধনুর বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল। কিছু একটা বলবার জন্য প্রস্তুতি নিলেন তিনি।

এইসময় অনোমদর্শী বলে উঠলেন, 'একটা গল্প বলি শোনো।' দুজনেই উৎকর্ণ হলেন।

'বনবাস থেকে রাম ফিরে এসেছেন। রাজা হয়েছেন তিনি অযোধ্যার। সুখের সংসার রামের। রাজ্যে শুধু শান্তি আর আনন্দ। জরাজীর্ণতা দেশ থেকে নির্বাসন নিয়েছে। প্রজারা দারুণ সুখে জীবনযাপন করছে। রাজা হিসেবে রামের স্বস্তির অন্ত নেই। একদিন এক ব্রাহ্মণ এসে রামের সেই স্বস্তিতে ঠান্ডা জল ঢেলে দিল।' বলে চলেছেন অনোমদর্শী। জিজ্ঞাসু চোখে একলব্য তাকিয়ে থাকল দাদুর দিকে।

অনোমদর্শী শুরু করলেন আবার, 'সেই ব্রাহ্মণ রাজা রামচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলল, আমার পুত্র অকালে মারা গেছে। আর মৃত্যুর জন্য আপনার রাজ্যের অরাজকতাই দায়ী। বিস্মিত রাম জিজ্ঞেস করলেন, অরাজকতা! আমি তো জানি অযোধ্যায় রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে কোনোরূপ অন্যায় প্রশ্রয় পায় না। ব্রাহ্মণটি গলা উঁচিয়ে বলল, ভুল জানেন আপনি। আপনার রাজ্যে বৈদিক নিয়মকানুন মানা হয় না। এই কারণেই তো শূদ্র বেদ-পুরাণ চর্চা করে। হু হু করে কেঁদে উঠল ব্রাহ্মণ। কাঁধের চাদর দিয়ে দু'চোখ মুছে শ্লেষের সঙ্গে বলল, শূদ্র শম্বুকের স্বর্গে যাওয়ার বাসনা হয়েছে, কঠোর তপস্যায় রত হয়েছে সে। শূদ্রের এই অনাধিকার চর্চার জন্য আমার পুত্রের অকাল মৃত্যু হয়েছে—বলে আকুল হয়ে রোদন করতে লাগল ব্রাহ্মণ।'

একলব্য বলল, 'কী-না-কী অসুখে ব্রাহ্মণপুত্রের মৃত্যু হলো, দোষটা চাপিয়ে দিল শম্বুকের ওপর। রামচন্দ্র বিশ্বাস করলেন ব্রাহ্মণের কথা ?'

অনোমদর্শী বললেন, 'বিশ্বাস করলেন মানে! ক্ষত্রিয় রাজা ব্রাহ্মণপ্রজার কথা বিশ্বাস করবেন না তো কার কথা বিশ্বাস করবেন ?'

তারপর একটু থেমে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অনোমদর্শী বললেন, 'দ্বাপর যুগে শূদ্রের তপস্যা! এ তো ঘোর অন্যায়। সেই অন্যায় প্রতিহত করার জন্য খড়্গহাতে বের হলেন রামচন্দ্র।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুঁজে বের করলেন তপস্যারত শম্বুককে। খড়্গের এককোপে মুণ্ডপাত করলেন শম্বুকের।' বলে হঠাৎ হা হা করে হাসতে শুরু করলেন অনোমদর্শী। হাসতে হাসতে তার চোখে জল এসে গেল। কণ্ঠ অনেকটাই বুজে এল তাঁর। ভেজা কণ্ঠে বললেন, 'শম্বুককে হত্যার পর নাকি ব্রাহ্মণ সন্তানটি বেঁচে উঠেছিল।'

চারদিক নিস্তব্ধ। দূরে কোথাও শিয়াল ডেকে উঠছে। কাছের দূরের ঝোপে দলবেঁধে জোনাকিরা আলো ছড়াচ্ছে। অনেকক্ষণ পর হিরণ্যধনু কথা বলে উঠলেন, 'এই-ই হলো আর্য সমাজব্যবস্থা। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় ছাড়া অন্য কাউকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে দেবে না তারা।'

'পায়ের তলায় পিষে মারবে। এইজন্য গুরুদক্ষিণার দোহাই দিয়ে তোমাকে পঙ্গু করে দিলেন দ্রোণাচার্য। বিচক্ষণ তিনি। তাই তোমার এমন প্রত্যঙ্গ চেয়ে বসলেন, যা হারালে তীরই নিক্ষেপ করতে পারবে না আর।' অনোমদর্শী বললেন।

একলব্য বলল, 'তাঁকে উত্তেজিত করেছে ওই অর্জুন। বুড়ো আঙুল কেড়ে নেওয়ার শতভাগ দোষের মধ্যে আশিভাগের জন্য দায়ী ওই পাণ্ডুপুত্র।'

হিরণ্যধনু বললেন, 'তুমি যথার্থ বলেছ পুত্র। লোকমুখে যতটুকু শুনেছি, তাতে আমার মনে হয়েছে, এই নৃশংস কাজে অর্জুনই প্ররোচিত করেছে দ্রোণকে।'

'হ্যাঁ বাবা, আমারও তা-ই বিশ্বাস।' একলব্য বলল।

অনোমদর্শী গুরুগম্ভীর গলায় বলে উঠলেন, 'এই ভারতবর্ষকে বহিরাগত আর্যরা গিলে খেয়েছে। স্বার্থ অটুট রাখার জন্য ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয় একত্রিত হয়েছে। রামের যুগে যেমন, এই সময়েও শূদ্রদের সকল অধিকার হরণ করতে চায় ওরা। তাই তো তোমার এই লাঞ্ছনা, এই পীড়ন।'

'আমরা ওদের সঙ্গে পারব না বাবা। পদে পদে বঞ্চিত করবে ওরা আমাদের। ওরা আমাদের দাঁড়াতে দেবে না, বড় হতে দেবে না।' গম্ভীর হয়ে কী যেন ভাবলেন হিরণ্যধনু। তারপর বিষণ্ন কণ্ঠে আবার বললেন, 'বাবা একলব্য, তোমার কি প্রথম দিনের কথা মনে পড়ে ? এজন্যই দ্রোণাচার্যের কাছে আসতে নিষেধ করেছিলাম আমি। তুমি আমাকে ভুল বুঝেছিলে, তোমার উন্নতির পথের অন্তরায় বলে আমাকে দোষারোপ করেছিলে।'

পিতার কথা শুনে মাথা নিচু করল একলব্য।

এইসময় অনোমদর্শী দ্রুত বলে উঠল, 'থাক থাক হিরণ্য, পুরনো কথা থাক।'

তারপর নাতির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যা হয়েছে হয়েছে। অতীত অতীতই। তোমার ভবিষ্যৎ গড়তে হবে। তুমি বাড়ি চলো একলব্য। কাল ভোরে আমরা যাত্রা করব। তোমার বিশ্রামের ভীষণ প্রয়োজন।'

চকিতে দাদুর দিকে তাকাল একলব্য। তার পর দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'আমি তো ফিরে যাব না দাদু।'

'কেন ?' পিতা কিছু বলার আগে বিস্মিত কণ্ঠে দ্রুত জিজ্ঞেস করলেন হিরণ্যধনু।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ওই যে দাদু বলেছেন—আমার ভবিষ্যতটা গড়তে হবে। এই অরণ্যে থেকে, কঠোর সাধনা করে আমি পূর্বের একলব্য হয়ে উঠতে চাই।'

'পূর্বের একলব্য মানে ?'

'হ্যাঁ বাবা, ভালোভাবে শিখে ফেলেছিলাম আমি তীর চালানোটা। যা অর্জুনরা জানে না, এমনকি দ্রোণও জানেন না, সেরকম শরসন্ধান করতে জানতাম আমি। বুড়ো আঙুল আমাকে পিছিয়ে দিয়েছে অনেক। অবিরত চেষ্টায় আবার অনেক দূর এগিয়ে এসেছি আমি। তারপরও বাকি রয়ে গেছে অনেক কিছু। তার জন্য আরও সময়ের প্রয়োজন, সাধনার প্রয়োজন।'

'থাক তোমার সময়। তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে এই আমার শেষ কথা।' বললেন হিরণ্যধনু।

'বিদ্যার্জন অসমাপ্ত রেখে ফিরে যাব বাবা! ধনুর্ধর হয়ে গোটা আর্যাবর্তকে তাক লাগিয়ে দেব না! আচার্যকে দেখিয়ে দিতে হবে না—তাঁর আশীর্বাদ ছাড়াও শূদ্ররা দাঁড়াতে পারে। আমি যদি দক্ষ তীরন্দাজ হয়ে না উঠি, তাহলে অর্জুনের ওপর প্রতিশোধ নেব কী করে বাবা ?'

অনোমদর্শী বললেন, 'থাক হিরণ্যধনু, থাক! একলব্যকে আর জোরাজুরি কোরো না। ওকে ওর মতো করে দাঁড়াতে দাও।'

হিরণ্যধনুর দিকে তাকিয়ে একলব্য বলল, 'হ্যাঁ বাবা, এই জগতসংসারকে আমি দেখিয়ে যেতে চাই—একলব্য নামে একদা এক নিষাদপুত্র ছিল। যে হেলায় জাতপাতের দুর্লঙ্ঘ্য দেয়াল ডিঙিয়ে, উচ্চবর্ণের অবহেলা-অপমানকে পাত্তা না দিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছিল।'

বলা শেষ করে বাবা এবং দাদুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল একলব্য।

হিরণ্যধনু বলল, 'তোমার জন্য অপেক্ষা করে থাকব পুত্র।'

একলব্যকে রেখে পরদিন সকালে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করলেন হিরণ্যধনুরা।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী।

অনেকগুলো বছর কেটে গেল।

বনমধ্যে নির্জনে একাগ্রমনে শরসাধনা করে গেল একলব্য। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ চলে যাওয়ার পর একলব্য বোঝার চেষ্টা করেছে কতটুকু ক্ষতি হয়েছে তার। অবশিষ্ট আঙুলগুলো দিয়ে কতদূর এবং কত শিগগির বাণমোচন করা যায়, তার সাধনা করে গেছে সে। আঙুল হারানোয় তার বাণের গতি কমে গিয়েছিল। কিন্তু মনের জোরে আর কঠোর অধ্যবসায়ে একলব্য ধীরে ধীরে পূর্বের দক্ষতা অর্জন করল। একনিষ্ঠ অভ্যাসে চার আঙুল ব্যবহার করেই বাণমোক্ষের নিজস্ব উপায় উদ্ভাবন করল একলব্য। একদিন সে পরিপক্ব সমর্থ ধনুর্বিদে পরিণত হলো।

মাথা উঁচু করে একলব্য ফিরে এল নিষাদরাজ্যে। বিপুল সম্ভারে সম্ভাষিত হলো সে রাজধানীতে।

কালক্রমে অনোমদর্শী পরলোকে গেলেন। হিরণ্যধনু আর বিশাখাকে বার্ধক্য ঘিরে ধরল। গোশৃঙ্গরাজ্যের রাজকন্যাকে পুত্রবধূ করে আনলেন তাঁরা। তারপর এক শুভদিনে একলব্যকে রাজা হিসেবে ঘোষণা দিলেন হিরণ্যধনু। পুত্র একলব্য রাজসিংহাসনে বসলে সস্ত্রীক ধর্মকর্মে মনোনিবেশ করলেন তিনি। সুশাসক হিসেবে, সুদক্ষ যোদ্ধা হিসেবে একলব্যের নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

মথুরার কৃষ্ণ তখন প্রবল প্রতাপশালী। উত্তর-পশ্চিম ভারতে নিজের রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারে তিনি মনোযোগী। কিন্তু কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠাপথের প্রধান অন্তরায় মগধরাজ জরাসন্ধ। জরাসন্ধের মিত্রগোষ্ঠী তার সহযোগী। কৃষ্ণের উত্থান তারা মেনে নিতে নারাজ। জরাসন্ধের মিত্রদের অন্যতম একলব্য। স্বাভাবিকভাবে একলব্য কৃষ্ণের প্রতিপক্ষ।

জরাসন্ধের জামাতা কংসকে কৃষ্ণ কৌশলে হত্যা করলেন। জরাসন্ধ ক্ষেপে গেল। কৃষ্ণকে শেষ করে দেওয়ার পরিকল্পনা করল জরাসন্ধ ও তার মিত্রগোষ্ঠী। এই মিত্রগোষ্ঠীর মধ্যে ছিল চেদিরাজ শিশুপাল, সৌভপতি শাল্ব, পুণ্ড্রবর্ধনের অধিপতি পরাক্রান্ত পৌণ্ড্রক বাসুদেব, প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজা নরকাসুর এবং নিষাদরাজ্যাধিপতি একলব্য।

জরাসন্ধের ভয়ে কৃষ্ণ পালিয়ে বেড়াতে লাগলেন। মথুরা থেকে রাজধানী দ্বারকায় স্থানান্তরিত করলেন। এইসব ডামাডোলের মধ্যে তিনি পাণ্ডব-কৌরবের জ্ঞাতিবিরোধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লেন। এবং শক্ত সমর্থ একটা রাজনৈতিক শক্তি তৈরি করতে সমর্থ হলেন।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তীক্ষ্ণ কূটকৌশলের আশ্রয়ে জরাসন্ধকে হত্যা করান কৃষ্ণ। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে জরাসন্ধমিত্র শিশুপালকে খুন করেন কৃষ্ণ। এই হত্যাগুলোর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য পৌণ্ড্রক বাসুদেব কৃষ্ণকে আক্রমণ করে। এই আক্রমণে সসৈন্যে অংশ নেয় একলব্য। ইত্যবসরে সৌভপতি শাল্বের সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে শাল্ব মারা যায়।

ওদিকে এদের হত্যার প্রতিশোধ নিতে পৌণ্ড্রক বাসুদেব রাতের অন্ধকারে দ্বারকা আক্রমণ করে বসে। এই যুদ্ধে কৃষ্ণের সঙ্গে একলব্যের মুখোমুখি দেখা। একলব্য তখন মহাকাল অন্তক যমের মতো ভয়ংকর। ভীষণদর্শন এক ধনুক হাতে যুদ্ধ শুরু করল একলব্য। এক এক বারে শতাধিক বাণে যাদবসৈন্য মানে কৃষ্ণের সৈন্য নিধন করতে থাকল সে। যাদবদের মধ্যে সেদিন এমন যোদ্ধা ছিল না, যে নিষাদ একলব্যের বাণবর্ষণে আহত হয় নি।

কৃষ্ণ এই যুদ্ধেই বুঝে গিয়েছিলেন—নিরঙ্কুশ অবস্থাতেও একলব্য কত ভয়ংকর। পঁচিশ-ত্রিশটি তীর এক-একজনের ওপর নিক্ষেপ করে যাচ্ছিল সে। তার শরাঘাত থেকে কৃষ্ণও মুক্ত থাকেন নি।

সেই রাত্রির যুদ্ধে কৃষ্ণসৈন্যরা দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। অবিরাম বাণবর্ষণে একলব্য যাদবদেরকে রণক্ষেত্র থেকে ঝেঁটিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। যাদবসৈন্যদের এই বিধ্বস্ত অসহায় অবস্থা দেখে একলব্য বেশ গর্ববোধ করেছিল। কৃষ্ণপক্ষের বড় বড় যোদ্ধাদের নিজের নাম শুনিয়ে উচ্চস্বরে বলেছিল, 'ওরে পলায়মান শিয়ালের দল, শুনে রাখ আমার নাম। আমি একলব্য, মহাবীর একলব্য আমার নাম। তোদের ওই যে কৃষ্ণবন্ধু অর্জুন, নিজেকে খুব শক্তিমান ভাবে। আরে, ও কীসের বীর! ও তো একটা ধুরন্ধর ধাপ্পাবাজ। আজকে পেলে হতো তাকে। যমালয়ে পাঠাতাম। তাকে বলে দিয়ো—আমার হাত থেকে বাঁচোয়া নেই তার। যতই দ্রোণাচার্যের পদলেহন করুক না কেন, একদিন না একদিন আমার হাতে মৃত্যু হবে তার।'

তারপর কৃষ্ণের দাদা বলরামের ওপর চোখ পড়ল একলব্যের। গলায় তীব্র শ্লেষ ছড়িয়ে বলল, 'আরে হলধর বলরাম, অন্ধকারের দিকে কোথায় যাচ্ছ তুমি ? মুখ লুকাতে যাচ্ছ বুঝি ? তুমি না মস্তবড় বীর ? অহংকারে তো মাটিতে পা পড়ে না তোমার। এখন কাঁধে হাল নিয়ে ওদিকে কোথায় পালাচ্ছ তুমি ?'

একলব্যের সিংহনাদে ঘুরে দাঁড়ালেন বলরাম। দুজনের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হলো। একলব্য ক্ষিপ্রহাতে প্রথমে দশটা নারাচ তীর নিক্ষেপ করল। তার বাণাঘাতে বলরাম দিশেহারা হয়ে পড়লেন। বলরাম সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধ করে একলব্যের রথের ধ্বজাটুকু কাটতে সমর্থ হলেন মাত্র।

যুদ্ধ চলতে থাকল। এবার একলব্য এমন একটা ধনুক হাতে নিল, যার ছিলাটি অত্যন্ত সুদৃঢ় এবং লম্বায় সাড়ে চার হাত। বলরাম বুঝলেন—সংকটকাল উপস্থিত। এই ধনুক থেকে ক্ষিপ্রবাণগুলো নিঃসৃত হতে থাকলে ধড়ে আর মুণ্ড থাকবে না। তাই আগেভাগেই একলব্যের ধনুকটা কেটে ফেললেন তিনি। মুঠো করে ধরতে হয় যে জায়গায়, ঠিক ওখানটায় কেটে ফেললেন বলরাম।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা সময়ে বলরামের হলাঘাতে মাটিতে বসে পড়ল একলব্য। সে মাটিতে পড়ে গেলে বলরাম তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু নিমিষেই সেখানে উপস্থিত হলো শত শত নিষাদসৈন্য। সৈন্যরা বলরামকে ছেঁকে ধরল। এদিকে একলব্য উঠে দাঁড়াল। গদাহস্তে দ্রুত এগিয়ে গেল বলরামের দিকে। গদাযুদ্ধে অতিকৌশলী বলরাম একলব্যকে এতটুকু টলাতে পারলেন না। তুমুল গদাশব্দের অভিঘাতে চতুর্দিকের সৈন্যরা আতঙ্কিত হয়ে উঠল। সে শব্দ সমুদ্রের তরঙ্গের অভিঘাতের মতো, সে শব্দ প্রলয়ংকরী অন্তিমকালের মতো।

ঠিক এইসময় চিৎকার শোনা গেল—কৃষ্ণের হাতে পৌণ্ড্রক বাসুদেব নিহত হয়েছে। এই ঘোষণায় বাসুদেবের সৈন্যদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হলো। ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যেদিকে পারল পালাতে লাগল সৈন্যরা। একলব্য গদাযুদ্ধ থামিয়ে নিজ সৈন্যদলে মিশে গেল। অক্ষত অবস্থায় নিজরাজ্যে ফিরে এল সে। পালিয়ে আসার গ্লানিটা একলব্যের মধ্যে গুমরে মরতে লাগল।

ওইদিন দ্রোণের হাতে অপমানিত হয়ে, অর্ধেক রাজ্য হারিয়ে দ্রুপদ ফিরে এসেছিলেন। তাঁর মধ্যে মরণান্তক প্রতিশোধস্পৃহা। দ্রোণ-হত্যার প্রতিজ্ঞা করলেন তিনি। একমাত্র দ্রোণ হত্যার মধ্যদিয়েই দ্রুপদের বুকের জ্বালা মিটতে পারে। কিন্তু তিনি তো ক্ষীণশক্তি। দ্বিখণ্ডিত তাঁর রাজ্য। এইসময় একা অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া সম্ভব নয়। শুধু একজন পুত্রের মাধ্যমে তার প্রতিশোধবাসনা চরিতার্থ হতে পারে। একদিন সেই আকাঙ্ক্ষিত পুত্রের আবির্ভাব হলো। তিনি সেই পুত্রের নাম রাখলেন—ধৃষ্টদ্যুম্ন। ধৃষ্টদ্যুম্নের সঙ্গে জন্মাল দ্রৌপদী। ধৃষ্টদ্যুম্ন তার আবির্ভাবের কাল হতে দ্রোণহন্তা বলে চিহ্নিত হলো, অন্যদিকে কৌরবকুলের ত্রাস হিসেবে চিহ্নিত হলো দ্রৌপদী। দ্রোণ এবং দ্রোণের আশ্রয়দাতা কৌরবদের সকলেই পাঞ্চাল রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন। দ্রোণের কারণে নিজের এবং কৌরবদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠল।

কালক্রমে পাণ্ডব আর কৌরবদের মধ্যে জ্ঞাতিবিরোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। একদিকে পঞ্চপাণ্ডব অন্যদিকে ধৃতরাষ্ট্র-দুর্যোধনাদি। বিরোধ বাঁধল ধৃতরাষ্ট্র-পরবর্তী রাজা নিয়ে, শত্রুতা প্রবল আকার নিতে থাকল সুচ্যগ্র মেদিনী নিয়ে। জ্ঞাতিশত্রুতা কুণ্ডলি পাকিয়ে উঠল। দুর্যোধনরা পাণ্ডবদের বারণাবতে পুড়িয়ে মারতে চাইল। সুড়ঙ্গপথে পালিয়ে গিয়ে প্রাণে বাঁচল যুধিষ্ঠির-ভীম-অর্জুনরা।

কুরুকুলের জ্ঞাতিশত্রুতার সংবাদ দ্রুপদ রাখেন। এই শত্রুতার সুযোগ নিতে চাইলেন তিনি। সেই বংশের মুখ্যতম ধানুষ্ক অর্জুনের সঙ্গে নিজকন্যা দ্রৌপদীর বিয়ে দিতে মনস্থ করলেন দ্রুপদ। যে অর্জুনকে দিয়ে দ্রোণাচার্য দ্রুপদের চরম অপমান করেছেন, দ্রোণের সেই প্রিয়তম শিষ্যকে জামাই করে নিজের দলে টানতে চাইলেন তিনি। কৃতকার্যও হলেন শেষ পর্যন্ত। লক্ষ্যভেদ করে দ্রৌপদীকে জিতে নিল অর্জুন। মা কুন্তীর কারণে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব—এই পঞ্চপাণ্ডবদের স্ত্রী হয়ে গেল।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিবাহ-সংবাদে সবচাইতে বেশি ভাবিত হলেন দ্রোণাচার্য। দ্রোণের যশোভাবনা, অহংকার—সবকিছু যেন লণ্ডভণ্ড হতে চলল। পুত্রাধিক প্রিয়তম শিষ্য দ্রুপদের দলে মিশে গেল!

দ্রুপদ যেমন দ্রোণের খবর রাখতেন, দ্রোণও দ্রুপদের সংবাদ রাখতেন। তাঁর নিধনের জন্য যে দ্রুপদ পুত্র কামনা করেছেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন আর দ্রৌপদী নামে যে তাঁর দুটো সন্তান লাভ হয়েছে—এ সংবাদ দ্রোণের অগোচরে থাকে নি। ঠান্ডা মাথায় তিনি ভাবলেন। কিছুতেই অর্জুনকে হাতছাড়া করা যাবে না। তাই পাণ্ডবদের বিবাহ সংবাদ যখন কৌরবসভায় পৌঁছাল, তখন দ্রুপদ-বিরোধিতা মিটিয়ে ফেলতে তৎপর হলেন দ্রোণাচার্য।

কৌরব রাজসভায় ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রকে পাণ্ডবদের রাজ্যভাগ ফিরিয়ে দিতে উপদেশ দিলেন। দ্রোণাচার্যও চুপ থাকলেন না। বললেন, 'মহাত্মা ভীষ্মের সঙ্গে আমিও একমত। পাণ্ডবদের সঙ্গে শত্রুতার আর দরকার নেই। উপরন্তু আমি আরও বলতে চাই, ওদের শুভেচ্ছা জানিয়ে দ্রুপদ-রাজসভায় এখনই একজন দূত পাঠান। দূত গিয়ে যেন বলে—এই বিয়েতে আপনি অত্যন্ত খুশি হয়েছেন। আপনি তাদের সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করছেন। এই বিবাহ সম্বন্ধে পাঞ্চাল আর কৌরবদের মধ্যে একটা গভীর প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে—এইসব কথা দ্রুপদকে বলতে যেন ভুল না করে আপনার দূত।'

ধৃতরাষ্ট্র দ্রোণের কথায় খুব কর্ণপাত করলেন বলে মনে হলো না। তিনি উদাসীন থাকলেন।

কর্ণ বলে উঠল, 'কী গুরুদেব, ভয় পেয়েছেন বলে মনে হচ্ছে ? চিরশত্রুকে শুভসন্দেশ পাঠানোর পরামর্শ দিচ্ছেন মহারাজকে! রাতারাতি বোল পাল্টে গেল আপনার!'

দ্রোণাচার্য কিছু বলবার আগে বিদুর বলে উঠলেন, 'তুমি সংযতবাক হও কর্ণ। মাননীয়কে সম্মান দিতে শেখো।'

এরই মধ্যে কুরুমুখ্যদের মন্ত্রণাসভায় বেশ পরিবর্তন হয়ে গেছে। ধৃতরাষ্ট্রের পাশের আসনে জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্যোধন বসা শুরু করেছে, যথামর্যাদার আসনে বসে কর্ণ। ভীষ্ম, বিদুর, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য—এঁদের পরামর্শ আর আগের মতো মর্যাদা পায় না মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। আজকাল দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ আর শকুনিকে মাত্রাতিরিক্ত প্রশ্রয় দেন তিনি। তাতে সভামুখ্যরা সংকুচিত হয়ে থাকেন।

কর্ণ সহর্ষে বলল, 'আপনি থামুন খুল্লতাত। আচার্যের মতো ক্রূর মানুষরা মহারাজকে কুপরামর্শ দিয়ে বিভ্রান্ত করছেন, আর মর্যাদার দোহাই দিয়ে আপনি আমাকে চুপ থাকতে বলছেন! যে পরামর্শ দিলেন আপনি, তা যদি মহারাজ পালন করেন তাহলে কুরুবংশের মর্যাদা ধুলায় মিশে যাবে। কোথায় প্রবল প্রতাপী মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আর কোথায় খণ্ডিত রাজ্যের ক্ষুদ্র রাজা দ্রুপদ। দ্রুপদকে রাজা বলতেই আমার সংকোচবোধ হচ্ছে।'

একটু দম নিয়ে কর্ণ আবার বলল, 'আমার মিত্র দুর্যোধনের কপাল ভাঙার পরামর্শ দিচ্ছেন আপনি। পাণ্ডবদের সম্ভাষণ জানিয়ে ঘরে আনুন, তাদের অর্ধেক বা গোটা সাম্রাজ্য ছেড়ে দিন—এই তো আপনার পরামর্শ গুরুদেব ?' শ্লেষ মেশানো কণ্ঠে কথা শেষ করল কর্ণ।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্ণের রাগের কারণ দ্রোণের অজানা নয়। তাঁর কাছ থেকে ব্রহ্মাস্ত্র না পাওয়ার ক্ষোভ কর্ণের মধ্যে। তাই বলে রাজসভায় দাঁড়িয়ে অপমান করা! দ্রোণের মর্যাদা এই রাজসভায়, এই হস্তিনাপুরে কি কম ? দ্রুপদের সঙ্গে তো তাঁর ব্যক্তিগত শত্রুতা। তারপরও হস্তিনাপুরের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে সৎপরামর্শ দিয়েছেন।

কর্ণের কটু কথার প্রত্যুত্তরে দ্রোণ বললেন, 'ওরে দুষ্টমতী কর্ণ, তোর অসৎ চিন্তার কথা কে না জানে ? পাণ্ডবদের ওপর তোর চিরকালের রাগ। তাই আমার সৎপরামর্শের বিরোধিতা করছিস তুই।'

তারপর সভার উদ্দেশে বললেন, 'আমার কথা না শুনলে কুরুবংশের সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

এবার দুর্যোধন আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সরোষে বলল, 'আপনি থামুন গুরুদেব। সর্বনাশ হয়ে যাবে—আপনি ত্রিকালজ্ঞ ঋষি নাকি ? ভবিষ্যৎ দেখতে পান আপনি ?'

ধৃতরাষ্ট্র যথাপূর্বং মৌন রইলেন। বাকবিতণ্ডার সবকিছু শোনার পরও নির্বাক রইলেন তিনি। বিদুর দেখলেন, বড় অপমান হয়ে যাচ্ছে দ্রোণাচার্যের। কণ্ঠকে একটু উঁচুতে নিয়ে গিয়ে তিনি বললেন, 'পিতামহ ভীষ্ম, গুরু দ্রোণ, কৃপাচার্য—এঁদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা ফেলে দেওয়ার মতো নয়। কুরুপ্রাসাদে দ্রোণাচার্যের অবস্থিতি পরম মর্যাদার আসনে। পিতামহ ভীষ্মের মতো দ্রোণাচার্যও কখনো কুরুদের অমঙ্গলকর কথা বলেন নি। কোনোদিন রাজপ্রাসাদের অপকারও করেন নি। দুর্যোধন, কর্ণ—তোমরা আচার্যের প্রতি কটূক্তি কোরো না।'

তিনি আরও বললেন, 'কৃষ্ণ এসে পাণ্ডবদের সঙ্গে মিশেছে। ভীম পরাক্রমশালী গদাযোদ্ধা, অর্জুন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ধনুর্ধর, যুধিষ্ঠির ধীরস্থির, উত্তম পরামর্শক। তাদের সঙ্গে যদি দ্রুপদের রাজশক্তি যুক্ত হয়, সেই সম্মিলিত শক্তির প্রাবল্য সম্পর্কে এখনই ভাবা উচিত। এই সুযোগে পরম শত্রু দ্রুপদকে যদি কাছে টানা যায়, তাহলে জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষে রাজ্যশাসন সহজতর হবে। আরও বলছি—যে দ্রুপদের জামাই পঞ্চপাণ্ডব, যার পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, তাঁকে ক্ষুদ্র শক্তিধর মনে করবেন না মহারাজ। এটাও ভুলবেন না যে, কৃষ্ণ দ্রুপদের মিত্র।'

বিদুরের কথায় কাজ হলো। কর্ণ-দুর্যোধনের পরামর্শ উপেক্ষা করলেন ধৃতরাষ্ট্র। দ্রুপদকে প্রীতি সম্ভাষণ জানাবার জন্য বিদুরকেই তিনি পাঞ্চালে পাঠালেন। কুন্তী আর দ্রৌপদীর সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডবকে ফিরিয়েও আনলেন রাজধানীতে।

পাণ্ডবরা হস্তিনাপুরে এলে মন্ত্রী-অমাত্যদের চাপে ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যভাগ করে দিলেন ভ্রাতুষ্পুত্রদের। নির্গুণ ভূমিগুলোই পাণ্ডবদের ভাগে পড়ল। পাণ্ডবরা ময়দানব দিয়ে রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ নির্মাণ করাল। রাজা যুধিষ্ঠিরের মানমর্যাদা ভারতবর্ষের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। যুধিষ্ঠিরের মর্যাদা ও ধনসম্পদ যত বাড়ল, দুর্যোধনের ঈর্ষা বাড়ল ততোধিক। দুর্যোধনের অসূয়া দ্বারা ধৃতরাষ্ট্র সংক্রামিত হলেন। রাজসভায় বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ মন্ত্রীদের প্রভাব কমে গেল। স্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের প্রত্যেকটি কথায় সায় দিতে লাগলেন।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরই ফলে পাশাখেলার আসর বসল। সবকিছু হারানোর পর যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে বাজি ধরল। শকুনির চালে দ্রৌপদীকেও পাশায় হারাল যুধিষ্ঠির। রাজসভায় সবার সামনে কৃষ্ণা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের মতো অসভ্যতাও সংঘটিত হলো।

দ্বিতীয়বারের পাশাখেলায় বাজি ছিল—হারলে বারো বছরের বনবাসে এবং এক বছরের অজ্ঞাতবাসে যেতে হবে পাণ্ডবদের। যথারীতি হারল যুধিষ্ঠির। বনবাসে যেতেই হলো পাণ্ডবদের। যাওয়ার আগে পাণ্ডবরা প্রতিজ্ঞা করল—কুরুবংশ ধ্বংস করবে তারা। কর্ণ ও শকুনিও এই প্রতিজ্ঞার বাইরে থাকল না।

পাণ্ডবদের বনবাসের সময় অতিক্রান্ত হলো। শেষ হলো অজ্ঞাতবাসের বছরটিও। তারা তাদের রাজধানীতে ফিরে এল।

AMARBOI.COM


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেনাপতিস্ত্বহং রাজন্ সময়েনাপরেণ তে।
আমাকে সেনাপতি করলে একটা শর্ত তোমায় মেনে নিতে হবে।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠল।

দিকে দিকে আহ্বান গেল। দুর্যোধন নানা দেশে গুরুত্বপূর্ণ অমাত্য আর দূতদের পাঠাল। দ্রুপদ আর পঞ্চপাণ্ডবরাও পিছিয়ে থাকলেন না। তাঁরাও নানা দেশে তাদের পক্ষে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যোগদানের জন্য সন্দেশ পাঠালেন। উভয়পক্ষের আহ্বানে ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলের রাজারা সসৈন্যে যুদ্ধে যোগদান করতে লাগলেন। কুরুদের পক্ষে যুদ্ধ করতে এলেন সিন্ধুসৌবীর, গান্ধার, ত্রিগর্ত, কেকয়, মদ্র, কম্বোজ, মাহিষ্মতী, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, কোশল, অম্বষ্ঠ, বাহ্লিক, ক্ষুদ্রক, বিদর্ভ, অবন্তী, বিদেহ, বৎস্য, কলিঙ্গ, অঙ্গ, পূর্ব মগধ, পুণ্ড্র-বঙ্গ, অহিচ্ছত্র, ভোজ, কুকুরদেশ, শূরসেন এবং অন্ধক দেশের নৃপতিরা। পাণ্ডবদের ডাকে খুব বেশি কেউ সাড়া দিলেন না। মাত্র ছয়টি দেশের নৃপতি পাণ্ডবদের পক্ষে যোগদান করলেন। তাঁরা হলেন পাঞ্চাল, মৎস্য, চেদি, করুষ, কাশী আর পশ্চিম মগধের অধিপতি। এ ছাড়া কৌরবদের পক্ষে যুদ্ধ করতে এল মারণান্তক নারায়ণী সেনা। বিভিন্ন নিষাদগোষ্ঠীও দুভাগে বিভক্ত হয়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যোগদান করল।

উভয়পক্ষ থেকে আহ্বান পাওয়ার পরও একলব্য এল না। সে দ্বিধান্বিত। কোন দলে যোগদান করবে ভেবে ঠিক করতে পারছে না একলব্য। তার জীবনশত্রু দুজন—দ্রোণাচার্য আর অর্জুন। দুজন দুই শিবিরের যোদ্ধা। কার পক্ষে আর কার বিপক্ষে যুদ্ধ করবে সে ? দ্রোণাচার্য তার জীবনের সকল স্বপ্ন সাধ কেড়ে নিয়েছেন। সারা জীবনের জন্য পঙ্গু করে দিতে চেয়েছিলেন তিনি তাকে। আর অর্জুন ? তাকে বিকলাঙ্গ করার জন্য দ্রোণকে প্ররোচিত করেছে সে। মূলত স্বার্থান্ধ অর্জুনের কুপরামর্শেই দ্রোণাচার্য তার অঙ্গচ্যুতি ঘটিয়েছেন। কে বড় অপরাধী ? নির্ধারণ করতে পারছে না একলব্য।

এক বিকেলে পিতা হিরণ্যধনুর সঙ্গে দেখা করে একলব্য। মনের দ্বিধার কথা পিতাকে খুলে বলে। পিতার কাছে সে সিদ্ধান্ত চায়।

হিরণ্যধনু বলেন, 'হীন জাতের বলে দ্রোণ তোমাকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করেন নি।'

'যথার্থ বলেছেন বাবা।'

'তুমি বনে এসে তাঁরই মূর্তি গড়ে শরসাধনা করেছ এবং সার্থক হয়েছ।'

'সার্থকতা অর্জন করেছি কি না জানি না, তবে বেশ কিছু দূর এগিয়েছিলাম।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সে তোমার সৌজন্যবোধ। তুমি ঈর্ষণীয় ধনুর্ধর হয়ে না উঠলে অর্জুন সন্ত্রস্ত হতো না। এবং দ্রোণাচার্যকে হস্তিনাপুর থেকে ডেকে এনে তোমার মুখোমুখি দাঁড় করাত না। শুধু দাঁড় করিয়েই ছাড়ে নি অর্জুন, আমার বিশ্বাস, তোমা পর্যন্ত পৌঁছানোর আগে নানারকম মন্তব্য করে চরমভাবে উত্তেজিত করেছে দ্রোণাচার্যকে। তারই ফলশ্রুতি—তোমার বুড়ো আঙুল কর্তন। কাকে তুমি সবচেয়ে বেশি দায়ী কোরো ?'

'পিতা, বুঝে উঠতে পারছি না। তাই আপনার কাছে এসেছি।' একলব্য বলল।

হিরণ্যধনু বললেন, 'একজন কাঠুরে কুড়াল দিয়ে গুঁড়ি কাটছে, গাছ যদি কাউকে দোষারোপ করতে চায়, কাকে বেশি দোষারোপ করবে, কুড়ালকে না কাঠুরেকে ?'

একলব্য বলে উঠল, 'অবশ্যই কাঠুরেকে। কুড়াল তো নিমিত্ত মাত্র।'

'তোমার আঙুল কর্তনের ক্ষেত্রে দ্রোণাচার্য কুড়াল ছাড়া আর কিছুই নন, তিনি নিমিত্ত মাত্র। কলকাঠি নেড়েছে তো অর্জুন।'

'আমি বুঝে গেছি বাবা।' বলে পিতাকে প্রণাম করে নিজ কক্ষে ফিরে এল একলব্য।

পরদিন কর্ণের একটি পত্র নিয়ে একজন দূত এল একলব্যের রাজসভায়। কর্ণ লিখেছে—

> একলব্য, আমার আশীর্বাদ জেনো। আমাকে তোমার মনে থাকার কথা। মিত্র দুর্যোধন তোমার কাছে কিছুদিন আগে একজন দূত পাঠিয়েছিল। তুমি সাড়া দাও নি। তুমি তো জানো, পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে নেমেছে কুরুরা। অধিকারের যুদ্ধ এটি। দুর্যোধনের রাজা হওয়াকে অস্বীকার করছে পাণ্ডবরা। রাজার ছেলেই তো রাজা হবে, যেমন তুমি হয়েছ। হস্তিনাপুরের মহারাজা ধৃতরাষ্ট্র, তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্যোধন। ধৃতরাষ্ট্রের পরে রাজা হওয়ার সর্বাধিকার মিত্র দুর্যোধনের। পাণ্ডবরা এতে বাধা দিচ্ছে। এইজন্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। অর্জুনের নির্মমতার কথা নিশ্চয়ই এখনো ভোলো নি তুমি। প্রতিশোধ নেওয়ার এটাই মোক্ষম সময় এবং সুযোগ। তাকে যুদ্ধে নিহত করে প্রমাণ কোরো—নিষাদরা অবহেলার নয়। আশা করি, আমার পত্রের মর্মার্থ বুঝতে পেরেছ। পত্রবাহককে তোমার মতামত জানাইও।
>
> ইতি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
>
> সূতপুত্র কর্ণ

কর্ণের চিঠি পেয়ে একলব্যের সকল সংশয় কেটে গেল। 'আমি আসছি' লিখে দূতের হাতে দিয়ে যুদ্ধপ্রস্তুতিতে লেগে গেল একলব্য।

কুরুক্ষেত্র বিশাল উষর ভূমি। গোটা ভূমিই সমতল। এর উত্তরে সরস্বতী আর দক্ষিণে দৃষদ্বতী নদী। এই দুই নদীর মধ্যবর্তী কুরুক্ষেত্র নামের সমতল ভূমির দুইদিকে কুরু শিবির আর পাণ্ডবশিবির স্থাপিত হলো। উভয় পক্ষের আঠারো অক্ষৌহিণী যোদ্ধা সমবেত হলো


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুরুক্ষেত্রে। দুই লক্ষ আঠারো হাজার সাত শ যোদ্ধা নিয়ে এক একটা অক্ষৌহিণী। চতুর্দিকে ধুন্ধুমার কাণ্ড।

যুদ্ধের সকল প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন। পাণ্ডবপক্ষের সেনাপতি নির্বাচিত হয়েছেন যুধিষ্ঠির। কুরুপক্ষের সেনাপতি কে হবেন, এ নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দিল। ভীষ্ম হবেন না দ্রোণ হবেন, না কর্ণ হবে—এ নিয়ে অনেক মতান্তর হলো। শেষ পর্যন্ত ধৃতরাষ্ট্র সিদ্ধান্ত দিলেন—পিতামহ ভীষ্মই প্রথমত সেনাপতি হওয়ার অধিকার রাখেন। কিন্তু ওঁর তো মতামতের প্রয়োজন।

দুর্যোধনকে ডেকে বললেন, 'পুত্র, তুমি পিতামহের কাছে যাও। সসম্মানে তাঁকে সেনাপতিত্ব গ্রহণ করার প্রস্তাব দাও। শোনো, যে-কোনো মূল্যে তাঁকে রাজি করাতে হবে। তাঁর সমকক্ষ যোদ্ধা ভূভারতে নেই। তিনি সেনাপতি হলে জয় আমাদের নিশ্চিত।'

দুর্যোধন ভীষ্মের কাছে উপস্থিত হলো। সঙ্গে অনুগামী রাজা মহারাজারা। দুর্যোধন জোড় হাতে বলল, 'পিতার আদেশে এবং নিজের শ্রদ্ধায় আপনার কাছে এসেছি পিতামহ।'

'কী প্রয়োজনে এসেছ এই বৃদ্ধের কাছে?' অর্ধনিমীলিত চোখে জিজ্ঞেস করলেন ভীষ্ম।

'আগে বলুন—ফেরাবেন না।'

'উদ্দেশ্য না জেনে কথা দিই কী করে?'

দুর্যোধন ভীষ্মের প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দিল না। সশ্রদ্ধায় বলল, 'পর্বতের মধ্যে যেমন সুমেরু, পক্ষীদের মধ্যে গরুড়, দেবতাদের মধ্যে যেমন কার্তিক, এই কুরুবংশে আপনি তেমনই। আপনি সর্বদা আমাদের মঙ্গল কামনা করেন।'

ভীষ্ম দুর্যোধনের এই প্রশংসাবাক্যের সারকথা বুঝতে পারেন। প্রাজ্ঞ তিনি। আসল কথা শুনবার জন্য তিনি চুপ করে থাকলেন।

দুর্যোধন মূল কথায় ফিরে আসে। বলে, 'এই পৃথিবীর কোনো যোদ্ধা সমরে আপনাকে হারাতে পারবে না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আপনি কুরুপক্ষের প্রধান সেনাপতি হবেন, এই কামনা আমার।'

'বয়স হয়ে গেছে আমার। যুদ্ধ করার স্পৃহা আর শক্তি আমার ফুরিয়ে গেছে।'

'ওরকম করে বলবেন না পিতামহ। তাহলে আমরা সরস্বতীর জলে ভেসে যাব।' বিগলিত হয়ে বলল দুর্যোধন।

'যুদ্ধের সময় কার্তিক দেবতাদের আগে আগে যান, আপনি তেমনি কুরুসৈন্যের সামনে সামনে যাবেন। আমাদের কাছে আপনি কার্তিকের চেয়েও অধিক।' আরও বলল দুর্যোধন।

দুর্যোধন যুবক হয়ে ওঠার পর থেকে কোনোদিন ভীষ্মকে মূল্যায়ন করে নি। আজ তাঁকে কার্তিক, গরুড়, সুমেরু পর্বতের সঙ্গে তুলনা করছে। কৌতুক বোধ করলেন পিতামহ। তবে তিনি অবাক হন না। তিনি জানেন, যুদ্ধ তাঁকে করতেই হবে এবং পাণ্ডবদের বিরুদ্ধেই অস্ত্র তুলে নিতে হবে হাতে।

দুর্যোধনকে প্রত্যাখ্যান করলেন না তিনি। তবে জানালেন—তিনি যুদ্ধ করবেন বটে, কিন্তু পাণ্ডবদের গায়ে হাত দেবেন না। নাতিদেরকে কখনো অস্ত্রাঘাত করবেন না। তবে এটা সত্যি যে, পাণ্ডবরা ছাড়া অন্য সবাইকে যমালয়ে পাঠাবেন তিনি।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরপর দুর্যোধনকে উদ্দেশ করে রাগতকণ্ঠে ভীষ্ম বললেন, 'একটা শর্ত আছে আমার।'

ত্রস্ত চোখে ভীষ্মের দিকে তাকাল দুর্যোধন। তার চোখ বলছে—কী শর্ত ?

'আমি সেনাপতি থাকাকালে কর্ণ যুদ্ধ করতে পারবে না। হয় তাকে আগে সেনাপতি কোরো, আমি যুদ্ধ করব না, না হয় আমি সৈন্য পরিচালনা করি, সে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকুক।'

কর্ণও দুর্যোধনের সঙ্গে ভীষ্মকে অনুরোধ করতে এসেছিল। ভীষ্মের কথা শুনে তার মাথা গরম হয়ে গেল। সরোষে বলল, 'মিত্র, তোমাদের পিতামহ এই ভীষ্ম বেঁচে থাকা অবস্থায় আমি মুহূর্তকালও যুদ্ধ করব না, এই আমার প্রতিজ্ঞা।'

দুর্যোধন নরমকণ্ঠে বলল, 'আহা মিত্র, উত্তেজিত হচ্ছ কেন ?'

কর্ণ দুর্যোধনের কথাকে কানে না তুলে উচ্চকণ্ঠে বলল, 'ভীষ্ম মারা যাওয়ার পর আমি হাতে অস্ত্র তুলে নেব। এবং প্রথমে অর্জুনকেই নিধন করব আমি।'

দুর্যোধন কর্ণকে সামলে স্থান ত্যাগ করল।

ভীষ্মের সেনাপতি পদে বরিত হওয়ার সংবাদ পাণ্ডবশিবিরে ত্বরিত পৌঁছে গেল। যুধিষ্ঠির সহোদর, কৃষ্ণ, দ্রুপদ, দ্রুপদেব অপর পুত্র শিখণ্ডী প্রমুখকে নিয়ে মন্ত্রণাসভায় বসল। ওই সময় শকুনির ছেলে উলূক সেখানে উপস্থিত হলো। শুধু পাণ্ডবদের গালাগাল দেওয়ার জন্যই দুর্যোধন উলূককে পাণ্ডবশিবিরে পাঠিয়েছিল। পাণ্ডবদের যথেষ্ট কটূকাটব্য করল উলূক। সেখানেই অর্জুন বলল, 'দুর্যোধনকে গিয়ে বলো উলূক। কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মকে যুদ্ধক্ষেত্রেই বধ করব আমি।'

এই বার্তা শুনে দুর্যোধন ত্রস্ত পায়ে ভীষ্মের কাছে গেল। সব শুনে পিতামহ ভীষ্ম বললেন, 'দেখো বৎস, সেনাপরিচালনা, ব্যূহরচনা, যুদ্ধপরিকল্পনা—এসব বিষয়ে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। আর প্রতিপক্ষের অস্ত্রনিবারণের ক্ষেত্রেও আমার জ্ঞান দেবগুরু বৃহস্পতির তুল্য। তোমার জন্য প্রাণ দেব আমি। তুমি ভয় পেয়ো না। ও হ্যাঁ, আরেকটা কথা বলতে ভুলে গেছি তোমাকে, কোনো নারীকে অস্ত্রাঘাত করব না আমি।'

এত অস্থিরতার মধ্যেও হেসে উঠল দুর্যোধন। বলল, 'রক্তক্ষয়ী এই যুদ্ধে কোন নারী যুদ্ধ করতে আসবে পিতামহ ?'

'বলে রাখলাম বৎস। কথাটা মনে রেখো।' চিন্তান্বিত কণ্ঠে বললেন ভীষ্ম।

ভীষ্ম বলেছিলেন—পাণ্ডবদের বিশাল বাহিনী ধ্বংস করতে এক মাস লাগবে। দ্রোণও বলেছিলেন—পাণ্ডবদের বিনাশ করতে তারও একমাস লাগবে। কর্ণ দর্পের সঙ্গে বলেছিল—এই যুদ্ধ শেষ করতে তার লাগবে মাত্র পাঁচ দিন। কিন্তু অসংখ্য জীবনবিনাশী এই যুদ্ধ চলেছিল মাত্র আঠারো দিন। উভয়পক্ষের আঠারো অক্ষৌহিনী সৈন্য মাত্র আঠারো দিনেই বিনাশ হয়েছিল। কুরুক্ষেত্রের ইঞ্চিপরিমাণ জমিও রক্তস্নাতহীন ছিল না। আঠারো দিনের যুদ্ধের দশ দিনের সেনাপতি ছিলেন পিতামহ ভীষ্ম। তাঁর সেনাপতিত্বকালে কুরুসৈন্য ক্ষয় তেমন হয় নি, যেমন হয়েছে পাণ্ডবদের পক্ষের। দশ দিনের মাথায় কুরুপক্ষে সেই ভয়ংকর বিপর্যয় নেমে এসেছিল। সেই বিপর্যয়ের আগের কথা অন্যরকম।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুদ্ধ শুরুর দিন উভয়পক্ষের সেনানায়করা মুখোমুখি দাঁড়াল। কুরুসৈন্যের সামনে পিতামহ ভীষ্ম আর পাণ্ডবদের সামনে যুধিষ্ঠির। হঠাৎ যুধিষ্ঠিরের কী হলো কে জানে। রথ থেকে নেমে এল যুধিষ্ঠির। বুকে আঁটা বর্মটি খুলে ফেলল। কৌরব সেনানায়কদের দিকে হাঁটতে শুরু করল সে। তার পিছু নিল অর্জুন, ভীম, নকুল, সহদেব ও কৃষ্ণ।

তাঁদের কাণ্ড দেখে কুরুসৈন্যদের মধ্যে উল্লাসধ্বনি উঠল। উচ্চস্বরে হেসে তারা বলল, 'দেখ দেখরে, মহারাজ যুধিষ্ঠির ভয় পেয়ে গেছেন। ভীষ্মের কাছে আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছেন তিনি।'

কাছে গিয়ে ভীষ্মের পা জড়িয়ে ধরল যুধিষ্ঠির। করুণ কণ্ঠে বলল, 'আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলতে হবে আমাদের, ভাবি নি। দুর্ভাগ্য আমাদের, যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠল। যুদ্ধ করার অনুমতি দিন পিতামহ।'

প্রীতির চোখে পাণ্ডবপুত্রদের দিকে তাকালেন ভীষ্ম। একমাত্র তিনিই বুঝতে পারছেন এই মর্যাদার মর্মার্থ। কতটুকু শ্রদ্ধাবান হলে প্রতিপক্ষের সেনাপতির কাছে যুদ্ধারম্ভের অনুমতি চায় মানুষ। একমাত্র পাণ্ডবদের পক্ষেই সম্ভব এটা। উদ্ধত কৌরবদের পক্ষে এইরকম বিনয়প্রদর্শন কিছুতেই সম্ভব নয়। অত্যন্ত খুশি হলেন ভীষ্ম।

সস্নেহে বললেন, 'তুমি জয়লাভ করবে বৎস। এই যুদ্ধে পাণ্ডবদের পরাজয় হবে না। যুদ্ধের ঠিক পূর্বমূহূর্তে যে এরকম বিনয়ী ব্যবহার করতে পারে, তার কখনো পরাজয় হয় না। তোমাকে আমি কিছু একটা দিতে চাই, বলো কী চাও তুমি আমার কাছে?'

ওই সময় যুধিষ্ঠিরের পেছন থেকে ভীম বলে উঠল, 'জ্যেষ্ঠ যা চাইবে, তা-ই দেবেন পিতামহ?'

ভীষ্ম বললেন, 'মানুষ অর্থের দাস, অর্থ কারও দাসত্ব করে না। কৌরবরা আমাকে ভরণপোষণ করে। তাদের কাছে আমি অর্থের দায়ে আবদ্ধ। ওই দায়ের কারণে যুদ্ধ আমাকে করতেই হবে। যুদ্ধ না করার অনুরোধ কোরো না তোমরা আমাকে। এ ছাড়া, যা চাইবে, তা-ই পাবে তোমরা আমার কাছ থেকে।'

যুধিষ্ঠির বলল, 'এই যুদ্ধে কীভাবে আপনাকে জয় করব পিতামহ? যুদ্ধে তো আপনি অজেয়। আমাদের পরামর্শ দিন, আপনাকে জয় করার উপায় কী।'

ভীষ্ম এখনই যুধিষ্ঠিরকে তাঁর মৃত্যুর উপায় বলে দিতে চান না। দুর্যোধনকে কথা দিয়েছেন— হাজার হাজার পাণ্ডবসৈন্য নিধন করবেন তিনি। একটুকুও যুদ্ধ না করে মরতে চান না তিনি। মৃদু হেসে নরম কণ্ঠে ভীষ্ম বললেন, 'এই বেলাতেই মরতে চাই না আমি। কৌরবদের প্রতি আমার দায় আছে। কিছুদিন যুদ্ধ করে সে দায় মিটাতে চাই আমি। তা বৎস, তুমি আরেকবার এসো আমার কাছে। তখন আমার মৃত্যুর উপায় বলে দেব তোমাকে।'

যুধিষ্ঠিরাদি ভাইয়েরা পিতামহ ভীষ্মকে প্রণাম করে স্বস্থানে ফিরে গেল।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুদ্ধ শুরু হলো। মৃত্যু তার সকল সহচর নিয়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। শত সহস্র সৈন্য নিহত হতে থাকল। যুদ্ধরত সৈন্যরা আপনপর ভুলে গেল। তাদের মনে একটাই শপথ—প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে হবে। পিতা পুত্রসম যোদ্ধাকে অস্ত্রাঘাত করতে লাগল, পুত্রসম ব্যক্তিও পিতাসম যোদ্ধাকে ছাড়ল না। মাতুল ভাগনেকে, ভাগনে মাতুলকে, ভাই ভাইকে, বন্ধু বন্ধুকে, আত্মীয় আত্মীয়কে আঘাত করে যেতে লাগল। পিতামহ এরকম প্রাণঘাতী হানাহানি দেখে ইতিকর্তব্য ভুলে গিয়ে মর্মযাতনায় বিদ্ধ হতে থাকলেন।

পরের দিনের যুদ্ধে ভীষ্ম সংহার মূর্তি ধারণ করলেন। শরাঘাতে শরাঘাতে সম্মুখবর্তী যোদ্ধাদের যমালয়ে পাঠাতে লাগলেন। তাঁর অদূরে যুদ্ধ করে যেতে লাগল একলব্য। পাণ্ডবসৈন্যদের হত্যায় পেয়ে বসেছে তাকে। কখনো তীরাঘাতে, কখনো গদাঘাতে, কখনো বা অসি চালিয়ে শত্রুসৈন্য নিধন করে গেল সে। তার মনে হলো—সে নাম না জানা পাণ্ডবসৈন্যকে হত্যা করছে না, হত্যা করছে এক একজন অর্জুনকে। নিষাদসৈন্যরাও রণোন্মত্ত হয়ে উঠল সেদিন।

এই ভয়ংকর যুদ্ধ ক্রমাগত আট দিন চলল। সৈন্যক্ষয় হলো অগণিত। তুলনামূলকভাবে পাণ্ডবদের সৈন্য ধ্বংস হলো বেশি। তবে ভীমের হাতে দুর্যোধনের কয়েকজন সহোদর মারা গেল। ভীমপুত্র ঘটোৎকচের হাতে দুর্যোধন নাজেহাল হলো। ধীরে ধীরে যুদ্ধক্ষেত্রে পাণ্ডবদের আধিপত্য বিস্তৃত হতে থাকল। এতে দুর্যোধনের ক্ষোভের অন্ত থাকল না। ক্ষোভের সঙ্গেই বলল, 'এগারো অক্ষৌহিণী সৈন্য আমার। আর পাণ্ডুপুত্রদের মাত্র সাত অক্ষৌহিণী। তাদের সঙ্গে আমার সৈন্যরা এঁটে উঠছে না কেন ?'

উপহাস করে কর্ণ বলল, 'এত বিচলিত হচ্ছ কেন মিত্র ? যুদ্ধের ফলাফল তো আমার আগেই জানা। একজন বুড়োকে সেনাপতি করেছ। শরীরের মতো মনও তো বুড়িয়ে গেছে তাঁর। বুড়ো মন থেকে বিচক্ষণ যুদ্ধপরিকল্পনা বের হবে ? যুদ্ধ তো করব আমি। তোমাদের পিতামহকে মরতে দাও আগে। তারপর দেখো কীভাবে আমি পাণ্ডবদের নাস্তানাবুদ করি।'

কর্ণের কথায় উত্তেজিত হয়ে ভীষ্মের কাছে গিয়ে দুর্যোধন বলল, 'যুদ্ধের কোনো ভালো ফলই তো পাচ্ছি না আমি। যদি আপনি মনে মনে ঠিক করেন যে, পাণ্ডবদের ছোঁবেন না, তাহলে আর সেনাপতি থাকা দরকার কী আপনার ? ছেড়ে দিন সেনাপতিত্ব। কর্ণ যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব নিক। সে পাণ্ডবদের কচুকাটা করুক।'

দুর্যোধনের কথায় ভীষ্ম একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। প্রচণ্ড ক্রোধ জন্মাল তাঁর। চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। অতিকষ্টে নিজেকে দমন করলেন তিনি। শান্তস্বরে বললেন, 'অর্জুন দুর্দমনীয়। অর্জুনকে যুদ্ধে পরাস্ত করবে, এমন যোদ্ধা তোমার সৈন্যবাহিনীতে কোথায় ? তাকে এমন একজন সাহায্য করছেন, সেই কৃষ্ণকে অতিক্রম করবে কে ?'

তারপর রাগত কণ্ঠে বললেন, 'মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে মানুষ পাগলের মতো আচরণ করে। তুমি পাগলপ্রায়। তুমি ভাবছ—কর্ণ সর্বজিৎ অর্জুনকে হত্যা করতে সক্ষম হবে, তা কখনো সম্ভব হবে না। আর এই যুদ্ধ বাঁধিয়েছ তুমি, তুমি একা পাণ্ডব-পাঞ্চালদের শেষ



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোরো না কেন ? দুর্যোধন, তুমি ঘরে ফিরে যাও, ভালো করে ঘুমাও। কাল যুদ্ধক্ষেত্রে আমার ভয়ংকর রূপ দেখবে।'

পরদিন শেষবেলার দিকে ভয় জাগানিয়া যুদ্ধ করলেন ভীষ্ম। সর্বক্ষণ তাঁর পাশে পাশে থাকল একলব্য। ভীষ্ম ভয়ংকর প্রাণঘাতী সব শর নিক্ষেপ করে করে পাণ্ডবসৈন্যদের বিনষ্ট করতে থাকলেন।

অর্জুন অন্যত্র যুদ্ধে ব্যস্ত ছিল। ভীষ্মের দোর্দণ্ড প্রতাপের সংবাদ তার কাছে পৌঁছালে সারথি কৃষ্ণকে ভীষ্ম বরাবর রথচালনার নির্দেশ দিল। কিন্তু পথিমধ্যে প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়াল একলব্য। বলল, 'কোথায় যাচ্ছ অর্জুন ? আমাকে কি মনে পড়ছে তোমার ? সেই আঙুলকাটা একলব্য আমি। যার আঙুল দ্রোণাচার্যকে দিয়ে নির্মমভাবে কেটে নিয়েছিলে তুমি, সেই ভয়ংকর ধনুর্ধর একলব্য আমি। আগে আমাকে জয় কোরো। তারপর পিতামহকে বাধা দিতে যেয়ো।'

একবল্যকে লক্ষ্য করে চোখা চোখা গোটা কয়েক বাণ নিক্ষেপ করল অর্জুন। সব বাণই অর্ধপথে নিস্তেজ করে দিল একলব্য। তারপর অর্জুনের মস্তক লক্ষ্য করে শরের পর শর নিক্ষেপ করে গেল একলব্য। কিছু বাণ কাটতে পারল অর্জুন, কিছু পারল না। এক একটা বাণের আঘাতে অর্জুনের রথের ধ্বজা কাটা গেল, একটা শর অর্জুনের কান ঘেঁষে পেছনে চলে গেল। অবস্থা বেগতিক দেখল অর্জুন।

কৃষ্ণ উচ্চস্বরে বললেন, 'মাথা কেটে নামিয়ে নাও নিষাদের। দাঁড়াও তুমি অর্জুন, আমি নামি। সুদর্শন চক্র দিয়ে মাথা কেটে আনি একলব্যের।'

প্রত্যুত্তরে কড়াকণ্ঠে একলব্য বলল, 'মাথা তো কাটবেনই। আপনি তো প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী। বলেছিলেন—আপনি শুধু অর্জুনের রথ চালাবেন, যুদ্ধের সময় কখনো হাতে অস্ত্র তুলে নেবেন না। সুদর্শন চক্র অস্ত্র নয় বুঝি ? পিতামহ ভীষ্মের প্রলয়ঙ্করতা থামানোর জন্য একবার তো প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছেন, আরেকবার করলে ক্ষতি কী।' বলে অর্জুনকে লক্ষ্য করে তীক্ষ্ণ একটা বাণ নিক্ষেপ করল একলব্য।

এই সময় একলব্যকে পাণ্ডবসৈন্যরা ঘিরে ধরল। নিষাদসৈন্য আর পাণ্ডবসেনাদের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ বেঁধে গেল। অর্জুনের রথ ভীষ্মের সমীপে এগিয়ে গেল। অর্জুন-ভীষ্মের যুদ্ধ খুব বেশিদূর এগোল না। সূর্যাস্ত হলো। সূর্যাস্তে যুদ্ধ নিষিদ্ধ।

নিরুপায় যুধিষ্ঠির কৃষ্ণার্জুনকে নিয়ে অতিগোপনে ভীষ্মশিবিরে গেল সেই রাতে। ভীষ্মের পায়ের কাছে হত্যে দিয়ে পড়ল যুধিষ্ঠির, 'আর যে পেরে উঠছি না পিতামহ। আপনার ভয়ংকর অস্ত্রের সামনে আমরা অসহায়। যুদ্ধজয়ের উপায় বলুন আমাদের।'

'একমাত্র আমার মৃত্যুই তোমাদের যুদ্ধজয় নিশ্চিত করবে।'

'কী উপায়ে আপনার মৃত্যু হবে ?' নিচের দিকে চেয়ে কৃষ্ণ প্রশ্ন করলেন।

উদার কণ্ঠে ভীষ্ম বললেন, 'স্ত্রীলোক অথবা স্ত্রী নামধারী কারও ওপর অস্ত্রাঘাত করব না আমি।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর স্মিত মুখে কী যেন ভাবলেন তিনি অনেকক্ষণ। তারপর মুখ তুললেন, সেই মুখে স্বর্গীয় হাসি। ভীষ্ম বললেন, 'ধৃষ্টদ্যুম্ন ছাড়া দ্রুপদের আর একজন পুত্র শিখণ্ডী। সে আগে স্ত্রীলোক ছিল। স্ত্রীলোক আমার কাছে স্বর্গসমান পবিত্র, মাতৃসম মর্যাদাময়। সুতরাং তার গায়ে অস্ত্রাঘাত করব না আমি। অর্জুন তাকে সামনে রেখে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করুক, শরে শরে ছিন্নভিন্ন করে দিক আমাকে।' বলে মৌন হলেন ভীষ্ম। যুধিষ্ঠিরের শত প্রশ্নেও আর কোনো কথা বললেন না তিনি।

যুদ্ধের দশম দিন। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃদঙ্গ, ভেরি আর দুন্দুভি বেজে উঠল। আজকে পাণ্ডবসেনাদের সামনে থাকল শিখণ্ডী। তার পেছনে অর্জুন। শিখণ্ডীর সঙ্গে ভীষ্মের চোখাচোখি হলো। ভীষ্ম চোখ নামিয়ে নিলেন। অস্ত্র ত্যাগ করে রথের ওপর বসে থাকলেন তিনি। ক্রোধান্বিত শিখণ্ডী ভীষ্মের বুক লক্ষ্য করে তিনটি বাণ নিক্ষেপ করল। এরপর বাণের পর বাণ নিক্ষেপ করে গেল শিখণ্ডী। সামনে শিখণ্ডী পেছনে অর্জুন। আর প্রতিপক্ষে ভীষ্ম। শিখণ্ডী আর অর্জুনের যৌথবাণ নিক্ষেপণে পিতামহ জর্জরিত হলেন। অর্জুনের কঠিন বাণে শরবিদ্ধ কুরুপিতা ভীষ্ম আপন রথ থেকে ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন।

পাণ্ডবপক্ষে আনন্দধ্বনি আর কৌরবপক্ষে কান্নাধ্বনি উঠল। আনন্দ আর কান্নার মিশ্রিত ধ্বনি কুরুক্ষেত্রের আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল।

চক্ষু নিমীলিত করে শরশয্যা গ্রহণের আগে ভীষ্মের চোখে জননী সত্যবতীর চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তাঁর কানে যেন ভেসে এল মা গঙ্গার আহ্বান—'আয় ভীষ্ম, আয়। দীর্ঘদিন তোকে ছাড়া দিন কাটছে না আমার। তুই এসে আমার বুক ভরিয়ে তোল।'

AMARBOI.COM


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুত্রব্যসনসন্তপ্তো নিরাশো জীবিতে ভবৎ।
পুত্রের মৃত্যুর কথা শুনে তাঁর শরীরে আর যুদ্ধ করবার শক্তি রইল না।

ভীষ্মের সেনাপতিত্বে দশ দিন ধরে ভীতিজনক যুদ্ধ করেছেন দ্রোণাচার্য।

যুদ্ধের শুরুতে দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে এক অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিনায়ক নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর অস্ত্রক্ষমতা আর অভিজ্ঞতা প্রদর্শন ভীষ্মের সেনাপতিত্বের আড়ালে ঢেকে গিয়েছিল। সেই সুযোগ এল তখন, যখন তিনি সেনাপতি নিযুক্ত হলেন।

দশ দিনের যুদ্ধ শেষে ভীষ্ম শরশয্যা গ্রহণ করলে কৌরবশিবিরে ভীষণ একটা সংকট দেখা দিল। ভীষ্মের পর কে সেনাপতি হবেন—দ্রোণাচার্য না কর্ণ ? দুর্যোধনের ঝোঁক কর্ণের দিকে। কিন্তু মর্যাদা, বয়স, যুদ্ধাভিজ্ঞতা এবং অস্ত্রচালনার দক্ষতার নিরিখে দ্রোণাচার্য অগ্রগণ্য।

কর্ণের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসল দুর্যোধন। কর্ণ সহজ সমাধান দিল। সারা জীবন দ্রোণাচার্যের বিরোধিতা করে এসেছে কর্ণ, কিন্তু সংকটকালে যথাযথ পরামর্শ দিল দুর্যোধনকে। কর্ণ বলল, 'কৌরবপক্ষের সেনাপতি হওয়ার মতো যোগ্য লোকের অভাব তোমার শিবিরে নেই। কিন্তু তোমার অধিকতর যোগ্য লোককে সেনাপতি করা উচিত। সমগুণসম্পন্ন একজনকে বেছে নিলে অন্যরা অসন্তুষ্ট হবেন। ফলে যুদ্ধ পরিচালনাটাই ভেস্তে যাবে।'

এরপর কর্ণ নির্বাক থাকল কিছুক্ষণ। যেন কর্ণ নিজের সঙ্গে নিজে যুদ্ধ করল এই সময়টায়। তারপর স্থির চোখে দুর্যোধনের দিকে তাকিয়ে কর্ণ বলল, 'তোমার শিবিরের বড় বড় যোদ্ধাদের মধ্যে আচার্যস্থানীয় হলেন দ্রোণ। তাঁকে পরবর্তী সেনাপতি কোরো। শুক্রাচার্য ও বৃহস্পতির মতো তাঁর রাজনৈতিকজ্ঞান। ইন্দ্র আর পরশুরামের মতো তাঁর সমরদক্ষতা। পৃথিবীতে এমন যোদ্ধা নেই, তাঁকে পরাস্ত করে।'

চিরন্তন দ্রোণবিরোধী কর্ণের মুখে এরকম কথা শুনে দুর্যোধনের দ্বিধা কেটে গেল। সেনাপতিত্ব গ্রহণ করার জন্য সে দ্রোণাচার্যকে অনুরোধ করল। দ্রোণ সম্মত হলেন। আর যুদ্ধারম্ভ করতে সম্মত হলো কর্ণ। ভীষ্মের পতনের পর হাতে অস্ত্র তুলে নেবে, এরকমই প্রতিজ্ঞা ছিল কর্ণের।

দ্রোণ দুর্যোধনকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'আমার সেনাপতিত্বকালে পাণ্ডবপক্ষ স্বস্তিতে থাকবে না। তাদের ধ্বংস অনিবার্য। তবে একটি শর্ত।'


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আবার কী শর্ত ? পিতামহেরও শর্ত ছিল পাণ্ডবদের মারবেন না তিনি। আপনিও সেকথা বলবেন নাকি ?' দুর্যোধন বলল।

'অনেকটা সেরকমই। তবে বিষয়টা পাণ্ডবদের নিয়ে নয়। আমি দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করব না। দ্রোণবধের জন্যই তার জন্ম এবং এটা অনিবার্য।'

ওদিকে দ্রোণাচার্যের সেনাপতি নির্বাচিত হওয়ার সংবাদ প্রচারিত হলে একলব্যের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। সেই দ্রোণ সেনাপতি হলেন ? নির্মম, পক্ষপাতী, বর্ণগরিমায় দীপ্ত দ্রোণের অধীনে যুদ্ধ করবে কি না—এ নিয়ে একলব্যশিবিরে দ্বিধা নেমে এল। সপারিষদ মন্ত্রণাসভায় বসল একলব্য, সেই রাতে।

একলব্য বলল, 'কর্ণ যেমন ভীষ্মের অধীনে যুদ্ধ করেন নি, আমিও তেমনি দ্রোণের সেনাপতিত্বে যুদ্ধ করব না।'

'সেটা কি ঠিক হবে মহারাজ ?' সমর-উপদেষ্টা বলল।

'কেন ঠিক হবে না ? যাঁর মন জাতিবিদ্বেষে পরিপূর্ণ, পুত্রবয়সি কারও অঙ্গচ্ছেদন করতে যিনি মুহূর্তকাল দ্বিধা করেন না, সেই দ্রোণের অধীনে যুদ্ধ করাকে পাপ মনে করি আমি।'

'মহারাজ, সেভাবে না ভেবে আপনি অন্যভাবে ভাবুন।'

'কীভাবে ভাববো ?'

'ধরুন, পাণ্ডবদের হাতে দ্রোণাচার্য নাজেহাল হচ্ছেন, ধরুন—যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে লেজ গুটিয়ে শিয়ালের মতো পালাচ্ছেন তিনি, এ দৃশ্য দেখতেও তো সুখ। আর আপনি যদি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত না থাকেন, এমন দৃশ্য দেখবেন কী করে ? এমনও তো হতে পারে, পাণ্ডবদের সঙ্গে পেরে না উঠে আপনার সাহায্য চাইছেন দ্রোণাচার্য, আপনার সেই সময়ের আনন্দের কথা চিন্তা করুন।' আস্তে আস্তে বলল সমর-উপদেষ্টা। একলব্য কিছু বলার আগে সে আবার বলল, 'তা ছাড়া...।'

সমর-উপদেষ্টার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে একলব্য জিজ্ঞেস করল, 'তা ছাড়া কী ?'

নম্রকণ্ঠে উপদেষ্টা বলল, 'আপনি যুদ্ধ করতে এসেছেন দুর্যোধনের পক্ষে, যদিও কর্ণের আহ্বানটা আপনার কাছে মুখ্য ছিল। আপনার প্রধান উদ্দেশ্য অর্জুনকে নিধন করা। যুদ্ধ থেকে বিরত থাকলে দুর্যোধন আপনার প্রতি বিরক্ত হবেন আর অর্জুনের ওপরও আপনার প্রতিশোধ নেওয়া হবে না। আপনার যুদ্ধবিরতির সময় অর্জুনকে যদি অন্য কেউ হত্যা করে ফেলে, তাহলে আপনার উদ্দেশ্যটাই বিফল হবে।'

সমর-উপদেষ্টার কথা শুনে অন্যান্য পরামর্শকের দিকে তাকালেন একলব্য। সবারই চোখেমুখে যুদ্ধ করার পক্ষে সম্মতির আভাস। একলব্য বলল, 'ঠিক আছে। আগের মতোই যুদ্ধ চালিয়ে যাব আমরা।'

একাদশ দিবস থেকে প্রবল প্রতাপে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন দ্রোণাচার্য। দ্রোণাচার্য জানতেন—শুধু অস্ত্র প্রয়োগ করে যুদ্ধ জেতা যায় না, যুদ্ধ জেতার জন্য ব্যূহ রচনার কৌশলটা জরুরি।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি সেনা-সংস্থানের এদিক-ওদিক করে এমন একটা যুদ্ধ পরিচালনা করলেন, যাতে পাণ্ডবদের অনেক সৈন্য নিহত হলো। কৌরবদের অস্ত্রাঘাতে পাণ্ডবপক্ষ দিশেহারা হয়ে পড়ল। কৌরবদের জয় দিয়েই একাদশ দিবসের যুদ্ধ শেষ হলো।

দুর্যোধনের আনন্দের অবধি থাকল না। দ্রোণাচার্যের সঙ্গে দেখা করে সে তাঁকে যথেষ্ট বাহবা দিল। বলল, 'আপনি ভুবনখ্যাত সেনাপতি। আপনার সেনাপতিত্বে আমরা অচিরেই পাণ্ডবদের পদানত করতে পারব।'

তাঁকে সেনাপতি করায় দ্রোণাচার্য এমনিতেই খুব খুশি, উপরন্তু দুর্যোধনের কথা শুনে, তাঁর সেই আনন্দ বহুগুণে বৃদ্ধি পেল। উদ্বেলিত দ্রোণ বলে ফেললেন, 'সেনাপতি করে তুমি আমাকে যথেষ্ট সম্মান দেখিয়েছ। আমি ভীষণ আনন্দিত। আমি তোমাকে বর দিতে চাই। বলো, তুমি কী চাও ?'

দুর্যোধন বলল, 'যদি বরই দিতে চান আচার্য, যুধিষ্ঠিরকে জীবন্ত ধরে আনুন আমার কাছে।' তারপর স্বগত কণ্ঠে বলল, 'আবার পাশা খেলায় বসাতে চাই তাকে, খেলায় জিতে আবার বনবাসে পাঠাতে চাই পঞ্চপাণ্ডবকে।'

শুনে দ্রোণাচার্য একটু দ্বিধান্বিত হলেন। প্রকৃত মনোভাবটা নিজের মধ্যে লুকিয়ে রেখে বললেন, 'যুধিষ্ঠিরকে তোমার সামনে ধরে আনা আমার জন্য অতি সহজ একটা ব্যাপার। তবে একটা কথা, অর্জুন যেভাবে ক্রমাগত যুধিষ্ঠিরকে নিরাপত্তা দিয়ে যায়, তাতে ইন্দ্রও যুধিষ্ঠিরকে ধরে আনতে পারবেন না।'

'আপনার পরামর্শ কী তাহলে ?' দুর্যোধন জিজ্ঞেস করল।

'আগামীকাল তোমরা সমরক্ষেত্রের একদিকে যুদ্ধের তীব্রতা বাড়িয়ে দেবে। পাণ্ডবসৈন্যদের বাঁচানোর জন্য অর্জুন সেদিকে ছুটে যাবে। এই সুযোগে আমি যুধিষ্ঠিরকে বন্দি করব।' বললেন দ্রোণাচার্য।

গুপ্তচরের মাধ্যমে কথাটা পাণ্ডবশিবিরে পৌঁছে গেল। পরদিন সর্বশক্তি দিয়ে অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করল। তার পরের দিন কৌরবপক্ষের ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা অর্জুনকে অস্ত্রের তীব্রতা দিয়ে যুধিষ্ঠির থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। ধৃষ্টদ্যুম্নের ওপর যুধিষ্ঠিরের ভার দিয়ে অন্যত্র যুদ্ধ করতে গেল অর্জুন। প্রাণপণ যুদ্ধ করলেন দ্রোণাচার্য। পাণ্ডবপক্ষের বড় বড় যোদ্ধা এমনকি ধৃষ্টদ্যুম্নও যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হলো। অবস্থা বেগতিক দেখে রথ থেকে নেমে এল যুধিষ্ঠির। একটা ঘোড়ায় চড়ে দ্রুত যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করল সে। যুধিষ্ঠির অধরা থেকে গেল।

পরদিন দ্রোণাচার্য চক্রব্যূহ রচনা করলেন। বললেন, 'আজকে পাণ্ডবপক্ষের কোনো বড় যোদ্ধাকে আমি যমালয়ে পাঠাবই।'

ব্যূহের বিভিন্নস্থানে দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামার মতো মহাবীররা প্রাণান্তক অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ শুরু করল। ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীম, সাত্যকি কেউ এই ব্যূহ ভেদ করতে পারল না। এই ব্যূহভেদের কৌশল শুধু অর্জুনেরই জানা। অর্জুন আজ কুরুক্ষেত্রের


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সর্বদক্ষিণে যুদ্ধ করছে। নিরুপায় যুধিষ্ঠির অর্জুনপুত্র অভিমন্যুকেই ব্যূহে প্রবেশের অনুরোধ করল। অভিমন্যু মাতৃজঠরে থাকাকালীন পিতার মুখে চক্রব্যূহের ভেতরে ঢোকার কৌশল শুনেছে, কিন্তু মা ঘুমিয়ে পড়ায় বেরোবার কৌশলটি জানা হয় নি তার।

যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে অভিমন্যু সোৎসাহে বলল, 'আমি চক্রব্যূহ ভেঙে প্রবেশ করছি। কিন্তু বেরোবার কৌশল আমার জানা নেই। বিপদ হলে আপনারা বের করে আনবেন আমাকে।' বলে চক্রব্যূহে সশস্ত্র অভিমন্যু ঢুকে গেল।

চারদিক থেকে কৌরবযোদ্ধারা অভিমন্যুকে ঘিরে ধরল। যুধিষ্ঠির, ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকির সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল ধৃতরাষ্ট্রের জামাই জয়দ্রথের কাছে। সপ্তরথীর তীব্র তীক্ষ্ণ শরাঘাতে ব্যূহের মধ্যেই অভিমন্যু মারা গেল।

অর্জুনের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল জয়দ্রথের ওপর। পরদিন সায়াহ্নে কৌশলে অর্জুন জয়দ্রথকে হত্যা করল।

বোনজামাই জয়দ্রথের মৃত্যুতে দুর্যোধন ভেঙে পড়ল। তার সকল ক্ষোভ গিয়ে পড়ল দ্রোণের ওপর। চোখা চোখা বাক্যে দ্রোণকে পর্যুদস্ত করে ছাড়ল দুর্যোধন। জয়দ্রথের হত্যার সকল দায় দ্রোণাচার্যের ওপর চাপিয়ে দিল সে।

সমস্ত দিনের যুদ্ধক্লান্তিতে এমনিতেই অবসন্ন ছিলেন আচার্য, তার ওপর দুর্যোধনের নিদারুণ বাক্যে ভীষণ মর্মাহত হলেন তিনি। নিজেকে রোধ করতে না পেরে দ্রোণাচার্য বলে উঠলেন, 'আমি না হয় বৃদ্ধ, যুদ্ধ করার ক্ষমতা না হয় আমার নাই, তোমাদের তো ছিল ? অর্জুন যখন জয়দ্রথকে শরাঘাতে জর্জরিত করছে, তখন তো তার পাশে তুমি ছিলে, কর্ণ ছিল, কৃপ ছিলেন, এমনকি আমার পুত্র অশ্বত্থামাও ছিল। তোমরা এত এত মহাবীর মিলে জয়দ্রথের মৃত্যুকে তো ঠেকাতে পারো নি। ধিক্কারটা কার দিকে যায় দুর্যোধন, ভেবেচিন্তেই বলো।'

দুর্যোধন আপাতত চুপ মেরে গেল। কিন্তু তার মধ্যে সন্দেহটা থেকে গেল। সে ভাবল পাণ্ডবদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব আছে আচার্যের। না হলে কেন নানাসময়ে সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও যুধিষ্ঠির বা অর্জুনকে হত্যা করলেন না তিনি ?

মিত্র কর্ণের কাছে সন্দেহের কথা বলল দুর্যোধন, 'আমার সব গেল রে মিত্র। হাজার হাজার সৈন্য গেল, অনেক সহোদর গেল, আজ গেল একমাত্র বোন দুঃশলার স্বামী জয়দ্রথ। এসব হয়েছে দ্রোণের কারণে। পাণ্ডবদের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব স্পষ্ট।'

দ্রোণবিরোধী কর্ণ বলল, 'এমন করে বুড়ো মানুষটাকে দোষ দিয়ো না মিত্র। নিজের ক্ষমতানুসারে যুদ্ধ করে যাচ্ছেন তিনি। অর্জুনের বয়স আর আচার্যের বয়সের মধ্যে অনেক পার্থক্য। আর তোমাদের গুরুদেব যা জানেন, তার সবটাই তো প্রিয়পাত্র অর্জুনকে শিখিয়ে-পড়িয়ে দিয়েছেন। অর্জুনকে আটকানোর মতো কোনো অস্ত্র তো নিজের জন্য আলাদা করে রাখেন নি তিনি।'

একটু থেমে কর্ণ আবার বলল, 'আমি তো দিব্যচক্ষে অর্জুনের হাতে দ্রোণের পরাজয় দেখছি।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্ণের কথা শুনে ভীত এবং উত্তেজিত হয়ে উঠল দুর্যোধন। দ্রোণাচার্যের কাছে গিয়ে নানা সৌজন্যবর্জিত কথাবার্তা বলল। এতে আচার্যের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। অধৈর্য কণ্ঠে তিনি বললেন, 'তুমি অহেতুক সকলকে সন্দেহ কোরো দুর্যোধন। তোমার হৃদয় অত্যন্ত নিষ্ঠুর। পাপ, লোভ আর অহংকার তোমাকে অন্ধ করে ছেড়েছে। তুমি নিজে যাও না কেন অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে।'

দ্রোণের ভেতরে এতদিন অপমানের যে জ্বালা জমা হয়েছিল, তা তিনি আজ উগরে দিলেন। বললেন, 'যুদ্ধে তুমি একা যেয়ো না, ওই যে পাশাড়ে শুকুনিমামা, তাকেও সঙ্গে নিয়ে যেয়ো। ব্যাটা কুটিল, প্রবঞ্চক শকুনি। তোমাদেরকে যুদ্ধে ঠেলে দিয়ে প্রাসাদে আরামে-আয়াসে দিন কাটাচ্ছে এখন। শোনো দুর্যোধন, তুমি তো সর্বদা বলে এসেছ—কর্ণ, তুমি আর দুঃশাসন মিলে পাণ্ডব ভাইদের নিধন করতে পারবে। তো যাও না কেন আজকে ? গিয়ে শেষ করে আসো না ওদের।' বলে আর সেখানে দাঁড়ালেন না দ্রোণাচার্য।

দ্রোণাচার্য যখন ফিরলেন, রাত্রির তৃতীয়াংশ তখন শেষ হয়ে গেছে। অবশিষ্ট আছে এক ভাগ। দুর্দমনীয় রাগে ফুলতে ফুলতে ওই সময়েই তিনি যুদ্ধারম্ভের ঘোষণা দিলেন।

ধৃষ্টদ্যুম্নর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল শেষ রজনীতে। এই রাত্রির যুদ্ধে দ্রোণের লক্ষ্য পাঞ্চালসৈন্য। যুদ্ধক্ষেত্রে আচার্য দ্রোণ ভয়ংকর হয়ে উঠলেন।

সেই রাত্রিতে দ্রুপদ আর দ্রোণ মুখোমুখি হলেন। ঘোরতর যুদ্ধ লাগল দুজনের মধ্যে। যুদ্ধের ভয়ংকরতা দেখে রাজা বিরাট দ্রুপদকে সাহায্য করতে এলেন। দ্রোণের ভল্লের আঘাতে রাজা দ্রুপদ আর রাজা বিরাট দুজনেই নিহত হলেন সেই রাতে। শেষরাতের আলো-আঁধারির যুদ্ধেই দ্রুপদ নিহত হলেন। শোক প্রকাশ করার সুযোগ পেল না পাণ্ডবরা আর ধৃষ্টদ্যুম্ন। আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ ভয়াল রূপ নিল। দ্রোণাচার্য ওই দিন শুধু পাঞ্চালসৈন্য নিধন করে গেলেন। পাঞ্চালসৈন্য ছত্রখান হয়ে পড়ল। দ্রোণকে রোধ করা পাণ্ডবদের জন্য সুকঠিন হয়ে দাঁড়াল।

পাণ্ডবপক্ষ বড় ভাবিত হয়ে পড়ল। এভাবে চলতে দিলে অচিরেই পরাজয় নিশ্চিত। পরামর্শের জন্য পাণ্ডবরা জমায়েত হলো। পরামর্শসভার কৃষ্ণই প্রধান-পুরোহিত। কৃষ্ণের দিকে চেয়ে অর্জুন বলল, 'কী করা যায় এখন ?'

কৃষ্ণ বললেন, 'দেখো অর্জুন, দ্রোণাচার্যকে নিরস্ত্র না করলে তাঁকে পরাস্ত করা সম্ভব নয়। আচার্য দ্রোণকে এমন কঠিন সংবাদ দিতে হবে, যা শুনে তিনি অস্ত্রত্যাগ করবেন।'

'কী কঠিন সংবাদ ?' যুধিষ্ঠির জিজ্ঞেস করল।

যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বদা যে সত্য মেনে চলা যায় না, প্রয়োজনে মিথ্যেকেও ঢাল করে শত্রুকে ঘায়েল করতে হয়, সেটা সবাইকে বোঝালেন কৃষ্ণ। তিনি বললেন, 'দ্রোণাচার্যের সবচাইতে প্রিয়বস্তু তাঁর একমাত্র পুত্র অশ্বত্থামা। আগামীকাল তাঁকে অশ্বত্থামার মৃত্যুসংবাদ দিতে হবে।'

নির্বাক বিস্ময়ে কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে যুধিষ্ঠির বলল, 'মৃত্যুসংবাদ! অশ্বত্থামা তো মরে নি!'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এই মিথ্যেটুকু না বললে দ্রোণাচার্যকে থামানো যাবে না। তিনি আর কিছুদিন যুদ্ধ করলে পাণ্ডবপক্ষের সবাইকে যমালয়ে যেতে হবে।' একটু থেমে কৃষ্ণ আবার বললেন, 'আগামীকাল তাঁকে কেউ এই কঠিন মিথ্যে সংবাদটি শোনাক।'

অর্জুন স্তম্ভিত স্বরে বলল, 'এ-কী বলছেন সখা ? গুরুদেব আমার! ছলনার আশ্রয় নিয়ে নিরস্ত্র করব তাঁকে ?'

কৃষ্ণ বরফশীতল গলায় বললেন, 'এ ছাড়া আর কী করা যায় বলো সখা ? আচার্যের অস্ত্রাভিজ্ঞতার কথা অন্যে না জানলেও তুমি তো জানো। ভূভারতে এমন যোদ্ধা আছে, যে দ্রোণাচার্যকে সম্মুখযুদ্ধে পরাস্ত করে ? তুমি নীতির কথা, বিবেকের কথা বলতে চাইছো—দ্রোণ তোমার গুরু, তোমার পিতার তুল্য, সেই তাঁকে ছলনার ফাঁদে ফেলবে কী করে ? এই তো বলতে চাইছো তুমি ? আচ্ছা ধরো, তুমি যে নৈতিকতার কথা বলছো, দ্রোণাচার্য কি সেই নৈতিকতার ব্যাপারটি মানেন ? যুদ্ধে কি তিনি তোমাকে শরাঘাতে জর্জরিত করেন নি ? সুযোগ পেলে তিনি কি তোমাকে হত্যা করতেন না ? তা ছাড়া তোমাদের আগেও বলেছি, যুদ্ধে নিয়মের ও বিবেকের বালাই থাকতে নেই। তাহলে তোমাদের পরাজয় নিশ্চিত। পরাজয়ের অর্থ তো জানো—ভারতবর্ষ থেকে পাণ্ডবধারা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া।'

একটু থেমে কৃষ্ণ আবার বললেন, 'অর্জুন, ভুলে যেয়ো না, এই দ্রোণই তোমার শ্বশুরকে নির্মমভাবে হত্যা করেছেন।' অর্জুনের চোখে চোখ রেখেই কথা শেষ করলেন কৃষ্ণ। অর্জুনের প্রতিক্রিয়া কী হয় তা গভীরভাবে অনুধাবন করতে চাইলেন তিনি। কৃষ্ণ দেখলেন, তাঁর বক্তৃতায় কাজ হয়েছে। অর্জুনের অবাক করা মুখে ধীরে ধীরে ক্রোধ ছায়া ফেলতে শুরু করেছে।

সিদ্ধান্ত হলো—পরদিন ভীম যুদ্ধক্ষেত্রে দ্রোণাচার্যকে অশ্বত্থামার মৃত্যুসংবাদ শোনাবে।

পরের দিনের যুদ্ধে ভীম মালবরাজ ইন্দ্রবর্মার মুখোমুখি হলো। দুজনের মধ্যে প্রচণ্ড গদাযুদ্ধ হলো। অশ্বত্থামা নামের এক হাতির পিঠে চড়ে ইন্দ্রবর্মা যুদ্ধ করছিল। যুদ্ধের একটা সময়ে ভীম গদার বজ্রকঠিন আঘাতে অশ্বত্থামা নামের হাতিটিকে মেরে ফেলল। ইন্দ্রবর্মা অন্যের রথে চড়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করল।

ভীম দ্রোণাচার্যের সামনে গিয়ে দু'বাহু তুলে নাচতে নাচতে বলতে লাগল, 'অশ্বত্থামাকে যমালয়ে পাঠিয়েছি। আমার গদার আঘাতে অক্কা পেয়েছে সে।'

ভীমের কথা শুনে আচার্যের হাত-পা ঠান্ডা হয়ে এল। কিছুটা বিভ্রান্তও হলেন তিনি। তারপর ভাবলেন, অশ্বত্থামা যে-সে যোদ্ধা নয়। অর্জুনের সমতুল্য তীরন্দাজ সে। সামান্য ভীমের গদার আঘাতে মারা যাবে অশ্বত্থামা! বিশ্বাস হচ্ছে না। এই ভাবনা তাঁকে দ্বিগুণ তেজোদীপ্ত করে তুলল। দুর্দম্য প্রতিশোধস্পৃহায় তিনি পাণ্ডবসৈন্য নিধনে মনোনিবেশ করলেন। ক্রোধান্ধ দ্রোণ ব্রহ্মাস্ত্র হাতে তুলে নিলেন। দ্রোণের শরাঘাতে শত সহস্র পাঞ্চালসৈন্য মারা গেল। দ্রোণের তাণ্ডবে গোটা কুরুক্ষেত্র শ্মশানে পরিণত হতে থাকল।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃষ্ণ ছুটে গেলেন যুধিষ্ঠিরের কাছে। চিৎকার করে বললেন, 'এখন কী করবে যুধিষ্ঠির ? দ্রোণাচার্য আর একবেলা যুদ্ধ করলে পাণ্ডবপক্ষে বাতি জ্বালানোর কেউ থাকবে না।'

'আমি কী করতে পারি ?'

'আচার্য তোমার কথা বিশ্বাস করবেন। তিনি জানেন, তুমি কখনো মিথ্যে বলো না।'

'তা তো ঠিক।'

কৃষ্ণ বললেন, 'সামান্য মিথ্যেটুকু না বললে তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য।'

এই সময় ভীম সেখানে উপস্থিত হলো। বলল, 'আমি আবার গুরুদেবকে অশ্বত্থামার মৃত্যুসংবাদ দিতে গিয়েছিলাম। তিনি অট্টহাস্য করে বলেছেন, ভীম, তুমি মিথ্যেবাদী। একমাত্র যুধিষ্ঠির বললেই কথাটা বিশ্বাস করব আমি।'

কৃষ্ণ চাপাকণ্ঠে বললেন, 'এবার ভেবে দেখো যুধিষ্ঠির, কী সিদ্ধান্ত নেবে। পাণ্ডবধারাকে ধ্বংস করবে, না যুদ্ধজয় ছিনিয়ে নেবে ?'

যুধিষ্ঠির অস্থির সময় কাটাল কিছুক্ষণ। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণের চাপাচাপি, ভীমের অনুরোধ, সর্বোপরি পাণ্ডবপক্ষীয় সেনাদের ধ্বংসের কথা বিবেচনা করে মিথ্যে বলতে রাজি হলো যুধিষ্ঠির।

যুদ্ধরত দ্রোণাচার্যের সামনে গিয়ে উচ্চস্বরে বলল, 'অশ্বত্থামা হতঃ।' নিচু স্বরে বলল, 'ইতি গজঃ।'

দ্রোণের শরীরের রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। যুধিষ্ঠির সত্যবাদী, জীবনের বিনিময়েও সে কখনো মিথ্যে বলবে না। তাহলে কি পুত্র অশ্বত্থামা নিহত হয়েছে ?

দ্রোণের পাশে যুদ্ধ করছিল একলব্য। নিষাদসৈন্যরা আজ মারমুখী। যুদ্ধ চলছিল সরস্বতী নদীর বেলাভূমিতে। একলব্যের এক একটা অস্ত্রের আঘাতে শত শত পাণ্ডবসৈন্য ধরাশায়ী হচ্ছিল। যুধিষ্ঠিরের কথা একলব্যের কানে গেল। তার ভেতরের এতদিনের লালিত ক্রোধ হঠাৎ কোথায় উবে গেল। দ্রোণের প্রতি সে শ্রদ্ধার্দ্র হয়ে উঠল। এত বড় মিথ্যে দিয়ে গুরুদেবকে নিরস্ত্র করবে যুধিষ্ঠির! তা হবে না। চিৎকার করে বলল, 'বিভ্রান্ত হবেন না গুরুদেব। যুধিষ্ঠির মিথ্যে বলছে। কিছুক্ষণ আগে কুরুক্ষেত্রের দক্ষিণাংশে অশ্বত্থামাকে যুদ্ধ করতে দেখে এসেছি আমি। তার চারদিকে সশস্ত্র কৌরবসৈন্য। তার বিজয়রথ সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।'

একলব্যের কথা দ্রোণাচার্যের কানে গেল। কিন্তু একলব্যের কথা বিশ্বাস করলেন না তিনি। শিষ্যদের মধ্যে অর্জুন তাঁর আস্থার জায়গা। আর সবচাইতে বড় বিশ্বাসের জায়গা এই যুধিষ্ঠির। বাল্যবেলা থেকে দ্রোণাচার্য যুধিষ্ঠিরকে চেনেন। সে কিছুতেই মিথ্যে বলতে পারে না।

ভাবতে ভাবতে রথে বসে পড়লেন দ্রোণাচার্য। পঁচাশি বছরের বৃদ্ধ দ্রোণ একেবারে ভেঙে পড়লেন। অস্ত্রত্যাগ করলেন তিনি।

একলব্য সমানে বলে যেতে লাগল, 'ভুল করছেন গুরুদেব। যুধিষ্ঠির মিথ্যাবাদী। মিথ্যাবাদীর কথা বিশ্বাস করবেন না। যুধিষ্ঠির যেমন আপনার শিষ্য, আমিও আপনার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিষ্য। আমি আপনার কাছে কোনোদিন মিথ্যে কথা বলি নি। অরণ্যমধ্যে আপনি যখন জিজ্ঞেস করেছিলেন আমি আপনার ছাত্র কি না, ভেবে দেখুন, অকপটে সত্য বলেছিলাম আমি। সেই শিষ্যত্বের দোহাই দিয়ে বলছি—যুধিষ্ঠিরকে বিশ্বাস করবেন না আপনি।'

এই সময় সহস্র পাণ্ডব-পাঞ্চাল সৈন্য একলব্যকে ঘিরে ধরল। যুদ্ধের হুঙ্কারে আর অস্ত্রের ঝনঝনানিতে একলব্যের কণ্ঠ হারিয়ে গেল।

ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রথমে শরাঘাতে শরাঘাতে দ্রোণাচার্যকে জর্জরিত করল। দ্রোণাচার্যের সারথি মারা গেল, অশ্বগুলো আহত হলো। শোকাচ্ছন্ন দ্রোণাচার্য হেষ্টমুণ্ড হয়ে রথের ওপর বসে থাকলেন। আহত অশ্বগুলো রথটাকে টেনে নিয়ে যেতে চাইলে বলবান ভীম রথের চাকা জাপটে ধরল। দ্রোণের রথ আর এগোতে পারল না।

এবার দ্রোণাচার্য রথের ওপর উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'কর্ণ, কর্ণ কোথায় আছ তুমি ? আমি অস্ত্রত্যাগ করে সেনাপতির ভারমুক্ত হলাম। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যেয়ো।' তারপর গভীর কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠলেন, 'হা পুত্র, হা অশ্বত্থামা!' বলে ওপর দিকে চাইলেন দ্রোণাচার্য।

এই সময় দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন খড়্গ হাতে দ্রোণের রথের দিকে এগিয়ে গেল। লাফিয়ে রথে উঠল। মুখটি সামান্য উঁচু করে ধৃষ্টদ্যুম্নের দিকে তাকালেন আচার্য। তারপর চক্ষু নিমীলিত করলেন তিনি। বুকের ওপর দুটো হাত জড়ো করলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন আচার্যের চুল আঁকড়ে ধরে খড়্গের এক কোপে দ্রোণাচার্যের মস্তকটি ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল।

চতুর্থ দিনের সেনাপতিত্বের সময় নিহত হলেন দ্রোণাচার্য।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের চতুর্দশ দিবস অতিক্রান্ত হলো। এইদিনে কৌরবপক্ষেরই ক্ষতি হলো সবচাইতে বেশি।

দ্রোণাচার্যের হত্যার মধ্যদিয়ে কৌরবপক্ষ আবার সেনাপতিশূন্য হয়ে পড়ল।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সভায়াং প্রাহসঃ কর্ণ কু তে ধর্ম স্তদা গতঃ ?
সভায় যেদিন হাঃ হাঃ করে হেসেছিলে, সেদিন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল কর্ণ ?

দিশেহারা দুর্যোধন।

বিভ্রান্ত, ক্লিন্ন অবস্থা তার। অনেক সহোদর নিহত। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়যোদ্ধারা তার জন্য অকাতরে প্রাণ দিয়েছে। তার পক্ষের শত-সহস্র সৈন্য ক্ষয় হয়েছে। প্রাসাদাভ্যন্তরে নারীদের হাহাকার। বোন দুঃশলার দিকে তাকানো যায় না। মায়ের চোখ দিয়ে অবিরাম অশ্রু গড়াচ্ছে। যুদ্ধ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, পিছু হটার উপায় নেই। হয় জয়, না হয় মৃত্যু।

দুজন মহাবীর চলে গেছেন। পিতামহ ভীষ্ম আর আচার্য দ্রোণ ছিলেন কৌরবদের সবচাইতে বড় ভরসার স্থল। চক্রান্ত করে, মিথ্যে তথ্য প্রচারিবেশন করে অপ্রতিদ্বন্দ্বী দ্রোণকে হত্যা করিয়েছে যুধিষ্ঠির। ও নাকি ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির। প্রয়োজনে মিথ্যের বেসাতি করতে দ্বিধা করল না বেজন্মাটা। লাথি মার ওরকম ধর্মাত্মার মুখে। ওরে বেটা, যে গুরুর পায়ের কাছে বসে অস্ত্রবিদ্যা শিখেছিস, সেই গুরুর হত্যার কারণ হলি তুই ? দুরাত্মা কৃষ্ণ নিশ্চয়ই তোকে এই কথাটি শিখিয়ে দিয়েছে। বহুগামী অর্জুন নিশ্চয় তোকে প্ররোচিত করেছে। আর ওই নপুংশক নকুল-সহদেব, ওরা তো মানুষই না। আস্ত দুটো মাকাল ফল। ওই মাকাল ফল দুটোও নীরব থেকে সমর্থন দিয়েছে তোকে। কেমন করে তুই পিতার মতো দ্রোণাচার্যকে হত্যা করালি ? ও হো, তোর তো আবার পিতা নেই। বেজন্মা তোরা। অন্যের সঙ্গে সহবাস করে তোদের মা পেটে ধরেছেন তোদের। তোরা কী করে বুঝবি পিতার মূল্য ?

এরকম ভাবতে ভাবতে দুর্যোধন অশান্ত হয়ে উঠল। সে আজ নিজেকে কাণ্ডারিহীন নৌকার ওপর আবিষ্কার করল। কৌরবরা যেন কাণ্ডারিহীন জলযানের আরোহী। প্রবলস্রোতে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে কৌরব তরণীটি।

মন্ত্রণাসভায়, অন্ধকারে একা বসে ছিল দুর্যোধন। মশালচি আলো জ্বালাতে এসেছিল। দুর্যোধন বারণ করেছে। অন্ধকার কক্ষে দুর্যোধনকে একা বসে থাকতে দেখে বিস্মিত হলো কর্ণ। জিজ্ঞেস করল, 'কী মিত্র, এরকম অন্ধকার ঘরে একা বসে আছ যে ?'

নিজেকে লুকাতে চাইল দুর্যোধন। বলল, 'না, এমনি এমনি।'

বিচক্ষণ কর্ণ। সহজেই মিত্রের মনোভাব বুঝে গেল। নরম গলায় বলল, 'তোমার কষ্ট বুঝি মিত্র। যুদ্ধে বহু ক্ষতি হয়ে গেছে আমাদের। ভীষ্ম আর দ্রোণের মতো দুজন মহাবীর মারা গেছেন। দিশেহারা তুমি।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুমি যথার্থ ধরেছ মিত্র। দিশেহারা আমি। তুমিই আমার একমাত্র ভরসা, এই দুর্যোগের দিনে।'

ইত্যবসরে মশালচি কক্ষের কোণায় কোণায় আলো জ্বালিয়ে গেছে। মন্ত্রণাসভায় এক-দুজন করে আসতে শুরু করেছেন। প্রত্যেকদিন যুদ্ধশেষে, রাত্রির প্রথম প্রহরে কুরুপক্ষের মন্ত্রণাসভা বসে। সভায় সেদিনের যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি নিয়ে বিচারবিশ্লেষণ হয়। আগামী দিনের যুদ্ধপরিকল্পনা নির্ণীত হয়। আজকের মন্ত্রণাসভা ব্যতিক্রম। আজ দ্রোণাচার্য নিহত হয়েছেন। আর আজকেই প্রথম বহির্দেশীয় কিছু নরপতিকে মন্ত্রণাসভায় আহ্বান করেছে দুর্যোধন। নিষাদাধিপতি একলব্য তাদের অন্যতম।

মন্ত্রণাসভার আসন পূর্ণ হয়ে গেলে দুর্যোধন বলল, 'আমাদের পুরোধা, ভুবনখ্যাত যোদ্ধা আচার্য দ্রোণ আজ চলে গেলেন। আমরা মর্মাহত।'

অশ্বত্থামা উচ্চস্বরে বলে উঠল, 'চলে যান নি, মিথ্যে ছলনায় জড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে পিতাকে।'

'সত্যি বলেছ তুমি অশ্বত্থামা। এর প্রতিশোধ নিতে হবে। ধৃষ্টদ্যুম্নকে যমালয়ে পাঠাতে হবে।' উত্তেজিত দুঃশাসন। বড়ভাই দুর্যোধনের পাশের আসন থেকে বলে উঠল দুঃশাসন।

কর্ণ সরোষে বলল, 'ও কী প্রতিশোধ নেবে! যেখানে ওর বাপ পেরে উঠল না পাণ্ডবদের সঙ্গে, সেখানে ছেলে যাবে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে!' কথার শেষে ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল। 'প্রতিশোধ যদি নিতে হয় আমাকেই নিতে হবে। পাণ্ডবকুলের সবাইকে সরস্বতীর জলে চুবিয়ে ছাড়ব আমি।' কথা শেষ করল কর্ণ।

কর্ণের দম্ভোক্তি শুনে দ্রোণাচার্যের শ্যালক কৃপাচার্য এবং পুত্র অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। অতি প্রিয়জনকে হারিয়ে দুজনেই আজ মর্মাহত।

কর্ণের অযথা আস্ফালন দেখে কৃপাচার্য হাততালি দিয়ে উঠলেন, 'দারুণ বলেছ কর্ণ। তোমার কথা শুনে দুর্যোধন ভরসা পাবে। তবে বাছা, শুধু কথার ফুলঝুরি দিয়ে কি যুদ্ধ জয় করা যায় ? তুমি বড় যোদ্ধা— আজীবন শুনেই গেলাম, দেখতে পেলাম না কখনো। অনেকবার তো অর্জুনের সঙ্গে তোমার যুদ্ধ হয়েছে। সব যুদ্ধে তুমিই তো হেরেছ। অর্জুন ক্ষমতা দেখায় ধনুকের টঙ্কারে আর তুমি মুখে।'

কর্ণের রাগ মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। ভদ্রতাবোধও লোপ পেল তার। সগর্জনে বলল, 'আমার কথা শুনে তোমার এত খারাপ লাগছে কেন রে বামুনের বাচ্চা! যা বলেছি তা-ই করব আমি। পাণ্ডবদের হত্যা করে এই সসাগরা পৃথিবীটা দুর্যোধনের হাতে তুলে দেব আমি। আর শোনো কৃপ, তুমি অসংলগ্ন কথা বলা বন্ধ না করলে তোমার জিব কেটে নেব আমি।'

মামার অপমানে নিজেকে আর স্থির রাখতে পারল না অশ্বত্থামা। পিতৃশোকের কথা ভুলে খড়্গহস্তে কর্ণের দিকে তেড়ে গেল।

অশ্বত্থামার কাণ্ড দেখে দুর্যোধন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল। কোনো অঘটন ঘটার আগে দুজনের মাঝখানে একলব্য এসে দাঁড়াল। বলল, 'এ কী করছেন গুরুপুত্র ? নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করছেন!'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কে তুমি ? তুমি কে আমাদের মাঝখানে ? সরে দাঁড়াও সামনে থেকে। নইলে কোনো একটা অঘটন ঘটে যাবে এখন।' তারপর রোষকষায়িত চোখে অশ্বত্থামা দুর্যোধনকে বলল, 'আজকাল মন্ত্রণাসভায় বাইরের লোককেও ডাকা শুরু করেছ দেখছি দুর্যোধন।'

একলব্য দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'বাইরের লোক কাকে বলছেন ? আমি যদি বাইরের লোক হই, আপনি কোথাকার ? কুরুবংশের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কী ? আপনি, আপনার বাবা, এই কৃপাচার্য, এমনকি মহাবীর কর্ণও তো বাইরের লোক। বাইরের লোক বাইরের লোক বলে কাকে অপমান করতে চাইছেন ? আমাকে না নিজেকে ?'

অশ্বত্থামা চুপসে গেল। কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল। তারপর আগের মেজাজে বলল, 'তুমি সেই একলব্য না ? অরণ্যচারী ব্যাধসন্তান না ?'

'হ্যাঁ, আমি সেই হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য। অরণ্যচারী সাধারণ নিষাদ নই আমি, রাজপুত্র। ও হ্যাঁ, অশ্বত্থামা, আমার আর একটা পরিচয় আছে। আমি সেই একলব্য যার ডানহাতের বুড়ো আঙুল আপনার বাবা কেটে নিয়েছিলেন। গুরুদক্ষিণার কথা বলেই নিয়েছিলেন তিনি। তিনি তো আমার গুরু ছিলেন না। তারপরও আঙুলটা নির্মমভাবে...।'

একলব্যের মুখের কথা কেড়ে নিল কর্ণ, 'কাকে কী বোঝাচ্ছ একলব্য! ওরা তো একদলের। অর্জুন তার বাপের প্রিয়পাত্র ছিল, জীবন উজাড় করে সবকিছু শিখিয়ে-পড়িয়ে দিয়েছেন অর্জুনকে। আজকের যুদ্ধে সেই প্রিয়শিষ্য অর্জুন শরনিক্ষেপ করে দ্রোণের সামনে ধূম্রজাল বিস্তার না করলে, ধৃষ্টদ্যুম্নের মতো একজন সাধারণ যোদ্ধা মহারথী দ্রোণের মাথা কেটে নিতে পারত ? কখনো না। এই কথাটাই বুঝতে পারছে না বামুনের বেটারা।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে একলব্য বলল, 'আমি গুরুদেবের পাশে পাশে থেকে যুদ্ধ করছিলাম। ভীমের মিথ্যে কথা বিশ্বাস করেন নি তিনি। সত্যবাদী যুধিষ্ঠির এল, চরম মিথ্যে ভাষণ দিয়ে গুরুদেবকে হতাশাগ্রস্ত করে তুলল। আমি গলা ফাটিয়ে কত করে বললাম, বিশ্বাস করবেন না গুরুদেব। যুধিষ্ঠির মিথ্যে বলছে। আমি দেখে এসেছি অশ্বত্থামা যুদ্ধ করছেন। গুরুদেব আমার কথা বিশ্বাস করলেন না, বিশ্বাস করলেন যুধিষ্ঠিরের মিথ্যে কথাকে।'

একটু থেমে একলব্য আবার বলল, 'তার পরও আমি থেমে যাই নি। আপ্রাণ চেষ্টা করেও গুরুদেবকে রক্ষা করতে পারি নি। অর্জুনের সমভিব্যাহারে বহু শত পাণ্ডবসৈন্য আমাকে ঘিরে ধরল। আমি শরাঘাতে তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করলাম। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারলাম না। অর্জুনের তো অনেক হিংস্র অস্ত্রের অনুসন্ধান জানা। তার সঙ্গে আমি পেরে উঠব কেন ? এখন ভাবি— গুরুদেব যদি সেদিন হীনজাতের অজুহাতে আমাকে তাঁর পাঠশালা থেকে তাড়িয়ে না দিতেন, যদি আমাকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করে অস্ত্রশিক্ষা দিতেন, তাহলে আজকের যুদ্ধে অর্জুন আমার সঙ্গে পেরে উঠত না। আর আচার্য দ্রোণকে এইরকম অপমানজনকভাবে নিহত হতে হতো না।'

অশ্বত্থামা আর কৃপ নিরুত্তর রইলেন।

দুর্যোধন বলল, 'আজ শোকের দিন, দোষারোপের দিন নয়। তোমরা সবাই শান্ত হও। গুরুদেবের হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে। পাণ্ডবধারাকে এই ভূমণ্ডল থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুঃশাসন বলল, 'দাদা, কৌরবপক্ষ এখন সেনাপতিশূন্য। এই সভায় আমাদের একজন যোগ্য সেনাপতি নির্বাচন করা প্রয়োজন।'

'যথার্থ বলেছ দুঃশাসন। পরবর্তী সেনাপতি হিসেবে আমি মহাবীর কর্ণের নাম ঘোষণা করছি।'

তারপর মন্ত্রণাসভার উদ্দেশে বলল, 'আপনারা কী বলেন ?'

সবাই সমস্বরে সমর্থন জানালেও কৃপ আর অশ্বত্থামা নীরব থাকলেন। কৃপ বললেন, 'সেনাপতি নির্বাচন সঠিক হয় নি দুর্যোধন।'

চমকে কৃপের দিকে তাকাল দুর্যোধন। বলল, 'কেন ?'

'অশ্বত্থামাকেই সেনাপতি করা উচিত তোমার।'

'কেন ? অশ্বত্থামা কেন ?'

'তার যোগ্যতা ও অধিকার আছে।'

'যোগ্যতা তো কর্ণেরও আছে।'

'অধিকার নেই।'

'অধিকার নেই মানে ?'

'সূতপুত্র সে। একজন হীনজাতের সেনাপতির অধীনে তোমার সৈন্যরা যুদ্ধ করবে কি না ভেবে দেখেছ ?' বললেন কৃপাচার্য।

'আর জাতপাতের কথা তুলছেন কেন ? এই কৌরবপক্ষের সকল যোদ্ধা কি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় ? শূদ্রের সংখ্যাই তো বেশি।' দুর্যোধন বলল।

এবার অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল কর্ণ। দুর্যোধনকে উদ্দেশ করে বলল, 'তুমি ব্রাহ্মণ যোদ্ধার কথা বললে যে। ব্রাহ্মণের কাজ তো যজনযাজন আর গুরুগিরি করা। দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্যের মতো লোভী কয়েকজন বামুন জাতবৃত্তি ছেড়ে ক্ষত্রিয়বৃত্তি গ্রহণ করেছেন। তাঁদের দিয়ে গোটা সমাজকে বিচার করছ কেন ? এ দুজন এবং এই অশ্বত্থামা ছাড়া তোমার দলে তো অন্যকোনো বামুন আছে বলে আমার জানা নেই।'

কৃপাচার্য উচ্চস্বরে বললেন, 'এত বামুন বামুন করছ কেন ? এই ব্রাহ্মণই দুর্যোধনকে জয় এনে দেবে।'

তারপর দুর্যোধনকে উদ্দেশ করে বললেন, 'দুর্যোধন, তুমি অশ্বত্থামাকে সেনাপতি কোরো। শ্রেষ্ঠ বীরদের একজন এই অশ্বত্থামা, দ্রোণের প্রত্যক্ষ শিষ্য। তা ছাড়া তার ভেতরে এখন পিতৃশোকের জ্বালা। এই জ্বালা নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে পাণ্ডবশিবিরে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবে সে।'

একলব্য বলল, 'আপনি যথার্থ বলেছেন কৃপাচার্য—অশ্বত্থামা এখন শোকাহত। শোকাহতরা বিষাদগ্রস্ত থাকে, বেদনায় ম্রিয়মাণ থাকে তারা। মানসিক শৌর্য তারা হারিয়ে ফেলে। পিতা বলে কথা। গুরুভ্রাতা অশ্বত্থামা পিতাকে হারিয়ে এখন শোকে মুহ্যমান। শোকাক্রান্ত ব্যক্তি যুদ্ধে মনোনিবেশ করতে পারবেন না। তাই অশ্বত্থামাকে কয়েকদিনের


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্রামের সুযোগ দিন মান্যবর দুর্যোধন। আমার মতে কর্ণকে সেনাপতি করে যথার্থ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন আপনি।'

একলব্যের যুক্তি দুর্যোধনের মনে ধরল। সে তার সিদ্ধান্তে অটল থাকল—আগামীকাল থেকে কৌরবপক্ষে সেনাপতিত্ব করবে মহারথী কর্ণ।

পিতৃশোকতপ্ত অশ্বত্থামা দেখল— হীনবংশজাত কর্ণই তার সেনাপতিত্ব নেড়ে নিল। নিজেকে সে আর ঠিক রাখতে পারল না। কর্ণকে উদ্দেশ করে বলল, 'ওরে সারথির বেটা, হীনবংশজাত কর্ণ। তলে তলে দুর্যোধনের মন ভিজিয়ে সেনাপতিত্বটা কেড়ে নিলি তুই। সেনাপতি হওয়ার সামর্থ্য কি আমার নেই ? তোর মতো লোকের অভিশাপে আমার অস্ত্রগুলো কি নিবীর্য হয়ে গেছে ? আমি কি তোর মতো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কোনোদিন পালিয়ে এসেছি ? না তোর মতো অন্যের রথটানা সারথির ঘরে জন্মেছি ?' এই রকম মনে যা যা এল, তা-ই বলে গেল অশ্বত্থামা।

কর্ণ আর থাকতে পারল না। বলল, 'আমি সূত হই বা সূতপুত্র হই, আমার জন্মের ওপর তো আমার কোনো হাত নেই। মানুষের জন্ম তো দৈবায়ত্ত। মানুষের আসল পরিচয় তার পৌরুষে। সেই পৌরুষ আমার অধীন। পৌরুষ জাত্যাভিমানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর হ্যাঁ, তোমরা শ্রেষ্ঠজাত শ্রেষ্ঠজাত বলে বারবার অহংকার করছ, কই তোমার পিতার মতো তো আমি যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্রত্যাগ করি নি, ধৃষ্টদ্যুম্নের মতো অতি তুচ্ছ এক যোদ্ধার সামনে নিজের গলাটা বাড়িয়ে দিই নি।'

তারপর দুর্যোধনকে লক্ষ্য করে কর্ণ আরও বলল, 'অর্জুন সম্বন্ধে প্রচণ্ড দুর্বলতা ছিল দ্রোণের। জয়দ্রথ বধের সময় তিনি উদাসীন ছিলেন।'

দুর্যোধন অনুনয়-বিনয় করে উভয় পক্ষকে থামাল। মন্ত্রণাসভা শেষে সবাই যাঁর যাঁর শিবিরে ফিরে গেলেন।

কুরুশিবিরে বড় একটা বিভেদ স্পষ্ট হয়ে উঠল। একদিকে কৃপাচার্য-অশ্বত্থামা, অন্যদিকে কর্ণ-একলব্যরা। এই বিরোধ যেন ব্রাহ্মণ আর শূদ্রের। মাঝখানে কৌরবরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। কৌরবরা ক্ষত্রিয় হলেও বহু বহু বছর ধরে ব্রাহ্মণ-আশ্রিত। বিশেষ করে কুরুপ্রাসাদের সমরবিভাগ বহু বছর ধরে ব্রাহ্মণ দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। কুরুবাড়ির যা কিছু অস্ত্রজ্ঞান তার সিংহভাগই কৃপাচার্য-দ্রোণাচার্য প্রদত্ত। আজ সেই অবদানকে অস্বীকার করে দুর্যোধন শূদ্র কর্ণকে সেনাপতিত্ব দিল। ফলে ব্রাহ্মণরা চটে গেল। তাতে যুদ্ধের ফল যে খুব ভালো হবে না, তা সহজে অনুমেয়।

সূতপুত্রের কলঙ্ক, গুরু পরশুরামের অভিশাপ মাথায় নিয়ে কর্ণ সেনাপতি হলো। সে দুর্ভাগা। তখন তার কাছে দেবদত্ত কবচকুণ্ডল নেই, নেই ইন্দ্রের অমোঘশক্তি। মা কুন্তীর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—পাণ্ডব ভাইদের হত্যা করবে না সে। এত কিছুর বিরুদ্ধতা নিয়েও কর্ণের একটি মাত্র লক্ষ্য—পাণ্ডবদের হারানো, দুর্যোধনের গলায় জয়ের মালা পরিয়ে দেওয়া। দুর্যোধনকে সে বারবার বলেছে, 'ভীষ্ম আর দ্রোণের ওপর আমার কোনো দিন আস্থা ছিল না। তাঁরা দুজনেই বয়োবৃদ্ধ ছিলেন। উভয়ের বিরুদ্ধে আমার বড় অভিযোগ, তাঁরা


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাণ্ডবদের প্রতি পক্ষপাতী ছিলেন। দুর্যোধন, এখন ওসবের বালাই নেই। তুমি আমার ওপর বিশ্বাস রাখো। অতিসত্বর পাণ্ডুপুত্রদের আমি সরস্বতীজলে চুবাবো।'

দুর্যোধন কর্ণের ওপর আস্থা রেখেছে।

এরপর অনেক যুদ্ধ হলো, অনেক লোকক্ষয় হলো। দোর্দণ্ডপ্রতাপে গোটা কুরুক্ষেত্র দাপিয়ে বেড়াল কর্ণ। তারপরও ভীমের হাত থেকে প্রিয় দুঃশাসনকে বাঁচাতে পারল না কর্ণ। ভীম দুঃশাসনকে হত্যা করে প্রতিজ্ঞামতে রক্ত পান করল। এমনকি নিজের ছেলে বৃষসেনকেও বাঁচাতে পারল না কর্ণ। দুর্যোধনকে অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সে, কিন্তু অধিকাংশ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে ব্যর্থ হলো।

এইসব ব্যর্থতার মধ্যে কর্ণ আরেকটা মস্তবড় ভুল করল। সে মদ্ররাজ শল্যকে নিজের রথের সারথি নির্বাচন করল। শল্য নিঃসন্দেহে উত্তম সারথি। কিন্তু বিশ্বস্ত নয়।

পাণ্ডবপক্ষে যোগদানের উদ্দেশে স্বদেশ থেকে যাত্রা করেছিল শল্য। মধ্যপথে দুর্যোধনের আতিথেয়তায় ভুলল। সসৈন্য কুরুশিবিরে যোগ দিল সে। কিন্তু মন পড়ে থাকল—পাণ্ডবপক্ষে। আর পড়ে থাকবেই না কেন ? শল্য যে পাণ্ডু-স্ত্রী মাদ্রীর ভাই, নকুল-সহদেবের মাতুল। রক্তে তার আত্মীয়ের প্রতি অনুরাগ। তাই যুধিষ্ঠির অনুযোগ পাঠালে শল্য জানাল, 'কৌরবপক্ষের হয়ে যুদ্ধ করলেও আমি পাণ্ডবদের দলে। এখানে আমি পাণ্ডবদের হয়েই কাজ করব।'

সারথি হওয়ার পর শল্য তা-ই করল। কর্ণের কানের কাছে অবিরত অর্জুনের প্রশংসা করে গেল। সেনাপতি হওয়া থেকে পতন পর্যন্ত ক্রমাগত পাণ্ডবদের শৌর্যবীর্যের কথা বলে বলে কর্ণের মনের স্থিরতা বিনষ্ট করে দিল শল্য। ফলে অধৈর্য হয়ে উঠল কর্ণ। গভীর একটা আশঙ্কা তার মনে বাসা বাঁধল।

সেদিন প্রকৃতি বড় মুখ গোমড়া করে ছিল। হেমন্তের দিনটি আলোকিত হওয়ার কথা ছিল। শীতের কণা গায়ে মেখে মৃদু বাতাস বয়ে যাওয়ার কথা ছিল। সূর্য খুব তেজোদীপ্ত হওয়ার কথা ছিল না। আকাশে মেঘ থাকার কথা ছিল না। কিন্তু সেদিনের শেষরাতে বেশ একটু বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। রক্তমাখানো কুরুক্ষেত্রের মাটি ভিজে গিয়েছিল। অস্ত্র আর শস্ত্রের আঘাতে এবং যোদ্ধাদের দাপাদাপিতে যুদ্ধমাঠের এখানে ওখানে ছোটোবড়ো গর্ত হয়ে গিয়েছিল। রাতের বৃষ্টিতে মাঠের সেই গর্তগুলোতে জল জমে থেকেছিল। আকাশ ছিল মেঘ মেঘ। মৃদু ঝোড়ো হাওয়া বইছিল। সেই সকালে সূর্যের মুখ দেখা যায় নি। আঁধার কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধশঙ্খ বেজে উঠেছিল। ভয়াল একটা যুদ্ধ বেঁধে গিয়েছিল সেই সকালে।

পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধে নামল ভীম, অর্জুন, যুধিষ্ঠির। ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধে অংশ নিল। মামার পাশে পাশে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র। শিখণ্ডী আর সাত্যকি কৌরবনিধনে এগিয়ে এল। মহা কোলাহলের মধ্যদিয়ে যুদ্ধ বেঁধে গেল।

বীর বিক্রমে পাণ্ডব-পাঞ্চালসৈন্যের জটলার দিকে কর্ণের রথ এগিয়ে গেল। বেছে বেছে বড় বড় যোদ্ধাদের হত্যা করতে থাকল সে। তার পাশে পাশে যুদ্ধ করে যাচ্ছিল একলব্য।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নকুলকে সামনে পেয়ে সে তার ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে তীর নিক্ষেপ করে গেল। নকুল দিশেহারা হয়ে পড়ল। একলব্য তাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল। এই সময় সেখানে উপস্থিত হলো ভীম। বাহুবলে ভীম একলব্যকে প্রতিহত করতে থাকল।

সামনে যুধিষ্ঠিরকে পেয়ে কর্ণ মহাপ্রলয়ে মেতে ওঠে। ক্রোধে কম্পমান হয়ে কর্ণ একেবারে শতবাণ নিক্ষেপ করে যুধিষ্ঠিরের ওপর। ক্রোধান্বিত যুধিষ্ঠিরও দশটি বাণ ছুড়ল কর্ণের দিকে। উভয়ের মধ্যে ঘোরতর রণ শুরু হয়ে গেল। যুধিষ্ঠিরের ছোড়া বিধ্বংসী এক বাণাঘাতে কর্ণ মূর্ছা গেল। পাণ্ডবপক্ষে উল্লাসধ্বনি উঠল। চেতনা ফিরে পেয়ে ভয়ংকর হয়ে ওঠে কর্ণ। সপ্তবাণে যুধিষ্ঠিরের শরীর ক্ষতবিক্ষত করে ছাড়ল। যুধিষ্ঠিরের শরীর থেকে রক্ত ঝরতে লাগল। অবস্থা বেগতিক দেখে সেনাপতি যুধিষ্ঠির পিছু হটল। কৌরবরা ধিক্কার দিতে লাগল যুধিষ্ঠিরকে।

দূর থেকে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের পরাভব দেখতে পেলেন। দেখলেন—যুধিষ্ঠিরের পিছু পিছু পাণ্ডবসৈন্যরাও পালাচ্ছে। আর সংকট গুনলেন কৃষ্ণ। যুধিষ্ঠিরের পলায়নপরতা যদি গোটা পাণ্ডব আর পাঞ্চালসৈন্যের মধ্যে সংক্রমিত হয়, তাহলে বিপর্যয় অনিবার্য।

অর্জুনকে উদ্দেশ করে কৃষ্ণ বললেন, 'দেখো দেখো পার্থ। তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠির কর্ণহাতে পর্যুদস্ত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাচ্ছে। তার পিছু পিছু শত শত সৈন্য। এতে বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যাবে পাণ্ডবদের। যে-কোনো মূল্যে কর্ণকে রুখতে হবে।'

'আপনি দ্রুত রথ চালান। প্রথমে জ্যেষ্ঠের সামনে, তারপর কর্ণের মুখোমুখি রথ রাখেন।' অর্জুন বলল।

রথ যুধিষ্ঠিরের নিকটে গেলে উচ্চস্বরে অর্জুন বলল, 'আপনি পালাবেন না দাদা। যতই আপনি পর্যুদস্ত হোন, যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করবেন না। আপনি সেনাপতি। আপনি চলে গেলে সৈন্যদের মনোবল ভেঙে যাবে। আর কর্ণকে আমি দেখছি। তার পিতৃনাম ভুলিয়ে দেব আমি।' তারপর কৃষ্ণকে কর্ণের সামনে রথ নিয়ে যেতে বলল।

কৃষ্ণ কর্ণের সামনে অর্জুনের রথ নিয়ে গেলে উভয়ের মধ্যে ঘোরতর রণ শুরু হয়ে গেল। প্রচণ্ড শব্দে শঙ্খভেরী বেজে উঠল। শরে শরে চতুর্দিকে অন্ধকার হয়ে গেল। দশবাণে কর্ণ অর্জুনকে বিদ্ধ করল। অর্জুনও ঘুরে দাঁড়িয়ে কর্ণকে লক্ষ্য করে দশটি বাণ নিক্ষেপ করল। কিন্তু এতে কারও তেমন ক্ষতি হলো না। এরপর পরস্পরের প্রতি পরস্পর নারাচ, অর্ধচন্দ্র, ক্ষুরপাদি নানা বাণ নিক্ষেপ করল। পক্ষীর মতো ঝাঁকে ঝাঁকে তীর আকাশে উড়ল। দুজনেই ভ্রূকুটি কটাক্ষে ওইসব খরশান বাণ ধ্বংস করল।

কর্ণের বাণাঘাতে পাণ্ডবসৈন্য অস্থির হয়ে উঠল। কৃষ্ণও রেহাই পেলেন না কর্ণের অস্ত্রাঘাত থেকে। ক্রুদ্ধ অর্জুন এবার খরতর বাণ হাতে তুলে নিল। শত শত শরের আঘাতে শল্য আর কর্ণ আবৃত হলো। দ্বাদশ বাণে বিদ্ধ হলে কর্ণের শরীর থেকে রুধিরের ধারা বইতে লাগল।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই সময় ভয়ংকর এক সর্প কর্ণের তূণে শর হয়ে প্রবেশ করতে চাইল। যুদ্ধরত কর্ণ জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি ?'

সর্প বলল, 'আমি অর্জুনের যম। খাণ্ডবদহনের প্রতিশোধ নিতে এসেছি আমি। আপনি আমাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করুন। সর্পমুখ বাণ হয়ে আমি অর্জুনের বুক বিদীর্ণ করব। আপনার উদ্দেশ্য সফল হবে। আমার বুকের জ্বালা মিটবে।'

নতুন রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থে থাকাকালে একদিন কৃষ্ণ আর অর্জুন যমুনাতীরে পানভোজনে রত ছিলেন। পাশেই গহিন খাণ্ডব অরণ্য। ব্রাহ্মণবেশী অগ্নি খাণ্ডববন দগ্ধ করার জন্য অর্জুনকে অনুরোধ করেন। অর্জুন দ্বিধান্বিত হলে অগ্নি স্বরূপ ধারণ করে বলেন, দীর্ঘ বারো বছর শ্বেতকি রাজার যজ্ঞে ঘৃত পান করে করে অগ্নিমান্দ্য হয়েছে আমার। ব্রহ্মা বলেছেন, খাণ্ডববনের পশুপাখিদের মেদ ভক্ষণ করতে পারলে অজীর্ণতা চলে যাবে। এই অরণ্যটি ইন্দ্রের খুব প্রিয়। এর আগে অরণ্যটি পোড়াবার জন্য সাত সাতবার চেষ্টা করেছি আমি। প্রতিবারই ব্যর্থ হয়েছি। সহস্র সহস্র হস্তী, নাগ আর পাখি শুঁড় আর ঠোঁটে করে যমুনা থেকে জল এনে আগুন নিবিয়ে ফেলেছে। কৃষ্ণার্জুন যদি খাণ্ডবদহনে সাহায্য করেন, তাহলে অগ্নির অগ্নিমান্দ্য দূর হয়।

ইন্দ্রের বাধা সত্ত্বেও অর্জুন খাণ্ডববন দহনে সাহায্য করল। বৃক্ষাদি সকল প্রাণী আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল। অরণ্যের সমস্ত জীবের মধ্যে রক্ষা পেয়েছিল দানব, তক্ষক নাগের পুত্র অশ্বসেন আর চারটি মাত্র শার্ঙ্গব পক্ষী।

স্বজন হারানো সেই নাগপুত্র অশ্বসেন এসে আজ কর্ণকে অনুরোধ করছে তাকে তীর করে অর্জুনের প্রতি নিক্ষেপ করতে।

বিপর্যস্ত অবস্থাতেও কর্ণ ক্রোধে জ্বলে উঠল। এককালে সে দুর্যোধনের দলে মিশে ন্যায়বর্জিত অনেক কাজ করেছে, কিন্তু সেনাপতি হওয়ার পর ন্যায়বোধ তার মধ্যে সর্বদা জাগরুক থেকেছে। যুদ্ধে কারও প্রতি অন্যায়ভাবে বা যুদ্ধনিয়ম লঙ্ঘন করে শর নিক্ষেপ করে নি। নিজের বাহুবলের ওপর গভীর আস্থা কর্ণের। সে যে একজন মস্ত বড় যোদ্ধা, তা সে জানে। সমরে রত অবস্থায় কারও সহযোগিতা গ্রহণ করাকে অবমাননাকর বলে মনে করে কর্ণ।

নাগপুত্র অশ্বসেনের প্রস্তাব শুনে কর্ণ সরোষে বলল, 'কর্ণকে এত হীন যোদ্ধা মনে করলে কী করে ? তুমি কি কখনো শুনেছ কর্ণ অন্যের সাহায্যপুষ্ট হয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে ? একজন কেন, এক শ' জন অর্জুনকে মারতে পারলেও তো তোমার সাহায্য কখনো নেব না আমি। তুমি ফিরে যাও অশ্বসেন।'

অশ্বসেন নাছোড়, 'ফিরে যাওয়ার জন্য আসি নি আমি। প্রতিশোধ নিতে এসেছি। আমার জ্ঞাতিগোষ্ঠী সবাইকে নিধন করেছে এই অর্জুন। তার মৃত্যুর কারণ হতে না পারলে আমার জ্ঞাতিঋণ শোধ হবে না। আপনি আমাকে অস্ত্রমুখে স্থাপন করুন অঙ্গরাজ।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুমি কর্ণকে চেনো না নাগপুত্র। তুমি জানো না যে, পরশুরামের শিষ্য কারও করুণাপ্রার্থী হয় না।'

'করুণার কথা নয়, প্রতিশোধের কথা বলছি আমি।'

'অর্জুনকে ধরাশায়ী করাই তো তোমার আকাঙ্ক্ষা ? তুমি দূরে দাঁড়িয়ে দেখো—কীভাবে ধড় থেকে মাথাটা নামিয়ে নিচ্ছি অর্জুনের।'

এইসময় অর্জুন নিক্ষেপিত একটা শর এসে কর্ণের বাম বাহুকে বিদ্ধ করল।

একটানে শরটা তুলে দূরে ছুড়ে মারল কর্ণ। রুদ্রবাণ হাতে তুলে নিল সে। বাণে বাণ নিবারণ করল অর্জুন। এরপর বাণে বাণে আকাশ ছেয়ে গেল। ধনুকের টঙ্কারে সবার কর্ণ বধির হওয়ার উপক্রম হলো। মরণপণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো দুই মহাবীর।

দিব্য অস্ত্র হাতে নিল কর্ণ। এই অস্ত্র অমোঘ। লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করবেই। কৃষ্ণ প্রমাদ গুনলেন। রথের গতি দ্রুত করলেন। দিব্য অস্ত্র নিক্ষেপের মুহূর্তকাল আগে অর্জুনের রথচক্র জলভর্তি গর্তে পড়ে গেল। মাটির গর্তে রথটি বেশটুকু দেবে গেল। অর্জুনের ঠিক মাথার ওপর দিয়ে কর্ণের ছোড়া দিব্যাস্ত্রটি উড়ে গেল। কিন্তু লক্ষ্যভেদ না করে গেল না অস্ত্রটি। রথটি দেবে যাওয়ায় অর্জুনের শরীরটাও নিচের দিকে নেমে গেছে সামান্য। দিব্যাস্ত্রটি অর্জুনের গলায় আঘাত না করে মুকুটে আঘাত করল। অস্ত্রাঘাতে খণ্ডিত অর্জুনের কিরীটটি রথের মধ্যেই পড়ল। প্রাণে বেঁচে গেল অর্জুন।

দ্রুত রথ থেকে নেমে গর্ত থেকে রথচক্রকে টেনে তুলতে লাগলেন কৃষ্ণ আর অর্জুন। তাঁদের দুরবস্থা দেখে হা হা করে হেসে উঠল কর্ণ। তখন তার ধনুকে অগ্নিবাণ জোড়া। চিৎকার করে বলল, 'ওরে বহুগামী নরাধম অর্জুন, চাইলে এখনই তোকে যমালয়ে পাঠাতে পারি আমি। কিন্তু অসহায় বিপদগ্রস্তকে আঘাত করা কাপুরুষতা। তোর রথ মাটিতে দেবে গেছে বলে তুই বেঁচে গেলি এইবার। দেখ চেষ্টা করে রথটাকে টেনে তুলতে পারিস কি না। বিপদমুক্ত হলেই যুদ্ধে নামব আবার। এই আমার ধনুকে অগ্নিবাণ জোড়া রইল।' বলে অপেক্ষা করতে থাকল কর্ণ।

এইসময় কোথা থেকে রথ ছুটিয়ে এল একলব্য। চিৎকার করে বলল, 'অঙ্গরাজ, ভুল করবেন না। আঘাত করুন অমানুষ অর্জুনকে। আর ওই যে কৃষ্ণ, তাঁর মতো কুচক্রী নেই এই ভূমণ্ডলে। তাঁকেও ধরাশায়ী করুন। ওদের ধ্বংস করার এই-ই সুবর্ণ সুযোগ।'

কর্ণ বলল, 'আমি কাপুরুষ নই একলব্য। অস্ত্রহীন অসহায়কে আমি আঘাত করি না।'

'ভুল করছেন মহাবীর কর্ণ। এইসময় যদি অস্ত্রাঘাতে ওদের ধরাশায়ী না করেন, তবে অনেক বড় মূল্য দিতে হবে আপনাকে।'

'তুমি কথা থামাও একলব্য। অন্যায়ের পথে প্ররোচিত কোরো না আমাকে।'

'এ অন্যায় নয় মহারাজ। এ যুদ্ধের নিয়ম। শত্রুকে কোনো অবস্থাতেই ছেড়ে দিতে নেই।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এই নিয়ম আমি মানি না। যুদ্ধ হবে সমানে সমানে। অসহায় ব্যক্তি কখনো কর্ণের প্রতিপক্ষ হতে পারে না। আমি এই মুহূর্তে কৃষ্ণার্জুনকে আঘাত করব না।'

অসহায় ভঙ্গিতে একলব্য আবার বলে উঠল, 'তার জন্য অনেক মূল্য গুনতে হবে আপনাকে।'

ঠিক এই সময়ে অর্জুনের অগ্নিবাণ গোটা আকাশকে দগ্ধ করতে করতে কর্ণের দিকে ধেয়ে এল। কর্ণের অস্ত্রবিরতি সময়ে কৃষ্ণার্জুন শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে গর্ত থেকে নিজেদের রথকে টেনে তুলেছেন।

অগ্নিবাণ দেখে কর্ণ বরুণ বাণ ছুড়ল। ঝপঝপিয়ে বৃষ্টি এসে অগ্নিবাণকে অকেজো করে দিল। বায়ুবাণে মেঘ ও বৃষ্টিকে ঝেঁটিয়ে তাড়াল অর্জুন।

এইভাবে যুদ্ধ চলল কর্ণ-অর্জুনে, যুদ্ধ চলল পাণ্ডব-কৌরবের রথী মহারথীতে। মারা যেতে লাগল শত শত সৈন্য। গোটা কুরুক্ষেত্র রক্তে স্নাত হতে থাকল। একলব্য কর্ণের পাশে পাশে থেকে যুদ্ধ করে যেতে লাগল। কর্ণ আজ পণ করেছে—যেভাবেই হোক, অর্জুনকে শেষ করবে। অর্জুনেরও একই প্রতিজ্ঞা—এই পৃথিবী কর্ণশূন্য করে ছাড়বে আজ। শল্য আর কৃষ্ণ সমরক্ষেত্রের এদিক থেকে ওদিক রথ ছুটিয়ে বেড়াতে লাগলেন। শত সহস্র বাণে প্রতিপক্ষের সৈন্যসামন্তকে হত্যা করে যেতে লাগল দুই মহাবীর।

শল্য হঠাৎ এমন পথ দিয়ে রথ চালাল, যে পথ এবড়োখেবড়ো। ভূমি সমতল নয়। এখানে ওখানে গর্ত। সেই গর্তে জল জমে আছে। শুষ্ক মাটি জলস্পর্শে নরম হয়ে গেছে। হঠাৎ সেই নরম মাটির গর্তে কর্ণের রথটি আটকে গেল। বাম দিকের পেছনের চাকাটি জলভর্তি কাদামাটির গর্তে দেবে গেল। যেমন করে দেবে গিয়েছিল অর্জুনের রথ। শল্য দ্রুত রথ থেকে নেমে চাকার দিকে এগিয়ে গেল। অনেক ঠেলাঠেলির পরও রথচক্রটি গর্ত থেকে উঠল না।

কর্ণ রথ থেকে নেমে চক্রের দিকে যেতে উদ্যোগ নিল। ওই সময় সেখানে উপস্থিত হলো অর্জুনের রথ। কৃষ্ণ উল্লসিত কণ্ঠে বললেন, 'এই সুবর্ণ সুযোগ। হত্যা কোরো অর্জুন, এই সুযোগে কর্ণকে হত্যা কোরো।'

'তা কী করে হয় ? অসহায় অবস্থায় কর্ণকে বধ করব কেন ?' হতভম্ব গলায় অর্জুন বলল।

'এটাই নিয়ম।' ধমকের সুরে কৃষ্ণ বললেন।

'কর্ণ তো এই নিয়ম মানে নি। সুযোগ পেয়েও সে আমাকে হত্যা করে নি।'

'ও করে নি বলে তুমি করবে না কেন ? ওর নাম দানবীর কর্ণ, তোমার নামের আগে তো কোনো অভিধা নেই। কালক্ষেপণ কোরো না অর্জুন। অস্ত্র ধরো।'

কৃষ্ণের ধমকে অর্জুন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। কী করবে বুঝে উঠতে পারছিল না সে। ধর্মের পথে স্থির থাকবে, না ধর্মের ধ্বজা বহনকারী কৃষ্ণের প্ররোচনায় অন্যায়ভাবে কর্ণকে হত্যা করবে ?


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই সময় কৃষ্ণ আবার গর্জে উঠলেন, 'তুমি কি কৌরবদের ধ্বংস চাও না অর্জুন ? নিজেদের জয় চাও না ? তোমাদের জয়ের পথের প্রধান অন্তরায় এই কর্ণ। তাকে সরাতে পারলে তোমাদের জয়ের পথ কন্টকমুক্ত হবে। হস্তিনাপুরের সিংহাসনে বসবে যুধিষ্ঠির। দেশে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হবে। দিকে দিকে পাণ্ডবদের জয়গান হতে থাকবে।'

সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হয়ে গেল অর্জুন। অন্যায় দিয়ে কী করে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হবে, তা জিজ্ঞেস করার চেতনা হারিয়ে ফেলল সে। যে কর্ণ সুযোগ পেয়েও তাঁদের হত্যা করে নি, সেই কর্ণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার মধ্যে কোনো বীরত্ব আছে কি না, তাও জিজ্ঞেস করার স্পৃহা হারিয়ে ফেলল অর্জুন। তার কানে শুধু ধাক্কা মারতে লাগল কৃষ্ণের বজ্রকঠিন শব্দনিচয়—হত্যা কোরো অর্জুন, কর্ণকে হত্যা কোরো।

অর্জুন হাতে অস্ত্র তুলে নিল। অর্জুনের প্রতি দৃষ্টি গেল কর্ণের। কর্ণ বলল, 'এখন আমি নিরস্ত্র। আমার রথ আটকে গেছে, যেমন করে আটকে গিয়েছিল তোমারটা। রথচক্রকে টেনে তুলি আগে। তারপর দুজনে যুদ্ধ হবে।'

কানের কাছে চিৎকার করে উঠলেন কৃষ্ণ, 'দুরাচারী কর্ণের কথা শুনো না তুমি অর্জুন। আঘাত কোরো ওকে।'

কৃষ্ণের কথা কর্ণের কানে গেল। কর্ণ বলল, 'তুমি ওর কথায় কান দিয়ো না অর্জুন। ধর্মকে ভয় কোরো। যুদ্ধেরও একটা নিয়ম আছে। এই নিয়মকে ধর্ম বলে। অসহায় নিরস্ত্রকে আঘাত করা যুদ্ধধর্ম নয়। কূটবুদ্ধি কৃষ্ণের প্ররোচনায় তুমি ধর্মচ্যুত হয়ো না।'

রথচক্রের দিকে দৃঢ় পায়ে কয়েক কদম এগিয়ে গেল কর্ণ। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে অর্জুনের দিকে তাকাল। বলল, 'দৈববলে এই মুহূর্তে আমার রথের চাকা মাটিতে আটকে গেছে। অন্তত এই সময়টায় তুমি ধনুকে বাণ যোজনা কোরো না।' বড় করুণ শোনাল কর্ণের কণ্ঠ।

কৃষ্ণ কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন। অর্জুনের হয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'দুষ্টমতী লোকেরা যখন বিপদগ্রস্ত হয়, তখন দৈবের দোহাই দেয়। অতীতের কুকর্মের কথা স্মরণে আনতে চায় না তারা। তুমি দুরাচারী।'

'তুমিও কি কম দুরাচারী কৃষ্ণ ? তুমি কৃষ্ণই তো প্রতিজ্ঞা করেছিলে, এই যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে না। রেখেছ কি সেই প্রতিজ্ঞা ? কতবার চক্রহাতে যুদ্ধে নেমেছ, স্মরণ কোরো তো কৃষ্ণ। তোমার কাছে প্রতিজ্ঞার কোনো বালাই আছে ? প্রচার কোরো—তুমি ন্যায়ের, ধর্মের ধ্বজাধারী, কার্যত তুমি ধর্মলঙ্ঘনকারী।' সরোষে কর্ণ বলল।

কৃষ্ণ এবার হো হো করে হেসে উঠলেন। শ্লেষ মিশিয়ে ব্যঙ্গস্বরে কৃষ্ণ বলতে থাকলেন, 'তুমি কর্ণ ধর্মের দোহাই দিচ্ছ! হাসালে তুমি আমায়। যেদিন দ্রৌপদীকে চুলের মুঠি ধরে কুরুসভায় টেনেহিঁচড়ে আনিয়েছিলে, সেদিন তোমার ধর্মবোধ কোথায় ছিল ? যেদিন শকুনির মাধ্যমে পাশা খেলিয়ে দুর্যোধনকে দিয়ে পাণ্ডবদের সর্বস্ব কেড়ে নিলে, সেদিন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল ? তেরো বছর বনবাসে আর অজ্ঞাতবাসে কাটিয়ে যুধিষ্ঠিররা যখন মাত্র পাঁচখানি গ্রাম চেয়েছিল তোমার মিত্র দুর্যোধনের কাছে, সেদিন তোমার ধর্মবিবেক


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোথায় ছিল ? যেদিন বারণাবতে পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার ষড়যন্ত্র করলে, যেদিন রজস্বলা পাণ্ডববধূকে দুঃশাসনের হাতে ছেড়ে দিয়ে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠেছিলে, সেদিন তোমার ধর্ম কোথায় মুখ লুকিয়ে থেকেছিল কর্ণ ? বিপদে পড়ে এখন ধর্ম ধর্ম করছো দুরাত্মা। আজ তোমার রেহাই নেই। তোমাকে যমালয়ে যেতেই হবে।'

তারপর অর্জুনের দিকে মুখ ফেরালেন কৃষ্ণ। বললেন, 'আর বিলম্ব কোরো না অর্জুন। আঘাত কোরো। আঘাতে আঘাতে বিনাশ কোরো দুরাচারীকে।'

কর্ণ কৃষ্ণের কথায় কর্ণপাত না করে দেবে-যাওয়া রথচক্রের দিকে এগিয়ে গেল। ভরসা ছিল— যে অর্জুনকে একই অবস্থায় পেয়েও নিরস্ত্র আর অসহায় ভেবে আঘাত করে নি, সেই অর্জুন কখনো অস্ত্রবিযুক্ত কর্ণকে আঘাত করবে না। অন্তত রথোত্তোলনের সময় দেবে।

কিন্তু অর্জুন কর্ণকে সেই সময় দিল না। অসি হস্তে ধেয়ে এল কর্ণের দিকে। কর্ণ তখন ঘাড় নিচু করে রথ ঠেলছিল। কালবিলম্ব না করে ঘাড় বরাবর কোপ মারল অর্জুন। কর্ণের ছিন্ন মুণ্ডটি মাটিতে ঝপ করে পড়ে গেল।

যুদ্ধ শেষের অপরাহ্নে কর্ণের মস্তকবিচ্ছিন্ন ধরটি ধূলিতে পড়ে থাকল। ছিন্ন মুণ্ডটি মাটিতে গড়াগড়ি যেতে লাগল। কর্ণের শরীরে বিকেল-সূর্য সহস্রধারায় রশ্মি ছড়িয়ে যেতে লাগল।

কর্ণের মৃত্যুর মধ্যদিয়ে কৌরবদের অহংকার আর জয়াশা একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। কুরুপ্রাসাদে হাহাকার উঠল। সকল সহোদরকে হারিয়ে দুর্যোধন পাগলপ্রায় হয়ে গেল।

এরপর মদ্ররাজ শল্য কৌরব-সেনাপতি হলো, কিন্তু অতি সহজেই তার পতন হলো। অশ্বত্থামা, কৃপাচার্যদের দিয়ে কোনোরকমে এক-দুই দিন যুদ্ধ চলল। কিন্তু সেই যুদ্ধ হলো একতরফা। পাণ্ডবসৈন্যদের সঙ্গে এঁটে উঠল না কৌরবপক্ষ।

আঠারো দিনের সায়াহ্নে পাণ্ডবদের জয় ঘোষিত হলো। মৃত যারা, তাদের দেহ শিয়ালে-শকুনে খেতে লাগল। আহত যারা, রণক্ষেত্রে পড়ে পড়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করত লাগল। অনাহত যারা রাত্রির অন্ধকারে চুপিসারে স্বদেশের উদ্দেশে রওনা দিল।

সামান্য কিছু সৈন্য সঙ্গে নিয়ে একলব্য স্বদেশের পথ ধরল।

দুর্যোধন কৌরবশিবির থেকে পালাল। দ্বৈপায়ন হ্রদে আশ্রয় নিল। পরে ধরা পড়ে ভীমের হাতে নিধন হলো।

গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে যুধিষ্ঠিরের ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলো।

যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে বসিয়ে আপন রাজধানী দ্বারকায় ফিরে গেলেন কৃষ্ণ।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘোর তমসাচ্ছন্ন রাত্রি। উছলিত আলোর ইশারা।

একলব্যের অন্তরে প্রবল প্রদাহ।

মনের ভেতর রক্তক্ষরণ চলছে অবিরাম। কিছুতেই সুখ পাচ্ছে না, কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছে না সে। শুধু অবিরত উচাটন। গ্লানিযুক্ত অতীত তাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। স্ত্রী-সান্নিধ্য তার ভালো লাগছে না। মাতা-পিতার স্নেহাতিশয্য তার বিরক্ত লাগছে। রাজ্য পরিচালনায় আগের মতো তৃপ্তি পাচ্ছে না। মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, রাজন্যদের আনুগত্য তার মধ্যে কোনো স্বস্তির জায়গা তৈরি করছে না। তার মনে বারবার হানা দিচ্ছে—মহাবীর কর্ণের নির্মম হত্যাদৃশ্য। কুরুক্ষেত্রের লক্ষ কণ্ঠের যন্ত্রণাদগ্ধ হাহাকার তার কানে ইন্দ্রের বজ্রের মতো বাজছে। এত রক্ত! দিগন্তবিস্তৃত বিশাল রণক্ষেত্রের প্রতিটি ইঞ্চিতে রক্তবিন্দু। এখানে ওখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মানুষের ছিন্নভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তাদের নাড়িভুঁড়ি, তাদের চূর্ণ মস্তক, তাদের উৎপাটিত চক্ষুগোলক তাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। এক মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করতে পারছে না একলব্য। চোখ বন্ধ করলেই দুর্যোধনের আর্তনাদ কানে ভেসে আসছে, দুচোখ জুড়ে ভেসে উঠছে মহারথী কর্ণের অসহায় চোখের খণ্ডিত মস্তকটি। সেই কাটা মুণ্ডটির পাশে ধড়টি কাদায় মাখামাখি, রত্নখচিত কিরীটটি একটু দূরে উল্টে পড়ে আছে। এইসব দৃশ্য যখন চোখে ভেসে ওঠে, দিশেহারা হয়ে পড়ে একলব্য। এই রাজত্ব এই সংসার অর্থহীন ঠেকে তার কাছে।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে, দশ দিন দশ রাত্রি দুর্গম পথ অতিক্রম করে নিজ রাজধানীতে এসে পৌঁছেছিল একলব্য। সঙ্গে যুদ্ধক্লান্ত ও যুদ্ধাহত কিছু সৈন্য। বিপুল সৈন্যসম্ভার নিয়ে কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল সে। নিষাদরা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। গোটা কুরুক্ষেত্র দাপিয়ে বেড়িয়েছে নিষাদসৈন্যরা। বিপুল বিক্রমে শত্রুপক্ষকে নিধন করেছে। কিন্তু যেদিন কর্ণের মৃত্যু হলো, সেদিনই পাণ্ডব-পাঞ্চালসৈন্যের হাতে নিষাদসৈন্যের বড় একটা অংশ আহত-নিহত হলো।

কর্ণের মৃত্যুতে এমনিতেই ভেঙে পড়েছিল একলব্য, নিষাদসৈন্য ক্ষয়ের সংবাদ পেয়ে বিচলিত হয়ে উঠল সে। সে বুঝল, কর্ণের পরে কৌরবপক্ষে আর তেমন সেনাপতি নেই, যিনি জয় এনে দিতে পারেন। সে আরও বুঝতে পারল—দুর্যোধনের ধ্বংস অনিবার্য। এর পরে যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে থাকলে পাণ্ডবরা চিবিয়ে খাবে তাকে। সে ঠিক করল—যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করবে। আশপাশে যা কিছু সৈন্য ছিল, তাদের নিয়ে রাতের আঁধারে নিজ রাজধানীর দিকে রওনা দিয়েছিল সে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবা হিরণ্যধনুর হাতে রাজ্যপরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে কুরুক্ষেত্রে গিয়েছিল একলব্য। রাজ্যব্যবস্থা অক্ষুণ্ন ছিল। অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত শরীর নিয়েই ফিরেছিল একলব্য। প্রধান কবিরাজের চিকিৎসায় কয়েকদিনের মধ্যে সেরে উঠেছিল সে। তারপর রাজকার্যে মনোনিবেশ করেছিল। কিন্তু স্থিরচিত্তে আগের মতো রাজ্যশাসন করতে পারছিল না একলব্য। যুদ্ধদিনের রক্তস্নাত স্মৃতি বারবার তাকে আবৃত করছিল।

প্রতিশোধ নেওয়ার ক্রোধে এবং ঋণশোধের বাসনায় কুরুক্ষেত্রের সমরে যোগদান করেছিল একলব্য। অর্জুনের প্রতি তার দুর্দমনীয় ক্রোধ ছিল আর দ্রোণের প্রতি ছিল প্রচণ্ড ঘৃণা। অর্জুনের হত্যা আর দ্রোণাচার্যের ধ্বংস কামনায় সে সর্বদা উন্মুখ ছিল। কর্ণের প্রতি ছিল তার অশেষ ঋণ। স্বার্থান্ধ অর্জুনের প্ররোচনায় দ্রোণ যখন গুরুদক্ষিণা হিসেবে তার ডানহাতের বুড়ো আঙুলটি কর্তন করালেন, আঙুলের দিকে মুহূর্তমাত্র না তাকিয়ে ব্রাহ্মণটি আর ক্ষত্রিয়টি যখন তার পর্ণকুটিরের আঙিনাটি ত্যাগ করে গেলেন, যখন অসহায় সে রক্তাক্ত কাটা আঙুলটির দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে ছিল, তখন এই কর্ণই এগিয়ে এসেছিলেন। পরমাত্মীয়ের মতো তার শুশ্রূষা করেছিলেন, বেঁচে থাকার প্রেরণা জুগিয়েছিলেন এই মহাবীর কর্ণ। যুদ্ধে কি কর্ণের সেই ঋণ শোধ করতে পেরেছে ? যদি পেরে থাকে তাহলে অনেকটা তার চোখের সামনেই অর্জুন কর্ণকে নিধন করে কী করে ? দূর থেকে নির্মম সেই হত্যাদৃশ্যটি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা ছাড়া কোনো গত্যন্তর ছিল না তার।

কর্ণ যখন মাটিতে আটকে যাওয়া তার রথের চাকা ঠেলে তুলতে চাইছে, যুদ্ধ করতে করতে দূর থেকে দেখতে পেয়েছিল একলব্য। প্রথমে ভেবেছিল কর্ণের মতো মহাশক্তিধর অতি সহজেই রথচক্রটি টেনে তুলতে পারবেন। এরকম তো কতই হয় যুদ্ধক্ষেত্রে—রথ আটকে যাওয়া, রথধ্বজা ভেঙে পড়া, ঘোড়ার লাগাম ছিঁড়ে যাওয়া, কোনো একটি ঘোড়া আহত হওয়া। এসব সমস্যা সারথি আর রথারোহী যোদ্ধাটি মিলে সমাধান করে। কর্ণের ক্ষেত্রেও তা-ই ভেবেছিল একলব্য। ভেবেছিল—মহাবীরদের পরাজয় অসহায়ভাবে হয় না। কর্ণ রথসমস্যা মিটিয়ে আবার যুদ্ধমগ্ন হবেন। ভাবতে ভাবতে প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল একলব্য।

কিন্তু মন বুঝ মানছিল না। কর্ণ রথচক্রটি মাটি থেকে তুলতে পেরেছেন তো ? তিনি পুনরায় যুদ্ধলগ্ন হয়েছেন তো ? ভাবতে ভাবতে আবার তাকিয়েছিল একলব্য। দেখেছিল—অসি হস্তে অর্জুন হাঁটুগেঁড়ে বসা কর্ণের দিকে ধেয়ে যাচ্ছে। বুকটা ধড়ফড় করে উঠেছিল তার। একী! এ তো নিধন-ইচ্ছু অর্জুন। তার দ্রুত পদক্ষেপ, তার দেহভঙ্গি তো তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। রক্ষা করতে হবে, যে করেই হোক কর্ণকে অর্জুনের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। সারথিকে সেদিকে দ্রুত রথ চালাতে বলেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য একলব্যের। কর্ণের কাছে পৌঁছানোর আগেই অর্জুন মুণ্ড বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল কর্ণের। সে যখন রথের কাছে পৌঁছেছিল, কাটা মুণ্ড থেকে গর গর শব্দ বেরোচ্ছিল।

কর্ণকে হত্যা করে মুহূর্তকাল সেখানে অপেক্ষা করে নি অর্জুন। লাফ দিয়ে রথে চড়ে বসেছিল। দ্রুতবেগে রথ চালিয়ে দিয়েছিলেন কৃষ্ণ। শোক কাটিয়ে একলব্য যখন হাতে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তীর-ধনুক তুলে নিয়েছিল, তখন অর্জুনের রথ চোখের আড়ালে চলে গেছে। ছিন্নমস্তক কর্ণের ধড়ের পাশে হাঁটু গেঁড়ে বসে অঝোর ধারায় কেঁদে গিয়েছিল একলব্য।

আর অর্জুন-দ্রোণাচার্য হত্যা ? তা-ও তো করতে পারে নি একলব্য ? এই প্রতিজ্ঞা নিয়েই তো সে কুরুক্ষেত্রে গিয়েছিল। দ্রোণার্জুন-শূন্য করবে এই পৃথিবীকে। কিন্তু পারল কোথায় ? দ্রোণ নিহত হয়েছেন বটে, কিন্তু এই হত্যায় তার তো কোনো প্রত্যক্ষ অবদান ছিল না। পরোক্ষভাবে অর্জুনই হত্যা করেছে তাঁকে। হত্যার আগে অর্জুন শরাচ্ছন্ন করে ফেলেছিল চারদিক, শরাঘাতে শয়ে শয়ে কৌরবসৈন্য নিহত হয়েছিল। দ্রোণাচার্যকে ঘিরে থাকা কৌরবসৈন্যরা যে যেদিকে পেরেছিল, পালিয়ে বেঁচেছিল। তার ফলেই তো খড়্গহস্তে দ্রোণাচার্যের দিকে তেড়ে যেতে সাহস দেখিয়েছিল ধৃষ্টদ্যুম্ন। অর্জুনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতার কারণেই তো ধৃষ্টদ্যুম্ন আচার্যের ধড় থেকে মস্তকটি আলাদা করে ফেলেছিল। নিয়তির কী নির্মম পরিহাস। যে অর্জুনকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা হিসেবে তৈরি করবার জন্য সর্ববিদ্যা বিলিয়ে দিয়েছিলেন যিনি, তার আঙুল কেটে নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি যে দ্রোণ, সেই দ্রোণহত্যার নিমিত্ত হলো অর্জুন।

দুজন শত্রুর একজন নিহত হয়েছেন, আর অন্যজন ? অন্যজন তো দিব্যি বেঁচে থাকল! কী করে সে বেঁচে থাকতে পারল ? পারল শুধু কূটবুদ্ধি কৃষ্ণের জন্য। এই আঠারো দিনের যুদ্ধে অনেকবার পরাজয়ের মুখোমুখি হয়েছে অর্জুন। তার জীবনসংশয় হয়েছে। কিন্তু প্রতিবারই প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী কৃষ্ণ সামনে এগিয়ে এসেছেন। কখনো কূটকৌশলে, কখনো সুদর্শনচক্র ব্যবহার করে অর্জুনকে রক্ষা করেছেন কৃষ্ণ। যদি তিনি অর্জুনকে আড়াল না করতেন, তাহলে অনেকবার মরতে হতো অর্জুনকে। ওই কৃষ্ণই কৌরবপক্ষের সকল অনিষ্টের মূল।

একলব্যের সমস্ত ক্রোধ কৃষ্ণের ওপর গিয়ে পড়ল। এর প্রতিবিধান করতে হবে, কৃষ্ণের অপকর্মের প্রতিশোধ নিতে হবে। কৃষ্ণকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে পারলেই তার মনে স্বস্তি আর আনন্দ ফিরে আসবে।

বেশ কিছু বছর ধরে সৈন্য জোগাড় করল একলব্য। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করল তার সৈন্যবাহিনীকে। তারপর একদিন দ্বারকা আক্রমণ করে বসল একলব্য।

কৃষ্ণের তখন শ্রমক্লান্ত দেহ, মনও বিপর্যস্ত। একজন নারী আর একখণ্ড ভূমির জন্য কী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধটাই না হয়ে গেল! ভাই ভাইকে মারল, আত্মীয় আত্মীয়কে হত্যা করল। গোটা হস্তিনাপুর, শুধু হস্তিনাপুর কেন, গোটা ভারতবর্ষের আকাশবাতাস স্বজন হারানোর হাহাকারে ভরে গেল।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শুধু তো পাণ্ডব আর কৌরবরা অংশগ্রহণ করে নি, ভারতবর্ষের প্রায় সকল দেশের রাজারা অংশগ্রহণ করেছিলেন এই যুদ্ধে। ফলে কুরুক্ষেত্র নামক সামান্য



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা যুদ্ধমাঠ থেকে হত্যার সঘন চিৎকার ভারতের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছিল। আঠারো অক্ষৌহিণী মানুষের হত্যার মধ্যদিয়ে পাণ্ডবদের জয় এল বটে, সেই জয়ের স্বাদ কি যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব নিতে পারছে ?

তারপরও এই যুদ্ধ ছিল অনিবার্য। নারী লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নেবে না পাণ্ডবরা ? তাদের স্ত্রী দ্রৌপদীকে রাজসভায় প্রায় বিবস্ত্র করে দুর্যোধন-কর্ণরা। তাদেরকে কি এমনি এমনি ছেড়ে দেওয়া উচিত ? পাঁচখানি গ্রাম চেয়েছিল পাণ্ডবরা, তাও দেয় নি দুর্যোধন-প্ররোচিত ধৃতরাষ্ট্র। একই বংশজাত হয়ে রাজ্যাধিকার পাবে না পাণ্ডুপুত্ররা ?

আর দ্রুপদ কি তাঁর অপমানের প্রতিশোধ নেবেন না ? এই প্রতিশোধ নিতে গিয়েই তো দ্রোণহত্যা হলো। হ্যাঁ, মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে এই হত্যায়। যুধিষ্ঠির মিথ্যে বলে যুদ্ধরত দ্রোণাচার্যকে হতবুদ্ধি করেছে। এ তো স্বাভাবিক। যুদ্ধক্ষেত্রে তো এরকম একটু-আধটু করতেই হয়। আর কর্ণের তো মৃত্যুই প্রাপ্য। দুর্যোধন-দুঃশাসনাদির হত্যা তাদের কৃতকর্মের ফল।

তারপরও কেন জানি গোটা যুদ্ধ প্রক্রিয়া আর পরিণতির বিষয়ে চিন্তা করলে কৃষ্ণের মন বিব্রত-বিচলিত হয়ে পড়ে।

একলব্যের কথা কোনোদিন তেমন করে ভাবেন নি কৃষ্ণ। একলব্য একদা জরাসন্ধ-শিশুপালদের বন্ধু ছিল। কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে একদা জরাসন্ধদের সঙ্গে অংশগ্রহণও করেছিল। দাদা বলরাম তো তাকে খেদিয়ে দিয়েছিল এই দ্বারকা থেকে। ও হ্যাঁ, একবার-দুইবার কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে একলব্যের সঙ্গে দেখা হয়েছে তাঁর। অর্জুনের সঙ্গে ছোটোখাটো যুদ্ধও হয়েছে। কর্ণের হত্যার দিন দূর থেকে ধেয়ে আসতে দেখেছিলেন একলব্যকে। কর্ণহত্যা শেষে দুর্বার গতিতে রথ চালিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। একলব্যের পরবর্তী কর্মকাণ্ড দেখার সুযোগ হয় নি তাঁর।

যুদ্ধশেষে পাণ্ডবরা অবশ্য বিজিত কৌরবপক্ষের খোঁজখবর নিয়েছিল। আহত-জীবিত বেশ কিছু কৌরবসৈন্য বন্দি হয়েছিল, কিছু নামি-অনামি নৃপতি যুধিষ্ঠিরের সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসে প্রাণভিক্ষা চেয়েছিল। যুধিষ্ঠির অবশ্য বন্দি সবাইকে মুক্তি দিয়েছিল। সেদিন একলব্য ওই বন্দিরাজাদের মধ্যে ছিল না। জানা গিয়েছিল— সসৈন্যে পালিয়েছে সে। পাণ্ডবরা যুদ্ধজয়ের আনন্দে মেতে উঠেছিল। একলব্যের সন্ধান করা হয় নি আর!

সেই একলব্য আজ তাঁর রাজধানী দ্বারকা আক্রমণ করেছে, ভাবতে বিস্ময় লাগে। কোথাকার সামান্য একজন নিষাদরাজা, সে করল দ্বারকা আক্রমণ! এই আক্রমণের উচিত মূল্য দিতে হবে একলব্যকে।

যাদবসৈন্যদের যুদ্ধসাজে সজ্জিত হওয়ার আদেশ দিলেন কৃষ্ণ। এবার আর কারও সারথি নয়, নিজ হাতে অস্ত্র তুলে নিতে হবে। নিষাদদের ধ্বংস করে ছাড়তে হবে।

উভয়পক্ষে দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ চলল। প্রতাপী একলব্যকে হারানো সহজ নয়। কৃষ্ণের সকল কূটকৌশল একলব্যের সমরবিদ্যার কাছে ভেস্তে গেল।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃষ্ণ তাঁর সৈন্যদের উৎসাহ দিতে লাগলেন, 'এই যুদ্ধে হারলে চলবে না। কোথাকার কোন হীনবংশজাত একলব্য আমাদের মাতৃভূমি আক্রমণ করেছে। প্রাণ দিয়ে হলেও মাতৃভূমি দ্বারকার পবিত্রতা রক্ষা করতে হবে। আমরা পরাজিত হলে নিষাদদের কদাকার পদভারে এই পবিত্র ভূমি কলঙ্কিত হবে। যুদ্ধ কোরো তোমরা, প্রাণপণ যুদ্ধ কোরো।'

কৃষ্ণের এই ভাষণ সৈন্যদের মধ্যে প্রেরণা জোগাল। বীরবিক্রমে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল নিষাদসৈন্যের ওপর। একদিকে কৃষ্ণের অনুপ্রেরণামূলক ভাষণ, অন্যদিকে দেশপ্রেমবোধ যাদবসৈন্যদের অপ্রতিরোধ্য করে তুলল। কুরুক্ষেত্রের এই সেদিনের যুদ্ধজয় কৃষ্ণ এবং তাঁর সৈন্যদের মধ্যে বিপুল যুদ্ধ জয়াকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলল। তাদের দাপটে একটা সময়ে একলব্য-সৈন্যরা ছত্রখান হয়ে গেল।

কৃষ্ণের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে এঁটে উঠতে না পেরে পিছু হটল একলব্য। কৃষ্ণ তাকে দ্বারকা নগরীর প্রান্তবর্তী সমুদ্রপাড় পর্যন্ত ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেলেন। কৃষ্ণতাড়িত নিরুপায় একলব্য সমুদ্রে ঝাঁপ দিল।

বহু অনুসন্ধানের পরও জলমধ্যে একলব্যকে পাওয়া গেল না।

ডুবসাঁতারে অন্তত পাঁচ যোজন পথ অতিক্রম করে এক নির্জন নামহীন দ্বীপে আশ্রয় নিল একলব্য।

ওই নির্জন দ্বীপে একলব্যের অন্যরকম এক জীবনযাপন শুরু হলো।

নিষাদরাজ্যে একলব্যের নিখোঁজ সংবাদ পৌঁছাল। গোটা রাজ্যজুড়ে শোকের গভীর ছায়া নেমে এল। একলব্যের নামেই রাজ্যশাসন শুরু করল তার জ্যেষ্ঠপুত্র।

AMARBOI.COM

সমুদ্র মধ্যকার নির্জন দ্বীপে প্রবঞ্চিত, ক্ষুব্ধ, বিজিত একলব্য বেঁচে রইল প্রতিশোধের আশায়।

ক্রূর তঞ্চকতা, সতীর্থের প্রবঞ্চনার জ্বালা বুকে নিয়ে একলব্য অপেক্ষা করতে থাকল সেই ভবিষ্যতের জন্য, যে ভবিষ্যতে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের দ্বারা ভারতবর্ষ শাসিত আর শোষিত হবে না, শাসিত হবে জাতবর্ণ নির্বিশেষে প্রাকৃত মানুষ দ্বারা।

—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~